বঙ্গলক্ষ্মী

ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ—বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী

(মাঘ ১৩৬৪—কার্ত্তিক ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ)

লেখক সূচী

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীঅতুল বালা দেবী	—শুধু অমন্তা নয় বিচিত্রা (গল্প)	১৩
	—শ্রীশ্রীগৌরী মা (প্রবন্ধ)	৪১
শ্রীঅনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়	—বিভূতি ভূষণ স্মরণে (প্রবন্ধ)	২৯
,,	—দুর্লভ ক্ষণ	১২৫
শ্রীঅন্নপূর্ণা রায়	—অপরূপ (গল্প)	৭৬
শ্রীঅরুণ সরকার	—বিজেতা (,,)	৯৬
শ্রীঅলকা ঔকীল	—পণপ্রথা (প্রবন্ধ)	৪৯
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	—এবার বৃষ্টেছি আমি বাতাসের মত প্রেম (কবিতা)	১৩১
শ্রীআরতি দত্ত	—সিংহলে অষ্টেকদিন (প্রবন্ধ)	৪৫
শ্রীআরতি রায়	—কৃষ্ণনগরের বারোয়ারী	৫৫
শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায়	—যে কভু দেখা যায় না	১১৪
শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য	—জীবন (কবিতা)	১৩০
শ্রীগৌর দত্ত	—পিকনিক্ (গল্প)	৮১
শ্রীগীতা গুহ	—প্রচলন	১২৩
শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ	—মহিলা সমাচার ৭০, ৯৯	১৪১
শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়	—বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)	৮৪
	—ভালবাসা (কবিতা)	২৯
শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়	—আসন্ন ভেলা (কবিতা)	৯১
শ্রীবীরেন বসু	—সাহিত্য (কবিতা)	৬৭
,,	—আহ্নিক (কবিতা)	১৩০
শ্রীনন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়	—আশা আছে মনের গহনে (গল্প)	৯৩
শ্রীনমিতা রায় চৌধুরী	—সার্থক জন্ম সরোজনলিনী	৩
,,	—শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতা	১০৯
শ্রীপুষ্প দেবী	—ব্যর্থ (গল্প)	৫
,,	—বিস্মরণ (কবিতা)	৭৩
,,	—চিকিৎসকে বিপত্তি	১১১
শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য্য	—সঙ্কটতারিণী ব্রতকথা (প্রবন্ধ)	২৬
	—বৈশাখের ব্রত (প্রবন্ধ)	৬০
শ্রীফুল্লরা রায়	—বন্ধুদের খেয়াল	১৩৬
শ্রীমতি মিরা	—হাসিতেছে রাতের তারকা (কবিতা)	৬৪
,,	—স্বপ্নসাধ (কবিতা)	১৩১
শ্রীমিতা সরকার	—আধুনিকারীর সামাজিক স্থান ও মান (প্রবন্ধ)	
শ্রীমমতা দত্ত	—অমৃত জিজ্ঞাসা (কবিতা)	
শ্রীমীরা দেবী	—বংশ মর্য্যাদা (গল্প)	
	—শারদোৎসব	
,,	—বন্ধনহীন গ্রন্থী	
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	—বসন্তের ধর্ম ও নারী কবিগণ	
শ্রীযূথিকা দাস	—চিঠি (কবিতা)	
শ্রীরমা দে	—পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)	৭৪
শ্রীরমা দেবী	—সমস্যা (গল্প)	২৭
	—মা ও শিশু (প্রবন্ধ)	৪৫
	—প্রথম বর্ষণ (কবিতা)	৮৩
,,	—আদর্শ	১০৭
শ্রীরমা মিত্র	—মহিলা সমাচার	৩৬
শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য	—গদ্য কবিতা (প্রবন্ধ)	২০
	—বেকার সমস্যা ও আমরা (প্রবন্ধ)	৪৯
	—যা ফেলে দেন (প্রবন্ধ)	৭৯
শ্রীশৈলেন বিশ্বাস	—আধুনিক সাহিত্যের পট-ভূমিকা (প্রবন্ধ)	
শ্রীশতদল গোস্বামী	—বিনিদ্র (কবিতা)	
স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত	—ডায়েরী হইতে	
শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়	—বাতী (গল্প)	
শ্রীসতীদেবী মুখোপাধ্যায়	—ভুল	
	—পর্দ্দাপ্রথা (প্রবন্ধ)	
,,	—রংমহলী	
স্বামী সচ্চিদানন্দ	—শক্তি উপাসনা	
শ্রীসুধা দেবী	—বধূ (গল্প)	
শ্রীসুরুচি সেনগুপ্ত	—বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথায় মেয়েদের লাভ ও ক্ষতি (প্রবন্ধ)	৬১
শ্রীহেমলতা ঠাকুর	—প্রেমের বিজয় (কবিতা)	৯
,,	—বাঙলার মূলধন (কবিতা)	১০৮
শ্রীহিরণ্ময়ী বসু	—বিচিত্র অভিজ্ঞতা	১০২
শ্রীঅপরাজিতা ভাদুড়ী	—কৃষ্ণকলি (উপন্যাস)	৩০,৬৫,৮৭,১২৬

লেখ-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অনুকরণ দেবী স্মরণে (প্রবন্ধ)—		৪৯
অপহরণ (গল্প)—শ্রীঅন্নপূর্ণা রায়		৭৬
অমৃত জিজ্ঞাসা (কবিতা)—শ্রীমমতা দত্ত		৪৯
আধুনিক সাহিত্যের পট-ভূমিকা (প্রবন্ধ)		
—শ্রীশৈলেন বিশ্বাস		৬৩
আর্যনারীর সামাজিক স্থান ও মান (প্রবন্ধ)		
—শ্রীবিভা সরকার		১০
আশা আছে মনের গহনে (গল্প)		
—শ্রীনন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়		৯৩
আসন্ন বেলা (কবিতা)—শ্রীধীরেন বসু		৯২
আহ্নিক (কবিতা)—শ্রীধীরেন বসু, এম-এ		১৫০
আর্ষ—শ্রীরমা দেবী		১৩৭
এবার বুঝেছি আমি বাতাসের মত প্রেম (কবিতা)		
—শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য		১২১
কৃষ্ণকলি (উপন্যাস)—শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী		৩০,৬৪,৮৭,১২৬
কৃষ্ণনগরের বারোয়ারী (প্রবন্ধ)—শ্রীআরতি রায়		৫৬
কাঁপিতেছে রাতের তারকা (কবিতা)		
—বন্দে আলি মিঞা		৬৪
গদ্য কবিতা (প্রবন্ধ)—শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য		২০
শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতা		
—শ্রীনন্দিতা রায় চৌধুরী		১০৯
চিকিৎসকের বিপত্তি—শ্রীপুষ্প দেবী		১১১
জীবন (কবিতা)—শ্রীবুদ্ধ ভট্টাচার্য		১৩০
ডায়েরী হইতে—স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত		১
দুর্লভ ক্ষণ—শ্রীঅনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়		১২৫
পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী		
পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)—শ্রীরমা সে		৭৪
পণপ্রথা (প্রবন্ধ)—শ্রীসতীদেবী মুখোপাধ্যায়		৭৫
পণপ্রথা (প্রবন্ধ)—শ্রীবন্দনা উকীল		৪৯
পিকনিক্ (গল্প)—শ্রীগৌর দত্ত		৮১
প্রেমের বিরহ (কবিতা)—শ্রীহেমলতা ঠাকুর		২
প্রথম বর্ষণ (কবিতা)—শ্রীরমা দেবী		৮১
প্রহেলন—শ্রীমতা গুহ		১২০
বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)		
—শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়		৮৪
বধূ (গল্প)—শ্রীসুধা দেবী		৫৮
বসন্তের ধর্ম ও নারী কবিগণ		
—অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী		১০৬
বন্ধনহীন গ্রন্থী—শ্রীমীরা দেবী		১১৮
বড়দের খেয়ালে—শ্রীসুরমা রায়		১৩৬
বাণী (গল্প)—শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়		৫৩
বাঙ্গালার মূলধন (কবিতা)—শ্রীহেমলতা ঠাকুর		১০৮
বিদেহা (গল্প)—শ্রীঅরুণ সরকার		১০
বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথায় মেয়েদের		
লাভ ক্ষতি (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরুচি সেনগুপ্ত		
বিস্মরণ (কবিতা)—শ্রীপুষ্প দেবী		
বিকৃতি কুরুচি স্মরণে—শ্রীঅনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়		৯০
বিনিদ্র (কবিতা)—শ্রীপরমল গোস্বামী		১৩১
বিচিত্র অভিজ্ঞতা—শ্রীচিত্রময়ী বসু		১৩২
বেকার সমস্যা ও আমরা (প্রবন্ধ)—শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য		৪১
বৈশাখের ব্রত (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য		২২
ব্যর্থ (গল্প)—শ্রীপুষ্প দেবী		৭
ভগ্ন মর্যাদা (গল্প)—শ্রীমীরা দেবী		২৫
ভালবাসা (কবিতা)—শ্রীউমতী মুখোপাধ্যায়		২৯
ভিক্ষা (কবিতা)—শ্রীযূথিকা দাস		২১
ভুল (গল্প)—শ্রীসতীদেবী মুখোপাধ্যায়		৩৫
মা ও শিশু (প্রবন্ধ)—শ্রীরমা দেবী		৫৫
মহিলা সমাচার—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ		৫৬,৭১,৯৯,১৪১
যা ফেলে দেব (প্রবন্ধ)—শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য		৯৯
যে কভু দেখা যায় না—শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায়		১১৪
রহস্যময়ী—শ্রীসতীদেবী মুখোপাধ্যায়		১২১
শ্রীশ্রীগৌরীমা (প্রবন্ধ)—শ্রীঅনুরূপা বালা দেবী		৪১
শক্তি-উপাসনা—স্বামী সচ্চিদানন্দ		৯৫
সারদোৎসব—শ্রীমীরা দেবী		১১৫
শুধু অবসর নব বিচিত্রা (গল্প)—শ্রীঅনুরূপা বালা দেবী		৯৯
সমস্যা (গল্প)—শ্রীরমা দেবী		
সঙ্কটত্রাণী ব্রতকথা (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য		
স্বপ্ননাথ (কবিতা)—বন্দে আলি মিঞা		১
সার্থক জন্ম (প্রবন্ধ)—শ্রীনন্দিতা রায় চৌধুরী		
সংহতি (কবিতা)—শ্রীধীরেন বসু		
সিংহলে কয়েক দিন (প্রবন্ধ)—শ্রীআরতি দত্ত		
সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি—		৩৮,৭১,১০০,১৫৩

P30215

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৩৩শ বর্ষ] মাঘ—১৩৬৪ [১ম সংখ্যা

ডায়েরী হইতে

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত

ইয়াকোহোমা,
জাপান।
৩রা জুলাই, ১৯২০

আজ সকালেও উনি ভৌমিকের সঙ্গে নাকানো বলে এক জায়গায় একটি agricultural স্কুল দেখতে গেলেন। এ স্কুলে উনি যা দেখলেন তা নাকি খুবই interesting. উনি তা নিজেই লিখেছেন :

Nakano কৃষিস্কুল এখানকার A class কৃষিস্কুল; Nakano Electric Railway ষ্টেশনের ১০০ গজ দূরে। এখানে ১০০ ছেলে ও মেয়ে পড়ে, ছেলেদের ও মেয়েদের পড়ার ঘর আলাদা আলাদা, এরা সবাই elementary স্কুলে পড়ে এসেছে, সুতরাং বয়স ১৪ বৎসর অথবা তদূর্দ্ধ। এখানে তিন বৎসর পড়ে! এই স্কুলে শিক্ষার বন্দোবস্ত অতি আশ্চর্য্য ও সুন্দর। স্কুলের compoundএ ২ বিঘা আন্দাজ জমির একখানি farm আছে, তাতে নানা রকমের ফসল (ধান, গম ইত্যাদি), ফলের গাছ (যেমন pear ইত্যাদি) সারি সারি করে বসান হয়েছে, ছেলে মেয়েরা নিজে এ সব কাজ করে। আমাকে দেখাবার জন্য সব ছেলে মেয়েকে কৃষিকার্য্য থেকে বের করে দেওয়া হল। তারা সব কৃষি কার্য্যের অস্ত্র কোদাল hoe ইত্যাদি নিয়ে কৃষি কার্য্যের operate করতে লাগলো, সে দেখতে বড় সুন্দর। Chaff cutter যন্ত্র চালিয়ে খড় কাটতে লাগল, একটা বাঁশের কল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গমের গাছ থেকে গম ছাড়াতে লাগল; আমাকে সিম ও শশা উপহার দিলে।

এখানে ছেলে মেয়েরা Elementary Chemistryও শিখে। সুন্দর Laboratory ও Museum রয়েছে। Museumএ সব রকমের জিনিষ এমন কি Gramophone, Telephone ইত্যাদিও শিখান হয়। মেয়েরা কৃষিকার্য্য থেকে সেলাই, রান্না, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি বেশী শিক্ষা করে। আমি তাদের তৈরি একটা ছোট bag স্মরণের জন্যে ও একটা pocket case বুচুর জন্যে কিনে আনলাম।

এক ঘরে মাদুর (Tatami) বিছান আছে, এখানে এরা যুযুৎসু শিক্ষা করে, ছোট ছেলেরা সুন্দর শিখেছে। আমার সামনে সবাই যুযুৎসু করে দেখাল।

উনি ফিরে এসে বল্লেন, তোমাকে নিয়ে গেলে ভাল হত। এটা একটা দেখবার জিনিষ। এই রকমের স্কুল আমাদের দেশে খুবই দরকার!

———

"প্রেমের বিজয়"

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

অজানা জগতে বাঁধা ছিল যবে নারীর মন।
দেবতা জানিয়া পূজেছিল তারা তুলসীবন।
দুঃখে সন্তাপে পাতায়-পাতায় খুঁজেছিল দেবতারে
দেবতা আমার দেবতা কোথায় সুধাইল বারেবারে।
সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় জ্বালায়ে প্রদীপখানি,
ইষ্টদেবের প্রণাম করিল দেবতা শরণ মানি।
ভজনে দেবতা, পূজনে দেবতা, জীবনে দেবতা সার,
পতি যে দেবতা সতীর জীবনে দেবতা নাহি যে আর।
নারীর এ পূজা ব্যর্থ হলো না, লভিল পরম তথ্য,
অজানে যারে দেবতা মানিল জানে সে পরম সত্য।
সত্য সত্য সবাই কহিছে সত্য কোথায় নাই,
জগতে সত্য খুঁজিয়া পেয়েছি পূজিতে এসেছি তাই।
সত্যের জ্যোতি জগতের-গতি করিছে নিয়ন্ত্রণ
জগতের সাথে জগতবাসীর দেশের নিয়ন্ত্রণ।
জগত আমার জগত, তুমি যে চির সত্যের পূজারী।
সত্যের পূজা রবে চিরকাল পূজিবে সত্যে নর ও নারী
আত্মা আমার আত্মা আমার প্রেমের তুমি প্রস্রবণ
আমার পূজাদেবের কথা তোমাতে আজ বিসর্জন।

———

সার্থক জন্ম ঃ সরোজনলিনী দত্ত

শ্রীনমিতা রায় চৌধুরী

মহৎ আদর্শের প্রেরণা যে সব নারীর জীবনে প্রতিভাত হয়েছে, যে সব নারী সত্য সুন্দরের উপাসনা করে জগতে অমরকীর্তি রেখে গেছেন তাদের মধ্যে নারী সরোজনলিনী একজন।

বর্তমান বাঙ্গলার নারীদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি উন্নত করবার জন্য এই মহিয়সী নারী আমরণ পরিশ্রম করে গেছেন।

সরোজ নলিনীর কর্মজীবনের পরিধি তাঁর আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সংসার ছিল আত্মীয়, অনাত্মীয়, স্বদেশী, বিদেশী, পরিচিত অপরিচিত অনেক লোক নিয়ে, এই বৃহৎ সংসারের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধকে তিনি মাধুর্য্যের দ্বারা, স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা ও সৌজন্যের দ্বারা কল্যাণময় ও মঙ্গলময় করে তুলেছিলেন। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—"সরোজ নলিনীর কাছে বাহিরের দ্বারা ঘর ও ঘরের দ্বারা বাহির পরাহত হয় নাই। এই উভয়ের সুন্দর সমন্বয়েই তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। আজকালকার দিনে যে নারী কেবল একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন, ঘরে বাহিরে সর্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ।"

সরোজনলিনীর জীবনী আলোচনা করে আমরা সেই আদর্শেরই পরিচয় লাভ করবো।

১৮৮৭ খৃঃএর ৯ই অক্টোবর সিবিলিয়ন সিতাংশুশেখর রায় ও মাতা নগেন্দ্রনন্দিনীর চতুর্থ কন্যা সরোজনলিনী হুগলী জেলায় তাঁদের ব্যাণ্ডেলের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হ'তেই তিনি পিতামাতার আদরের সন্তান ছিলেন এবং শৈশবেই তাঁর চরিত্রে বহু সদ্গুণের সমাবেশ হয়েছিল।

সরোজনলিনী কখনও কোন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন নাই, অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পাশ করেন নাই। বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাছে ভাইবোনের সঙ্গে শিক্ষালাভ করেছিলেন। কিন্তু শৈশব নানা স্থানে ইংরাজ ও বাঙ্গালী বন্ধুদের পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা তাঁর বাল্যশিক্ষার সহায়ক হয়েছিল। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অশ্বারোহন, টেনিস্, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় নানাবিধ যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।

বালিকা বয়সের অন্যান্য কাজের মধ্যে পিতামাতার সেবা করা তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশহিতৈষী ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে সরোজনলিনীর বিয়ে হয়। তাঁর ১৮ বৎসরের বিবাহিত জীবনে একান্তভাবেই স্বামীর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। বিবাহিত জীবনের প্রথম ভাগে সিবিলিয়ন স্বামীর সঙ্গে মতানৈক্য ঘটলেও প্রকাশ্যে তিনি কখনও স্বামীর আচার ব্যবহারের বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করতেন না; বরং স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে সেই ভাবেই চলতেন, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা, সততা ও কোমলতার প্রভাবে অলক্ষিতভাবে স্বামীর চরিত্রকে বদলিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি যাবতীয় সমস্যাকে প্রেমের দ্বারা মীমাংসা করবার চেষ্টা করতেন। তাই সত্যের পথকে প্রেমের স্নিগ্ধ আলোর মাধ্যমেই তিনি অনুভব করেছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা ও ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী হয়েও সরোজনলিনীর মনে এতটুকু গর্ব্ব ছিল না। তিনি আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। ঘরকন্নায় তাঁর অসাধারণ পটুত্ব ছিল। তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে অন্ততঃ একটি বাঁধাকপি ও কিছু মিষ্টান্ন তৈরী করে স্বামী পুত্রকে খাওয়াতেন। নানাবিধ সূচশিল্প ও সেলাইয়ের কাজে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। বাড়ীর সব পর্দ্দা, মেঝের চাদর ইত্যাদি তিনি নিজের হাতে সুন্দর করে সূচি ও চিত্রশিল্পে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করতেন। তাঁর হাতের কারুকার্য্যের বৈচিত্র্যে ইংরেজ, বাঙ্গালী ও জাপানী বন্ধুরা মুগ্ধ হতেন। প্রত্যেক কাজের মধ্যেই তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পেত।

অতিথি সেবা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশীয় ও পাশ্চাত্য উভয় প্রথানুযায়ী অতিথি সৎকারে তিনি সকলের প্রশংসা লাভ করতেন। ঘরকন্নার কাজেও যেমন নিপুণা ছিলেন, তেমনি রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়েও অক্লেশে তিনি সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে পারতেন।

আদর্শ ভারত নারীর সমস্ত গুণেরই অধিকারী তিনি ছিলেন, এবং সময়য় ও মিলনে সরোজনলিনীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। একদিকে তিনি ইউরোপীয় মেয়েদের মত বাইরের দায়কর্ত্তব্য, সকল লোকের সঙ্গে মেলামেশা যেমন অক্লেশে করতেন অন্যদিকে হিন্দুনারীর প্রাচীন আদর্শে নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন। যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাকে তিনি কখনও বর্জ্জন করতেন না। হিন্দুনারীর প্রিয় শাখা, সিঁদুর ও নোয়া তিনি আগ্রহের সঙ্গে পরতেন। তাঁর শাখা পরা দেখে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সমাজের অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হতেন কিন্তু তিনি হেসে বলতেন—"স্বামীর কল্যাণের জন্য শাঁখা পরিতে হয়। আমাদের দেশের এই প্রাচীন প্রথাকে আমি বড় ভালবাসি", কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় টেনিস খেলা ইত্যাদি সত্ত্বেও তাঁর হাতের শাখা ভাঙ্গত না।

বিয়ে ইত্যাদি আনন্দ উৎসবে আমোদ আহ্লাদ করতে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। মেয়েদের অভাবে ছেলে বয়সে নানাপ্রকার মেয়েলি ঢাঙ্গে ব্যক্তিত্ব করতে সরোজ নলিনীর সমকক্ষ খুব কমই ছিল।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন—"এ সব প্রাচীন সুন্দর আনন্দময় প্রথা যদি দিলে জাতীয় ও সামাজিক জীবনে আনন্দ থাকিবে কি করিয়া?"

গৃহের জন্য নারীর যেটুকু একথা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি বলতেন—"আমি যদি ঘরের কর্ত্তব্য অবহেলা করি, তবে সামাজিক কর্ত্তব্য করবার অধিকার লাভ হবেনা।"

সরোজনলিনীর জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি খুব সহজ ও সাধারণ ছিল। তিনি মিথ্যা আড়ম্বর ও সকলপ্রকার বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। জাঁকজমক করা, অর্থের উপর লোভ করা, দামী অলঙ্কার পরা তিনি পছন্দ করতেন

তিনি বলতেন—"লোকে উচ্চপদ বা ধনলাভ করে কেন যে জাঁক করে তা আমি বুঝিনা। উচ্চপদ বা ধনলাভের একমাত্র সার্থকতা হচ্ছে দায়ারণের সেবার সুযোগ, তা না করে যারা জাঁকজমক বা বিলাসিতা করে তাদের উচ্চপদ বা ধনলাভ বিড়ম্বনা মাত্র।"

সুনির্ম্মল চরিত্রের অধিকারীকে তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তাই তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে প্রায়ই বলতেন—"বাবা, তুমি লেখাপড়ায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে না পার তাতে আমার আক্ষেপ নাই, কিন্তু আমি চাই যে তুমি চরিত্রবান হও।"

সরোজ নলিনীর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান। তিনি এতই সরল ও উদার ছিলেন যে, কখনও নিজেকে একজন উচ্চপদস্থ কালেক্টরের পত্নী মনে করতেন না। তিনি একাধারে মূর্ত্তিমতী বাঙ্গালী কন্যা, স্ত্রী ও মা।

তিনি অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়া ছিলেন; বেহালা, সেতার, এস্রাজ, হারমোনিয়ম এবং পিয়ানো বাজাতে ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে" এবং "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চলরে"

এই গান দুটির মধ্য দিয়ে নিজেকে একেবারে ঢেলে দিতেন। তাঁর প্রাণের নির্ম্মল আনন্দধারা যেন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত।

স্বদেশ প্রেম সরোজ নলিনীর মজ্জাগত ছিল। তাঁর বিদেশী বন্ধুবান্ধবগণ তাঁর গভীর স্বদেশপ্রাণতার কথা জেনে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলার নারী জাতির মনে নবচেতনা সঞ্চার করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি বুঝেছিলেন যে দেশের উন্নতি সাধন করতে হলে নারীশক্তিকে জাগ্রত করা একান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গলার অন্তঃপুরের মেয়েরা নিরক্ষর হতে পারে কিন্তু তাদের হৃদয়ের সরলতা চরিত্রের সাধুতা ও কর্ম্মক্ষমতার উপর তাঁর একান্ত বিশ্বাস ছিল, এই বিশ্বাসই তাঁকে বিভিন্ন স্থানে মহিলা সমিতি স্থাপন করবার প্রেরণা জাগিয়েছিল। তিনি পাবনায়, বীরভূমে, রামপুরহাটে,

বাঁকুড়ায় এবং লাক্সিলিংএ মহিলা সমিতি স্থাপন করে মেয়েদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা ও জনহিতকর কার্য্যের জন্য বিশেষতঃ বীরভূমে তাঁর মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠার জন্য তদানীন্তন ভারত সম্রাট তাঁকে এম-বি-ই উপাধিতে ভূষিতা করেন।

গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে এই মহিয়সী মহিলা মারা যান। "তাঁর পবিত্র দেহ আজ আর নেই সত্য কিন্তু তাঁর অমর আত্মা বাংলার নারী সমাজে নূতন শক্তি, উৎসাহ ও উদ্যম সঞ্চার করে, তাঁর আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করবার প্রেরণা যোগাচ্ছে।" নারীদের স্বাবলম্বী ও শিক্ষায় উন্নীত করবার জন্য আজ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। নারীদের এইরূপ উন্নয়নই সরোজনলিনীর কাম্য ছিল।

ধনীর কন্যা ও ধনীর পত্নী হয়েও তিনি যে আত্মসংযম দেখিয়েছেন এবং নারীজাতির নানাবিধ উন্নতির জন্য যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তাতে এ কথাই মনে হয় যে তিনি ভারতের তথা বাঙ্গলার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে নিজের জন্মকে সার্থক করে গেছেন। তাঁর আদর্শকে স্মরণ করে তাই কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের বলতে ইচ্ছা হয়—"জাগাও ফুলিঙ্গ,

জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জ্বেলেনিক্।

এক প্রদীপের প্রবর্ত্তনায় হোক্ আলো রসদিক্।" *

* (বেতারে পঠিত)

"—ব্যর্থ—"

শ্রীপুষ্প দেবী

শতকরা নব্বই জন মানুষই ত সংসারে যুদ্ধ করতেই জন্মায়। শেষে যদিই বা দুঃখের দিন কাটিয়ে সংসারে সুখের সূর্য্যোদয় হয় তখনই কি সে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করে? হয়ত তার আগেই হয়েছে একান্ত প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা—যা সমস্ত সুখের মধ্যে চিরদিন দুঃখের অতুল পাথার হয়ে বয়ে চলেছে। সে কারণে সংসারে সুখের মাত্রাধিক্য হলেই মনে আশঙ্কা হয় বুঝি বা এ সুখস্বপ্ন ভেঙে যায়।

কাউতলা রোডের টিউবয়েলের পাশে সাদা পাথরে লেখাটুকু সকলেরই চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—যে সেবারতা বধূটির নামের সঙ্গে তাঁর স্নেহময় শ্বশুরের যৌবনবেদনা ক্ষুধাতুর পথিকের মুখে জলপাত্র ধরে নিজের ক্ষুধা ভোলার চেষ্টা করছে। সেই অসহায় রুগ্ন শিশুর ব্যথা স্মরণ করে দুঃখও পাই। কিন্তু জানো কি সেই দেবী প্রতিমা বধূর কাহিনী? নাম তার "ঊষা", বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে শৈশব তার সুখ-সম্পদ, প্রাচুর্য্যে ভরা। বোধ হয় শেষ জীবনে দুঃখ বিপদে ভরা হবে বলেই দৈবের এ বিদ্রূপ—ঐ যে শ্বেতপাথরে কালো অক্ষরে লেখা "আমার পরমা স্নেহময়ী বৌমার স্মৃতিতে" ঐ লেখাটি কোনো বুড়ো শ্বশুরের নয় নবীন যুবার অন্তরের মা হারা কিশোরের। একথা কি কেউ কল্পনাও করতে পারে?

জমিদার হরিশঙ্কর বাবু যখন কলকাতায় বাসের অভিপ্রায় নিয়ে এলেন তখন বুঝি উদ্দেশ্য ছিল রমাকে কাছে রাখার। দাদের মেয়ে পরের ঘরে গেলেও দিনান্তে একবার গিয়েও যে তার হাসিভরা মুখখানা দেখে আসবেন শুধু এই সাধটুকুই ছিল মনের ভেতরে। সৌরভ ছড়াতে দেরী হয় না কাঁকে কাঁকে সবজ আসে পড়ে। অপরূপ রূপসী মেয়ে সঙ্গে অর্দ্ধেক নয় পুরোপুরি রাজত্ব। প্রতিদিনের মত সেদিনও রমা বাপের সঙ্গে স্তব পাঠ করছিল—

"সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তি ভূতে সনাতনী
গুণাশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে।"

বাপের মনে জাগছিল সেই অতুল রূপের আধার মায়ের মুখের পানে রমার সুন্দর রুচি মুখখানি। যতবারই জগদ্ধাত্রী মায়ের মূর্ত্তি স্মরণ করে যান ততবারই এই

বালিকা মায়ের মুখ এসে সে মুখ ঢাকা দেয়। চাকর নবীন এসে দাঁড়ালো "জলখাবার দেওয়া হয়েছে" বলে। রমার হাত ধরে হরিসুন্দরবাবু অন্দরে গেলেন। পাশাপাশি দুটি ছোট্ট ফুলের আসন পাতা সামনে রূপোর রেকাবে জলখাবার সাজানো। সদ্য চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে গৃহিণী আবির্ভূতা হলেন। কাপটি হরিবাবুর সামনে নামিয়ে বললেন, "জানো গো, আজও কালোর মা বউটা এসেছিল, বলছে ওদের পাড়ার সেই সম্বন্ধ নিয়ে তারা তাড়া দিচ্ছে, বলছে এই বোশেখেই বিয়ে দিতে হবে। ও ছেলেটিকে আমি দেখেছি গো কাল্লুর বিয়েতে এসেছিল তার পিসির সঙ্গে। তখন সবে পৈতে হয়েছে কি সুন্দর গোপাল গোপাল দেখতে। তখুনি মনটাতারা আমার বলেছিল—দেখো বৌদি, পছন্দ হয় জামাই কর্ত্তে ! আহা সে মুখখানা আমি ভুলতে পারি নি।"

কর্ত্তা তখন খবরের কাগজ ও চায়ের কাপে বেশ ডুবে গেছেন। উমা দেবী হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে বললেন, "আশ্চর্য্য ! কি যে রস পাও ঐ শুখনো কাগজে, সামনে যে দাঁড়িয়ে আছি তা খেয়ালই নেই।" অপ্রস্তুতের হাসি হেসে কর্ত্তা বল্লেন, "না না, তোমারই কথা ভাবছিলুম তবে রমা মায়ের ঐ বিয়ের কথা এখন থাক্। হাঁরে নবীন, সাধুচরণকে বল দেখি ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিতে।" উমা দেবী চটে উঠে বললেন কেন ডাক্তার আবার কেন, এ বয়েসে অম্বল, অমন মেয়েমানুষের হয়ই—এইতো সেদিন এক শিশি ওষুধ এল তা সেবই হয় নি।" হরিবাবু বল্লেন, "আরে সেই জন্যেই তো ডাক্তার—এ অসুখ তো আর কৈফিয়ৎ চাইতে পার্ব্বে না—ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস করবে ওষুধটা খান নি কেন? তাকে তো বোঝাতে পার্ব্বে না সারা রাত অম্বল নিয়ে ছটফট করে সকাল বেলা ১১ বছরের মেয়ের বিয়ে দিতে তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছ। হাঁরে নবীন, কই তোর বাবু সরবৎটা আন তো?" রমা নিজের বিয়ের প্রসঙ্গে অনেকক্ষণই ওঠার তালে ছিল, এবার সুযোগ পেয়ে বললো, "আমি এক্ষুনি করে নিয়ে আসছি বাবা।" লাল টুকটুকে পায়ে মলের রুমঝুম আওয়াজ তুলে রমা ছুটলো। উমা দেবী বললেন, "কী যে মায়া দেখানো? শুধু শুধু ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে খাটানো—একেই তো ও 'মা' 'মা' করে অস্থির—ওকে ছুটিয়ে কি সুখ যে হয়? তার চেয়ে নিজের শরীরটা নিয়ে একটু ভাবতে বলো দেখি! নিজেকে তো আজো চান করতে মনে করিয়ে দিতে হয়। মেয়ে যে অত বড় হলো তার খেয়াল একবিন্দু নেই—পাড়া শুদ্ধ লোকের কাছে আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। সবাই বলে, "হ্যাগো, 'রমার মা' মেয়ের বিয়ে দেবে না?" হরিবাবু হেসে বল্লেন, "সে নেবখন আবার অঙ্কে, ওদের একদিন খুব ক'রে খাইয়ে দাও না।" রমা শ্বেতপাথরের গেলাসে সরবৎ নিয়ে ফিরে এল। বোধহয় এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যেই হরিবাবু উঠে পড়ে বললেন, "খাও দেখি সরবৎটা, খেয়ে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো, সারারাত তো ঘুমুতে পারো নি। চল মা রমা, তোমার সেই "টুইঙ্কল্ টুইঙ্কল্ লিট্‌ল্ ষ্টার" কবিতাটি পুরো মুখস্থ হয়েছে আজ? শোনাবে চল—বাপ, মেয়ে হাত ধরাধরি করে সরবে। সিঁড়ি যান রাস্তার ধরের দিকে একটু না দেখিয়ে দিলে ভেটকী মাছটার শ্রাদ্ধ করবে বামুন ঠাকুর। রান্নাঘরে গিয়ে দেখেন ঠিক ভেবেছেন তাই। ভেটকী মাছের মুড়ো সরষে দিয়ে বেঁধে বসে আছে বামুন ঠাকুর। আর কেন্তি হামীও হয়েছে তেমনি? আজ আট বছর ওর কর্চ্ছে জানে কর্ত্তা কি ভালবাসে? ভেটকী মাছের মুড়ো ঝুলকপি দিয়ে ঘন্ট আর মেয়েটার মুখও হয়েছে বাপ বসানো? এমনি তে তো আজও ভাত মাখিয়ে খাইয়ে দিতে হয়। দু গরাসের পর তিন গরাস পেটে যাওয়াই দুর্ঘট তবুও ভেটকী মাছের ঘন্টটা দিয়ে ভাতটা তার হরত পেটে চলে যাবে এ আশাও ছিল। কিন্তু এ নিয়ে হৈ চৈ করার উপায় নেই -তখুনি কর্ত্তার কানে যাবে আর সেই অম্বলের ব্যথার শোক জেগে উঠবে। এমন হতভাগা বামুনও মানুষ পয়সা দিয়ে রাখে। আর কেন্তিকে বকেই বা লাভ কি? ও মা মানুষ না জন্তু। একমনে একতাল লঙ্কা বেঁটেই চলেছে—আর লঙ্কা বাটা কেন বাপু? এমনিতেই তো গায়ে লঙ্কাবাটা ছড়িয়ে রেখেছ। জলে পুড়ে যাক হচ্ছি তোদের জ্বালায়। যাকগে ঐ মুড়োই কপি দিয়ে রেঁধে দিই। যা সব খাইয়ে কি খাচ্ছে বুঝবে কিনা তাই সন্দেহ। একমনে এইসব ভাবতে ভাবতে সেই রান্নাঘরের চৌকিটায় বসেছেন অমনি রমার

পায়ের ফুসফুস আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে "কাকীমা একী কাণ্ড" বলতে শুনেই চোখ চেয়ে দেখেন কর্ত্তার পাশে নরেন ডাক্তার—কর্ত্তা বল্লেন, "শোন নরেন ও তোমার দ্বারা হবে না, এবার বড় ডাক্তার আনাও যার শাসন তোমরে কাকীমা মানবেন—সারারাত অম্বলের ব্যথায় ছট্‌ফট্ করে এখন মাছের কালিয়া রাঁধতে বসেছেন"। উমা দেবী মনে মনে স্বস্তি পান থাকলে ঘটটা বুঝতে পারেন নি কর্ত্তা, নইলে ও ঘট থাওয়ানো যায় হত। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি মোবার ঘরে ফেরেন—রমা ততক্ষণে মার সব ওষুধ শিশি নরেন ডাক্তারের সামনে এনে জড়ো করেছে। বলে, দেখুন নরেনদা মা মোটে ওষুধ খায় না আপনি ভালো করে বলে যান—ডাক্তার রমার দিকে চেয়ে বলেন তুমি মনে করে দাও না কেন? ওটা তো তোমারই কাজ ভাই।

ডাক্তারের এই ভাই সম্বোধনটা কর্ত্তা-গিন্নির ভাল লাগে না। কারণ ডাক্তার কর্ত্তার বন্ধুপুত্র হলেও কর্ত্তার সাধ ডাক্তারের মাতৃহারা ছেলেটীর সঙ্গে রমার বিয়ে দিয়ে উমা দেবীর ছেলের সাধ মেটাবেন, ডাক্তারও তাতে অরাজী নন্। তবুও সে কেন রমাকে ভাই ভাই করে কথা বলেন বোঝা যায় না।

নরেন ডাক্তারের বয়স ৩৪।৩৫ হবে। আজকের দিনের কথা। ডাক্তারের বিয়ে হয়েছিল ১৬ বছর বয়সে এক চতুর্দ্দশী কন্যার সঙ্গে। এক বছর পরে প্রসবের সময় স্ত্রী মারা যান। তারপর কী ভাবে যে সেই মাতৃহারা শিশু বিয়ের কোলে বড় হয়ে ওঠে সে বলার কথা নয়। কথায় বলে 'রাখে হরি মারে কে?' ডাক্তারের যশেও ছুয়া মাসীমা পিসীমার অভাব ছিল না। কিন্তু কেন যে তাঁরা এসে শিশুটির ভার নেন্ নি তাও কেউ জেনে পায় না। আজ সেই ছেলে ২১ বছরের কলেজে পড়ছে সত্যিই ১১ বছরের রমার সঙ্গে তার বিয়ে বেমানান নয় কিন্তু ডাক্তারের মন তাতে সাড়া দেয় না। তাঁর সুসঠিত দেহ অটুট স্বাস্থ্য এসব দেখেও তাঁর হাতে মেয়ে দেবার কথা কেন হরিশঙ্কর বাবুর মনে আসে না এই-ই তার আশ্চর্য্য মনে হয়।

উমাদেবীর সোনার সংসারে হঠাৎ বজ্রাঘাত নেমে এল। সন্ন্যাস রোগে মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে, হরিশঙ্কর বাবু চলে গেলেন—তারি সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল উমাদেবীর পায়ের তলার মাটি আর রমার সোনার ভবিষ্যৎ। শেষ সময়ে বহু কষ্টে রমার হাতটি ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে কি যেন বলার চেষ্টা করেছিলেন হরিশঙ্করবাবু ছুচোখ দিয়ে জলই শুধু গড়িয়ে পড়েছিল কোন স্বর বেরোয়নি। কিন্তু সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রশান্ত স্বরে নরেন ডাক্তার বলেছিল "আপনি নিশ্চিন্ত হোন আমি রমাকে গ্রহণ করলুম।"

তখন প্রতিবাদ করার সময়ও নয় তাছাড়া তবুও উমাদেবীর মনে আশা ছিলো "পুত্রবধূরূপে" কথাটা বলতে নিশ্চয় নরেন ভুলই করেছে নইলে একী সম্ভব? পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটুকু দেহ ছেড়ে চলে গেল। তবুও সকালে ডাক্তার নীলরতন সরকারের গাড়ী এসে দাঁড়ালো। রুগীকে দেখে রুমালে চোখ মুছে রমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ডাক্তার গাড়ীতে উঠলেন। এরপর যা কিছু কর্ত্তব্য নরেন ডাক্তারই একাই কোরলো। এদের কোলকাতায় আত্মীয়জন বিশেষ ছিলোও না আর যারা ছিলোও তাদের খবরইবা কে দেবে?

ঐদিন রাত্রে নরেন ডাক্তার বাড়ী ফিরে তার ছেলেকে ডেকে বললো সব কথা। ছেলের সঙ্গে বাপের বন্ধুত্ব ছাড়া ছিল না। ছেলে শুধু বসে সব কথা শুনলোই। শেষে যখন ডাক্তার বল্লেন "খোকা রমা মা হয়েই জন্মেছে হরিশঙ্কর বাবু ছিলেন ওর কোলের ছেলে তাঁকে শাস্তি দিতে আমায় মত দিতে হয়েছে রমাকে বিয়ে কর্ত্তে বলে কিন্তু রমার মুখে হাসি ফুটেছে তুমি তাকে মা বলে ডাকবে শুনে—তুমি তাকে সত্যিকারের মা ভাবতে পারবে তো?"

সামনের দেয়ালে অয়েল পেন্টিং করা মোলক পরা কিশোরী মায়ের ছবির দিকে চেয়ে স্বল্পভাষী কিশোর বালক দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলো "নিশ্চয়ই, তিনি তো আমার মা-ই"। কল্পনা প্রবণ শিশু কি চারদেয়ালের মধ্যে মানুষ হয়ে নিজের কল্পনার রাজ্যেই থাকতো বেশী তার মনে মায়ের যে কিশোরী ছবিটি আঁকা ছিলো তার সঙ্গে ভক্তির চেয়ে মমতার পরিচয়ই ছিলো তার বেশী।

অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্বামীকে হারিয়ে উমাদেবী যেন নিথর পাথর হয়ে গেলেন তার ওপোর সবচেয়ে ভাবনার

কথা রমাকে নিয়ে—ঐটুকু কচি মুখের ওপোর যেন সর্ব্ব-হারার ছাপ মেরে দিয়েছে। এই সংসারের ঘাত প্রতিঘাত থেকে ওকেই বা বাঁচানো যায় কি করে? এই সব পাঁচ দিক ভেবে উমাদেবী নরেনের হাতেই রমাকে সঁপে দিলেন। তাই হোক নরেন রমাকে তো দেখবে? ও রকম ছোট বড় বয়ও তো? যদি ভালো থাকে ঐ স্বামী নিয়েই রমা সুখী হবে। নরেনের ছেলের সঙ্গে যে রমার বিয়ের কথা হরিশঙ্কর বাবু ও উমাদেবী ভেবেছিলেন তাও রমার কাছ থেকে সযত্নে ঢেকে রাখলেন।

রমার তখন বিয়ে করার মত মনের অবস্থা নয়।

উমাদেবী বুঝেছিলেন যে তাঁর শেষ দিনের আর বেশী বিলম্ব নেই। তাই রমাকে বোঝালেন নরেন তো বিয়েতে রাজীই ছিল না শুধু তাঁকে শান্তি দেবার জন্যই তখন তাকে বিয়েতে মত দিতে হয়েছে। তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে দেরী করা ভালো নয়। বিনা আড়ম্বরে শুভ কাজ শেষ হয়ে গেল—পথে যেতে যেতেই নরেন ডাক্তার রমাকে বললো খোকার কথা। বললো "জানো রমা আমার সেই মা হারা ছেলে মা ফিরে পাবে এই বিয়েতে এই-ই আমার সান্ত্বনা—তুমি তার মা হতে পারবে তো?" রমার মনে পড়লো বাবার কথা কতদিন আদর করে বাবা বলেছেন, "কি করে তুই বুঝলি বল তো বুড়ি যে এখানে তোর বুড়ো ছেলে মা হারিয়ে কাঁদছে? তুই যে মা হয়েই জন্মেছিস্"—রমা জলভরা চোখ তুলে নরেন ডাক্তারকে বললো, পারবো।

তেমনি বিনা আড়ম্বরের মধ্যেই রমা শ্বশুর বাড়ীতে পা দিলো। বাজলো না শাঁখ, ছিল না আলপনা আঁকা—শুধু একটি কিশোর বালক এসে মা বলে ডেকে তার পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়ালো। সেই সুন্দর শিশু "সুন্দর কিশোর মুখের মা" ডাকে রমার বুক ভরে উঠলো। লজ্জায়, কুণ্ঠায় ভরে গেল সব উৎসব হীনতার দুঃখ।

সংসারে মজা এই যে চিরকালই ফুলের পাশে কাঁটা থাকে। পাশের বাড়ী থেকে তারিণী দেবী দেখতে এলেন নববধূকে। এসে বধূর রূপের প্রশংসার পঞ্চমুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, "হ্যাগা, মা, তোমার সাতকুলে কি কেউই নেই। এমন সোনার পিরতিমেকে কী বলে ঐ ঘাটের বুড়োর হাতে দিলে গো? এযে সাধ করে বৈধব্য ডেকে আনা—? আর বুড়ো মিনসেরই বা আক্কেলকে বলিহারী। ঘরে জোয়ান ছেলে বসে রইলো। আর বৌ আনলো কি না নিজের জন্যে? আরসীতে নিজের মুখও কি দেখতে পায় না বুড়ো। ঐ ছেলের পাশে ও মুখ তুলে চাইতে পারে কখনো? কে জানে বাবা কতই দেখব কালে। তুমি আর "মা" বলে লোক হাঁসিও না খোকা, বরং "বৌমা" বলো।"

মতমুখী রমা, একান্ত দিশাহারা খোকা, ও পাশের ঘরে বসে নরেন ডাক্তার নিজের কানেই এ সভ্যের মন্তব্য শুনলো। জগতে তারিণী দেবীদের ক্ষমতা কম নয়। ক্রমে ক্রমে সন্দেহ জাগলো নরেন ডাক্তারের মনে। শেষে সে স্থির ধারণা করলো, রমা আর খোকার মধ্যে সন্তান সম্বন্ধ সম্ভব নয়। নিজের মনের এই আগুনে যত সে নিজে পুড়লো তার চেয়ে বেশী পোড়ালো রমা আর খোকাকে।

এই সন্দেহের বাস্তিকে ব্যবস্থা হল শেষ রাত্রে উঠে রমা দুয়োতলায় চান করে রান্না সেরে নিজের খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকবে আর নরেন ডাক্তার তাতে মস্ত এক সড়েরের তালা ঝুলিয়ে যাবে কলকাতায়। রোজ এই তালা দেওয়ার সময় রমার কাতর অনুনয়ের শেষ থাকতো না। "কেন আমায় বন্ধ করছো গো, ও যে আমার ছেলে এই শেষ রাতে বাঁধা কড়কড়ে ভাত ও খাবে কি করে? আমার প্রাণটা যে হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে ওকে কোলে টেনে নিতে আমি যে ওর মা—লক্ষ্মীটি দোর খুলে দাও।" কোনো কথায় কর্ণপাত না করে নরেন ডাক্তার দুঢ় হাতে শেকল টেনে তাতে তালা ঝুলিয়ে চলে যেত কলকাতায় সারাদিনের জন্য কলে। রমা দিনে দিনে যেন নিস্তব্ধ নিথর হয়ে যেতে লাগলো। দাস, দাসীদের অনুকম্পা ভরা চোখের সামনে সে চোখ তুলতে পার্ত না। উমাদেবী তো স্বামীর মৃত্যুর পরই কাশী বাসী। সব নিঃশব্দ ভাবে দান করেছিলেন জামাইকে। জামাই একশো টাকা করে মাসহারা পাঠান শুধু। শেষ বয়সে যার মনের শান্তিটুকু কেড়ে নিতে ইচ্ছে হল না, থাকে জানালো না কিছু। এই ভাবে মাসের পর মাস কেটে গেল। দীর্ঘকালের মানসিক

অশান্তির পর খোকা, অরুন পড়লো জ্বরে। নরেন ডাক্তার সোড়ায় তাবলো টাইফয়েড, শেষে বুঝলো না এটা ব্রেন ফিবার। সব কাজকর্ম ফেলে সে বসলো ছেলের কাছে। অজ্ঞান অবস্থায় ছেলে আকুল হয়ে ডাকছে মাকে "মাম্মো, এস মা, আমার কোলে নাও, ছেড়ে ফেলো শেকল। কেন বাবা তোমায় শেকল দিয়ে বন্ধ করে রাখবে? আমার মা আমার কাছে আসবে"—কখনো দাঁত কড়মড় করে বলে মন্থরা কুঁজী বুড়ি ভাবিনী ঠাকুমা তার মনে যত বিষ ছিলো সব ঢেলে দিয়েছে বাবার মনে। বাবা, ওসব মিথ্যে কথা—বৌমাকে ডাকো একবার।" ছেলের কাতর আর্ত্তনাদে উতলা হয়ে নরেন ডাক্তার রমার ঘরের শেকল খুলে দিলো—ম্লান মুখে রমা এসে দাঁড়ালো ছেলের শিয়রে তার সাধের খোকা আজ বিবর্ণ রক্তহীন - কে জানে কেন রমার মনে হল খোকার এই অকাল মৃত্যুর জন্য সেই বোধ হয় দায়ী। সে আর দাঁড়ালো না ফিরে চলে গেল নিজের ঘরে। এদিকে সবাই ব্যস্ত খোকাকে নিয়ে, তার মধ্যে বিষ খেয়ে রমা নিজের দুঃসহ জীবন শেষ করে দিলো। ডাক্তারের বাড়ীতে আর যাই হোক বিষের অভাব ছিল না বিশেষ করে ছেলের অসুখের জন্য রাশি রাশি ওষুধ পত্র ছড়ানো চারিদিকে। রমার মৃত্যুর পরই অরুন সেরে উঠলো ধীরে ধীরে—আবার সেই পুরানো আবহাওয়ায় বাপ আর ছেলে। তবু আগেকার সেই সহজ সরল আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অনেক ইতস্ততঃ করে বছর খানেক বাদে বাপ ছেলেকে বললেন, "অরুন এবার তুমি সংসারী হও বাবা।" ছেলে দৃঢ়কণ্ঠে বললো, "না, সংসারে যত মেয়ে আছে সবাই আমার মা, বিয়ে আমি কর্ত্তে পার্ব্ব না।"

কাশী বাসিনী উমাদেবী জানলেন ও না যে তার বড় আদরের সাধের রমার কি পরিণতি হল। ছুটি পেলেই অরুন যেতো দিদিমার কাছে, বলতো, "দিদিমা, বৌমার ছোট বেলাকার গল্প বল না, তোমার কাছে শুয়ে শুনি।" উমাদেবী আদরে নাতির মাথাটা কোলে টেনে নিয়ে বলতেন, "ও পাগলী কোনদিনই আমায় ভালবাসলো না, নইলে একবার আসে না আমায় দেখতে?" আবার বলেন, "তা নয়রে আমার এ বেশ ও সইতে পারে না—নইলে খুঁটিনাটি কি না গুছিয়ে দিয়েছে বল দেখি? একা পড়ে থাকি এত আকরোট, পেস্তা, বাদাম আমসত্ত্ব কে খাবে বল্ দেখি? তুই দাদা দুদিন থেকে খেয়ে যা।" চোখের জল অলক্ষ্যে মুছে অরুন কলকণ্ঠে হেসে উঠতো—সেই ভালো কথা বৌমা আমার বসুমি লাগাক আরকি। হ্যারে খোকা, যার নাম করে সব তুই নিজেই খেয়ে ফেলি? কেনো আমার কাছে কি খেতে পাস্ না? বাবাঃ বৌমা এত রাঁধতেও পারে। রান্নাঘরে ঢুকলে আর বেরুবার নাম নেই—আর মহারাজ খাটা দিনে দিনে ভুঁড়িদার হচ্ছে বসে বসে।" কন্যার সোনার সংসার কল্পনায় দেখে মায়ের মন তৃপ্তিতে ভরে যায়। তিনিও বলেন, "হাঁরে দাদু এবার বে থা কর, কোন সোনারপুরীর রাজকন্যা ধ্যান কর্চ্ছে তোর জন্যে।" সে কথাও তেমনি হেসে উড়িয়ে দেয় খোকা—বলে, "কেন? তুমিই তো বেশ রয়েছো—আমার মার কোলটা সে এসে কেড়ে নিক্ আর কি?"

এ অভিনয় বেশীদিন অরুনকে কর্ত্তে হল না, মনের শান্তিতে উমাদেবী চোখ বুঁজলেন।

এবার খোকা বড় নিঃসঙ্গ বোধ করলো। মনে হল দিদিমার সঙ্গে মাও যেন আবার নতুন করে হারালো।

বাপের ও রমার অতুল সম্পত্তিতে দিকে দিকে হল ধর্ম্মশালা, আরোগ্যনিকেতন, বিনাব্যয় দাতব্য চিকিৎসালয়, বিধবাশ্রম, স্কুল, কলেজ যেন নিঃস্ব হবার জন্য পণ করেছে সে। তারি একটা ছোট্ট কণা নিয়ে আমরা কাউতলা রোডে। আর ভাবি কোন বৃদ্ধ বুঝি তার কিশোরী বৌমার স্মৃতিতে এই জলপাত্র তুলে ধরেছে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের জন্য—।

আর্য্য নারীর সামাজিক স্থান ও মান

শ্রীবিভা সরকার

ভারতীয় মেয়েদের সামাজিক মর্য্যাদা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে শুধু আজকের মেয়েদের বিষয়ে বা স্বাধীন ভারতের সংবিধানে কি আছে সেইটুকু উল্লেখ করলেই চলবে না। এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করতে হলে আমাদের সেই পৌরাণিক যুগ থেকে ধারাবাহিক আলোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এখন আমরা রামায়ণ মহাভারতের যুগে কি পাই সে সম্বন্ধে দু একটি কথা বলবো।

বাল্মীকির মহাকাব্যে প্রধান চরিত্র জনক দুহিতা রামপত্নী সীতা। তিনি সুখে দুঃখে অচঞ্চলা ধীরা ছায়ার ন্যায় পতীর অনুসারিনী। রামের সঙ্গে তিনি রাজবধূ হয়েও স্বচ্ছন্দে বনে চলেছেন—এ থেকে আমরা প্রমাণ পাই মেয়েরা অবরোধ বন্দিনী ছিলেন না সে যুগে। মেয়েদের স্বয়ম্বরা হওয়া থেকে আমরা জানতে পারি—আপন পতি নির্বাচনে মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হত। রামবধূ মৃদুভাষিনী সীতার এক তেজোদৃপ্তা মহিমময়ী রূপ আমরা দেখতে পাই—রাবণ কর্তৃক হরণের মত অপমানিতা হয়ে। রাবণকে তিনি সে সময়ে যে তিরস্কার বর্ষণ করেছেন তা পড়ে আমাদের চোখের সামনে ভীরু অবলার ন্যায় মৃদু চরিত্রা এক সতীকার ক্ষত্রিয়া রমণী জেগে ওঠেন যিনি মানুষ মাত্রেরই নমস্যা। সীতা বর্জন তিনি নীরবে মেনে নিয়েছিলেন—এতবড় অন্যায় বোধহয় রাম-চরিত্রে আর নেই। সীতা কি শুধু রাজরাণী? তিনিও কি রামচন্দ্রের প্রজা ছিলেন না?—আমাদের মনে হয় সীতা বিসর্জনে রাম একাধারে পতি ধর্ম পিতৃ ধর্ম ও রাজ ধর্মকে বিড়ম্বিত করেছেন। কিন্তু সীতা রামের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ বাণী ও উচ্চারণ করেননি প্রসন্নমনে পতির দান মেনে নিয়েছিলেন—কিন্তু এই সীতাকেই আবার একান্ত বিচলিতা দেখি রামচন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ করার সংবাদ শুনে। এতদিন যে আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি বনবাসে অনমনীয়া অচলা ছিলেন—রামের পুনঃ বিবাহ করার সংবাদের ছায়াপাতে তাঁর সে ধৈর্য্যের অচলায়তন ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়েছিলো—কিন্তু সীতার সব বেদনা ঘুচে মুছে গিয়েছিলো স্বর্ণসীতার সংবাদে। এ থেকে আমরা বলতে পারি রামবিনা সীতা হওয়া হয়ত অসম্ভব হয়ে পড়ত। সে দিনের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যখন রাজাদের মধ্যে বহু বিবাহই স্বাভাবিক ছিল—সেই সময়ে রামচন্দ্রের একপত্নী নিষ্ঠার মহাকাব্য রচয়িতা ঋষির মনে নারীর মর্য্যাদা যে কতখানি জাগরূক ছিল তারই প্রমাণ আমরা পাই। সমস্ত রামায়ণে শুধু রামচন্দ্রই নহেন তাঁহার অন্য তিন ভায়ের সম্বন্ধেও একাধিক বিবাহের উল্লেখ কোথাও পাই না। এ থেকে আমরা বলতে পারি বাল্মীকির মনে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই উভয়ের প্রতি নিষ্ঠা ও সততা সমভাবে আদৃত ছিল। এর পর সীতার আর এক তেজস্বিনী মূর্ত্তি আমরা দেখি তাঁর পাতালে প্রবেশে—পতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই তাঁর জীবনের মত প্রথম ও শেষ বিদ্রোহ। বাল্মীকির মত মহর্ষিও সীতার সমস্যা সমাধানে অক্ষম হয়েছেন কিন্তু সমস্ত মহাকাব্যে নায়িকার চরিত্রের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান বাধেকের জন্য ও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি।

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" স্মৃতি ঋষিবাক্য এবং একাধিক স্মৃতিও ইহাই মত তবুও আমরা বহু সামাজিক বিষয়ে মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতার রূপ দেখতে পাই। রামায়ণের কথা আগেই উল্লেখ করেছি এবার মহাভারতের কথায় আসা যা'ক। মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের উপাখ্যান আমরা সকলেই জানি অর্থাৎ যারা মহাভারত পড়েছি। এই কুরু পাণ্ডবের পিতা বেদব্যাস—এবং এঁরা নিয়োগ প্রথায় প্রাপ্ত ঋষির সন্তান। এ থেকে আমরা দেখি ক্ষেত্র বিশেষে এবং প্রয়োজন হলে সেদিনের সমাজে নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং নিন্দনীয়ও ছিল না। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে ইহা অনেক খানি স্বাধীনতার সূচনা করে। এ

থেকে কেউ যেন না বোঝেন যে সে সময়ে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচলন ছিলো। উচ্ছৃঙ্খলতা বা অনাচার সর্ব্বথা-নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয় ছিল কিন্তু প্রয়োজন হলে ক্ষেত্র বিশেষে বিজ্ঞজন ও গুরুজনদের অনুমতি ক্রমেই এ কাজ সাধিত হত। ইহা সামাজিক উদারতার পরিচায়ক এ কথা মানতেই হবে আমাদের আজকের সংস্কারাচ্ছন্ন মনে যতই তিক্ত লাগুক না কেন।

এর পর আমরা দেখি প্রাতঃস্মরণীয়া পাণ্ডবজননী কুন্তির কোন সন্তানই পাণ্ডুর নহে ইহারা সকলেই বিভিন্ন দেবতার সন্তান। কিন্তু এই কুন্তিদেবীকেই কুমারী অবস্থায় সূর্য্যের আশীর্ব্বাদে কর্ণকে লাভ করার জন্য ত্যাগ করতে হয়েছিলো—এ থেকে আমরা বুঝি সামাজিক বিধি বিধানকে অবহেলা করার ক্ষমতা রাজপুত্রীরও ছিল না কিন্তু সমাজ সে দিন উদার ছিল বিবেচনা সম্পন্ন ছিলো—এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমও অনুমোদিত হত। কুন্তির সপত্নী মাদ্রীও কুন্তির প্রদত্ত মন্ত্রের প্রভাবে অশ্বিনী-কুমারদের আশীর্ব্বাদে নকুল সহদেবকে পেয়েছিলেন কিন্তু এ নিয়ে সামাজিক কোনও বিড়ম্বনার উৎপত্তি হয়নি।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা থেকে সে যুগেও আমরা কন্যার পতি নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা দেখতে পাই। শুধু তাহাই নহে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণেও কোনও বাধা হয় নি। দ্রৌপদী চরিত্র আজও আমাদের পঞ্চকন্যার সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয়া তাঁর চরিত্রের গুণাবলীর জন্য। এ যেন মহাভারতের যুগের কথা। সে যুগেও মেয়েদের অবরোধ প্রথা ছিল না। কেন না আমরা দেখতে পাই দ্রৌপদী রাজবধূ হয়েও বনে চলেছেন। কৃষ্ণ সহোদরা সুভদ্রা হরণের সহায়তায় অর্জ্জুনের রথ চালিয়েছেন। সে যুগে সৌন্দর্য্যে নারীও যে পিছু পরেছিল না, তারই পরিচয় এতে আমরা পাই।

ঋষি মনু এক জায়গায় বলছেন—যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা সুখে নেই আনন্দিত মনে নেই সে গৃহের কখনও কল্যাণ নেই।

সে যুগে অবরোধ যে ছিল না এর প্রমাণ আমরা দেবযানী চরিত্র থেকে দেখতে পাই—আরও দেখি মহিষী অরুন্ধতী সর্ব্বদাই সপ্তঋষিদিগের মধ্যে রয়েছেন। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" নিয়ম থাকায় প্রত্যেক ধর্ম্ম কর্ম্মেই রাজমহিষীদেরও ধর্ম্মসভায় রাজার পাশে এসে বসতে হতো—বহু ক্ষেত্রে প্রধানা মহিষী সিংহাসনে অর্দ্ধাসিনী হতেন।

যাজ্ঞবল্ক এক জায়গায় বলছেন—

"ক্রীড়াং শরীর সংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যান-ত্যজেৎ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।"

অর্থাৎ স্বামীর অবর্ত্তমানে স্বাধ্বী স্ত্রী কোনও রকম উৎসব বাসনে যোগ দেবে না বা সাজসজ্জা করবে না—কিন্তু স্বামীর উপস্থিতিতে এবং অনুমতিতে স্ত্রী সবই করতে পারবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সেকালের ঋষিরা মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" অর্থাৎ কন্যাও যত্নের সহিত পালনীয় ও শিক্ষণীয়। সেকালে পুত্র কন্যা উভয়েই গুরুগৃহে যেতেন এবং সুযোগ্য গুরুর কাছে বিদ্যা অর্জ্জন করতেন। বহু নারী বেদবাদিনী ছিলেন—অত্রি ঋষির কন্যা বাক্ দেবী সূক্ত রচনা করেছিলেন। রাজর্ষি জনকসভার সাধীকেই আমরা সমস্ত অন্যান্য ঋষিদের মুখপাত্র হয়ে যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে তর্কসভায় নেমেছেন দেখতে পাই। বৈয়াকরণী লীলা অমরের অধিকারিণী হতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ্ববেদী পঞ্চাধ্যায়ী নামক একখানি স্মৃতি সংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মী-দেবীর বিবাহের টীকা অদ্যাপি প্রচলিত উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী গণিতশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতা ছিলেন। মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্রের পত্নী তর্কসভায় শাস্ত্রবাদী বিচারের মধ্যস্থতা করার অধিকার পান। এই দুই মহাপণ্ডিতের বিচারে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও বিবেচনার পরিচয় দেন তাহা চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আজও লোক পরম্পরায় লোকের মুখে মুখে শোনাযায় ১২০৫ খৃষ্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ লেখা হয় অর্থাৎ সঙ্কলিত হয়। সেই সময়কার প্রসিদ্ধ কবিদের ৫টি করে কবিতা এর মধ্যে নেওয়া হয়। এই কবিদের মধ্যে নিম্নলিখিত মহিলা কবিগণের নাম আমরা পাই। বিদ্যা, বিজয়া, বিলা, চট্টারিকা, ব্যাসপাত্নী, ভাবদেবী, সাটোনা ও চণ্ডাল-

বিদ্যা ইত্যাদি। তাদের বিষয় আলোচনা করলে আমরা বহু বিদুষী ব্রহ্মবাদিনী পণ্ডিতা নারীর বিষয় জানতে পারি এবং এঁরাই সেদিনের মেয়েদের সমাজে উচ্চ স্থান ও মানের কাঙ্ক্ষনা প্রমাণ। সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা উচিৎ এবং সুযোগ্য পাত্র না পেলে মেয়ে বরং কুমারী থাকবে তবু কদাপি অপাত্রে কন্যা দান চলবে না ইহাই যাজ্ঞবল্ক মনু প্রভৃতি ঋষিদের মত।

সুযোগ্য বরের লক্ষণ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক বলছেন "মাতাপিতৃ বিশিষ্ট বেদবিৎ সমান বর্ণের পুরুষ বর হইবে। বর যেন সুধী লোকপ্রিয় ও ধীমান্ হন।"

এখন দেখা যাচ্ছে এমন বরে কোনও আধুনিকা বা তার পিতামাতারও আপত্তির কোনও কারণ নেই। যোগ্য বর না পেলে সারাজীবন পিতৃ গৃহে বাস করার যুক্তি দিয়ে তাঁরা মেয়েদের বয়েই সামাজিক মান বাড়িয়ে গেছেন। এঁরা আরও বলছেন—কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হলে পিতামাতা বা অভিভাবকেরা যদি যোগ্য পাত্রের সন্ধান না করেন ও তার বিবাহ চেষ্টায় অবহেলা দেখান কন্যার স্বয়ম্বরা হবার পূর্ণ অধিকার আছে। মনু আরও বলছেন যোগ্য পাত্রে কন্যাদানে অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। যোগ্য বর কথাটি বার বার বলা হয়েছে। ঋষিরা আরও বলেছেন মেয়েদের সদা যত্নে রাখতে। যে গৃহে মেয়েরা সুখী সে গৃহ দেবতার বাসস্থান এবং তার সৌভাগ্য কল্যাণ। যে ঘরে মেয়েরা দুঃখ পায় তার বিনাশ ঘটে। তাঁরা বলছেন ইহলোকে সুখী হতে উদ্যুক্ত পুরুষেরা উৎসবে ও সৎকার্য্যে স্ত্রীলোকদের ভূষণ, আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা পূজা করবে। এই সব দেখে মনে হয় বৈদিক যুগে মেয়েরা যথেষ্ট মর্য্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে বাস করতেন।

কিন্তু এই ঋষিরাই আবার স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলতে বলেছেন—কায়মনোবাক্যে স্বামীর সেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম। স্বামী কাণা, খোঁড়া অকর্মণ্য, দুষ্ট যাই হ'ক না কেন স্ত্রীর সেই গুরু পূজ্য ও ইষ্টদেবতা—তাহার অন্য গতি নেই। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক, ব্যাস, ও মনু ভিন্ন প্রায় সব ঋষিরাই সহমরণ সমর্থন ও তার গুণগান করে গেছেন; এ থেকে আমরা পাই জোর করে না হ'ক সহমরণের জন্য যথেষ্ট প্রলোভন ও উপদেশ দেওয়া হত। স্ত্রীর ধনাধিকার বড় কিছু ছিল বলে মনে হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা ভরণপোষণ পেতে পারতেন মাত্র। স্ত্রীলোকদের প্রায় সারাদিনই মত প্রভৃতির থেকে গৃহ কাজে ব্যাপৃত থাকতে হত। সামান্য কারণেই স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণের পথ খোলা ছিলো বলতে বাড়িয়ে বলা হবে না—অপ্রিয়বাদিনী, গৃহকাজে অবহেলাকারিনী, মুক্তহস্তে ব্যয়কারিনী স্ত্রী পরিত্যাজ্যাহী। সেকালের অবস্থা আলোচনায় আমরা মোটামুটি ভাবে দেখি মেয়েদের অবস্থা ভালই ছিলো।

তারপর মনে হয় ভারতবর্ষ যখন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে আরম্ভ হলো—দেশে অরাজকতা লুটতরাজ প্রভৃতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের তথা সমাজের অবনতির সূত্রপাত হতে আরম্ভ হল। অশিক্ষা সতীদাহ বাল্যবিবাহ বহু বিবাহ প্রভৃতি নানা অনাচার মাথা তুলে দাঁড়ালো। সত্তাকার পণ্ডিতদের তিরোধান ও অজ্ঞান সংস্কার সর্বস্ব ব্রাহ্মণদের অধিপত্য সুরু হওয়ায় সামাজিক নিম্নগতি বেড়েই চললো। মুসলমানের আগমনে মেয়েরাও লুণ্ঠন সামগ্রী হয়ে পড়ায় মেয়েদের জীবন আরও বিড়ম্বিত হয়ে গেল। রাজপুতানার মেয়েরা বহু ক্ষেত্রে জহরব্রতে রাজী হলেন—এবং রাজপুত ঘরে কন্যাকে শস্ত্র চলার রাখা স্বরূপ মনে করায় অনেক স্থলে শিশুকালেই হত্যা করা হত শোনা যায়।

বাংলার চরম অবনতি কুলিন ব্রাহ্মণদের সময় থেকে বা তৌলিক প্রথার জন্যই। মেয়েদের অবস্থা সমাজে তখন চরম দুর্গতির পথে এগিয়ে চলেছে। মেয়েদের অবরোধ অশিক্ষা সব তখন পুরো মাত্রায় মাথা তুলে দাঁড়ালো সামান্য পদস্খলনেই তা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আজন্মের মত মেয়েদের জীবন বিড়ম্বিত হয়ে যেত। সমাজের কাছে ক্ষমা বা ক্ষেত্র বিচার বলে কোনও কিছুই আর রইল না। শস্ত্রপক্ষ ভাল করেই জানলো হিন্দুর মেয়েকে ছলে বলে কৌশলে যে কোনও উপায়ে একবার ঘরের বার করতে পারলে তার সামনে সমাজের দরজা চিরতরে বন্ধ। সত্তাকার ন্যায় বিচার বা দোষীর যোগ্য দণ্ড সমাজের আর রইল না। সমাজ দুর্বলকে আরও আঘাত হানতে উদ্যত থাকলো। এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে অন্ধকারে জ্যোতিষ্কের মত উদিত হলেন মহর্ষি রাজা রামমোহন রায়। অন্ধকার

যুগের বিনাশে ভারের বলসিত তরবারী নিয়ে তিনি বীরের মত অম্লানমুখে একাই দাঁড়িয়ে ছিলেন—ইংরাজরাজের সাহায্যে আইন করে সতীদাহ বন্ধ করালেন। মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন করালেন বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুললেন—মেয়েদের এত বড় বন্ধু বুঝি আর নেই—এর পর এলেন ঈশ্বর সাগর বিদ্যাসাগর; তিনিও অনলসভাবে চেষ্টায় আজন্ম সমাজ সংস্কারকরূপে মেয়েদের জন্য আন্দোলন করে গেলেন—সফলও হলেন—বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য। বিধবা বিবাহ আইন-সম্মত করা হল-তাঁরই চেষ্টায়। আজকের দিনে আমরা মেয়েদের যে অবস্থায় দেখি এর জন্য বহু মনিষীর আজন্ম সাধনা রয়ে গেছে। কিন্তু আইন করেই সব সময় ভাল করা যায় না—ভাল করার জন্য চাই শিক্ষা। সেই শিক্ষা যতক্ষণ না দেশের প্রতিটি মানুষ পাবে, দেশ উন্নত হতে পারবে না।

স্বাধীন ভারত সংবিধান, মেয়ে পুরুষের সর্ব বিষয়ে সম অধিকার দিয়েছেন। হিন্দু কোড বিল পাশ ও ডিভোর্স বিল চালু করে মেয়েদের স্বাধীনতা আরও এক ধাপ এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন মেয়েদের কোনও অর্থকড়ি স্বাধীনতা ছিল না স্বাধীন ভারতে তা স্বীকৃত হয়েছে। এখন আজকের মেয়ের সব সময় সচেতন থাকা উচিৎ এই নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে। স্বাধীনতার অনেক মান অনেক দায়িত্ব। আজকের মেয়েরা যদি তাঁদের এই স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে অন্যায় আচরণ করেন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেন সে দুঃখ রাখার ঠাঁই আর হবে না। ক্ষমতার অপব্যয় কখনও করা উচিত নয়। ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দায়িত্বও বেড়ে যায় এ কথা মনে রাখতে হবে। আত্মসচেতন মেয়ে যে কোনও অবস্থায় যে কোনও দেশে এমন আচরণ কিছুতেই করবে না—যা তার নিজের ও তার দেশের অমর্যাদা করা হবে।

মানুষ আশাবাদী—ভবিষ্যতের মেয়েকে সকল স্বাধীনতা সম্পন্নকর কাজে মর্যাদার সঙ্গে সুনামে ও গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেখবার আকাঙ্ক্ষা মনে নিয়ে আগত সম্ভাবনাময় দিনের দিকে চেয়ে থাকব।

শুধু অনন্যা নয়—বিচিত্রা

(গল্প)

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

সকাল আটটা দশ মিনিটের সময় ডাকোটা প্লেন ধমধম বিমানঘাঁটি থেকে ছেড়ে ঠিক দশটা দশ মিনিটে দৌহাটীতে এসে পৌঁছলো।.....

প্লেন থেকে নামতেই পার্থ দেখলো বহু বিশিষ্ট নর-নারীর সমাবেশ। সকলেই এসেছে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। এবার তাঁকেই সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি করা হয়েছে। সুদীর্ঘ দিন সাধনার পর প্রৌঢ় বয়সে এভাবে সম্মানিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে পার্থ। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস এন রায় এসেছেন সস্ত্রীক তাঁকে নিতে। ইনিই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সকলের সঙ্গে নমস্কার প্রতিনমস্কারের পর মিষ্টার রায় বললেন—'পথে কোন কষ্ট হয় নি তো?—'

পার্থ বললে—'গায়ের ওপর দিয়ে আসবার সময় এয়ার পকেটে পড়ে প্লেন দু'একবার কাঁপ করেছে, এছাড়া কোন অসুবিধে হয় নি—'

মিষ্টার রায়ের কিশোরী কন্যা তনতী পার্থের কণ্ঠে ফুলের মালা পরিয়ে দিল। সৌন্দর্যে সে যেন তার মা বাবাকেও হার মানিয়েছে। মিষ্টার রায় এসে দাঁড়ালেন পার্থের পাশে। বললেন—'আপনি আমাদের অতিথি, অতএব নজরবন্দী, আর থাকবার ব্যবস্থাও আমাদের বাংলোতে—'

পার্থ মৃদু হেসে বললে—'এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা—জেলার অধিকর্তার আশ্রয়ে থাকবো—'

মিসেস্ রায় বললেন—'সৌভাগ্যটা আপনার নয়, আমাদের—'

বিমানঘাঁটির রিয়াট প্রাঙ্গণ থেকে সঙ্কীর্ণ ফটকের মধ্য দিয়ে পার্থকে নিয়ে আসা হোলো বিশ্রামভবনের একতলায় যাত্রীদের,—তারপর তাঁকে বসিয়ে ফটো নেওয়া হোলো। মিসেস্ রায় পার্থের পাশের চেয়ারে বস্‌লেন। কয়েক মিনিট ধরে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর মিষ্টার ও মিসেস্ রায় পার্থকে নিয়ে তাঁদের বাংলোর যাত্রা কর্‌লেন।

মিসেস্ রায়কে দেখে পার্থ চিন্‌তে পেরেছে। এঁর কথা সে কেমন করে ভুল্‌বে।.....

এদিন দুপুর বেলায় পার্থ যখন মিষ্টার রায়ের বাংলোর একটি নির্জন কক্ষে আহারাদির পর বিশ্রাম কর্‌ছে, তখন দরজার পর্দাটা একটু ফাঁক করে মিসেস্ রায় বল্‌লেন—'ভেতরে কি আস্‌তে পারি?'

পার্থ গাত্রোত্থান করে বল্‌লে—'আসুন—'

মিসেস্ রায় মৃদু হেসে বল্‌লেন—'কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?—'

'—রাজসম্মানেই রয়েছি, এরপরও অসুবিধা!—'

মিসেস্ রায় সোফায় ওপর বসে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লেন—'আপনার খবর কিছু কিছু রাখি, আপনি না রাখতে পারেন অপরের—' এই কথাটা যাতে মিসেস্ রায়ের মুখ থেকে কোন রকমে না বেরোয়, তার জন্যে খুব সতর্ক হয়েছিলেন এতক্ষণ। অসতর্ক মুহূর্তে মানুষ এরিচারেই ভুল করে বসে, পরে অনুতপ্ত হয়। মিসেস্ রায়ের কথার জবাব দিতে গিয়ে পার্থ বল্‌লে—'আমার পক্ষে কি করে সম্ভব বলুন,—সংবাদ-পত্রে বহুদিন আগে আপনার বিয়ের খবর আর নবদম্পতির ফটো দেখেছিলাম, এই পর্য্যন্ত—কোন যোগসূত্র না থাকলে খবর রাখা সম্ভব নয়, আর আপনার মত পরস্ত্রীর খবর রাখতে যাওয়া আমার পক্ষে অপরাধ নয় কি? যেখানে সম্পর্ক থাকে, যোগাযোগ হয়, সেখানে চলে—'

মিসেস্ রায় কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না,—তাঁর সুন্দর মুখখানিতে যেন একটা ছায়া নেমে এলো।

নিজেকে কোন রকমে প্রকৃতিস্থ করে বল্‌লেন—'বিয়ে করে ঘরসংসারী তো হোতে পার্‌তেন—'

'—এরকম রংচঙে অন্ততঃ আপনার মুখে শোভা পায় না।—যাক্, এখন আমার মত ও পথ বদ্‌লে গেছে, আমি অন্য মানুষ—'

মিসেস্ রায় মর্ম্মাহত হোলেন। নিজের মনে বল্‌লেন—'এর জন্যে দায়ী কে? হয়তো আমি—'

অটোগ্রাফের খাতাখানি পার্থর হাতে দিয়ে অনুরোধ কর্‌লেন—'কিছু লিখে দিন—'

'—লিখবার কিছু নেই, স্বাক্ষর করে দিলেই তো হবে—কেমন?'

'—কিছু লিখে যেতেন না?—'

গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখে পার্থ কি ভাবলো, পরে বল্‌লে—'লিখবার কোন প্রয়োজন বোধ করি নে—মিসেস্ রায়!—'

ব্যগ্র হয়ে মিসেস্ রায় বল্‌লেন—'খাতাটায় ভেতর দেখুন সকলেই কিছু না কিছু লিখে দিয়েছেন, আর আপনি—'

পার্থর মৌনতায় মিসেস্ রায়ের মন ভরে যায়। কথার কণ্ঠরোধ ঘটে গেল। তারপর পার্থ উদাসীর মত ভাব দেখিয়ে বল্‌লে—'সংসারের নির্ম্মম আঘাতে আমার বহু কল্পনার পাখা ঝরে পড়ে গেছে, সেগুলি কুড়িয়ে এনে স্মৃতির মণিকোঠায় তুলে রেখেছি কিন্তু তাদের সম্বন্ধে হয় তো বলা চলে, লেখা চলে না—'

'—একি কথা বল্‌ছেন কবি!—'

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে পার্থ বল্‌লে—'আমার জীবনের খাতায় আপনি যা লিখে দিয়েছেন, তার ওপর আমি কিছু লিখতে গেলে, তা ম্লান হয়ে যেতে পারে—আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না,—আপনি শুধু অনন্যা ন'ন, আপনি বিচিত্রা—'

পার্থর মুখ থেকে এরূপ কথা শুন্‌তে হবে মিসেস্ রায় ভাবতে পারেন নি, একটু সঙ্কোচ বোধ কর্‌লেন। শেষে দাঁড়িয়ে রইলেন মন্ত্রাহতের মত পার্থের কথা শুনে। মনে হোলো তাঁর সারা মনে ঘনিয়ে এসেছে বিষাদের ছায়া। অটোগ্রাফের খাতায় পার্থ স্বাক্ষর করে দিতেই মিসেস্ রায় তাতার দুটি চোখ মেলে এমন ভাবে তাঁর পানে চাইলেন, মনে হোলো যে এটী তাঁর না-বলা কথার ধৈর্য্যচ্যুতির ইঙ্গিত।

পার্থ সহজভাবেই বল্‌লে—'আপনার সন্তান ক'টী—'

মিসেস্ রায় বোধ হয় কিছু ভাবছিলেন, যেন খতমত খেয়ে উঠলেন, তারপর মন্দ্রভাবে বল্লেন—'একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—ছেলেই বড়—'

'—ছেলেটিকে তো দেখছিনে—'

'—কল্কাতায় থাকে, সেণ্টজেভিয়ার্সে পড়ে, বোর্ডিংএ রেখেছি—'

কিছুক্ষণ এরিভাবেই উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলে কিন্তু কোন প্রসঙ্গই জমে ওঠে না, কেমন যেন খাপছাড়া ভাব, এর কারণ হয় তো মিসেস্ রায়ের মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতা।

তপতী আসতেই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটলো। মিসেস্ রায় বল্লেন—'এখানে যে কদিন আছেন, আমার এই মেয়েই আপনার দেখাশুনা করবে—খুব স্মার্ট, পরিচয়েই বুঝতে পারবেন, তা ছাড়া নাচে গানে বাজনায় এরই মধ্যে বেশ নামও করেছে—'

'—তাই না-কি? তবে তো শুনতে হবে—'

তপতী মায়ের ইঙ্গিত পেয়ে এস্রাজ এনে গান সুরু করে দিল।

একটু পরেই মিষ্টার রায় এলেন। বল্লেন—'কবি! কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?—'

'—এত আদর যত্নের ভেতর থেকেও—'

মিষ্টার ও মিসেস্ রায় মৃদু হাস্লেন। তপতীর গান চল্তে থাকে, মাঝে মাঝে পার্থ গানের তারিফ করে তাকে উৎসাহিত করতে থাকে। কিন্তু এদিনের পর থেকে মিসেস্ রায় পার্থর ঘরে প্রবেশ করা বা তাঁর সান্নিধ্যে এসে দু'দণ্ড কথাবার্ত্তা বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি; কেন—তা কে জানে। পার্থর ধারণা অভিজাত সমাজের প্রত্যেকটী নারী আলেয়ার মত, এখানেও এসে সেই কথাই অন্তরেও পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

এই মিসেস্ রায়ই 'মেকেঞ্জারের' সেই ইন্দিরা ঘোষাল! —এঁরই অতীত জীবনের ইতিহাসের টুক্রো পাতা ঘটনাচক্রে হঠাৎ যেন উড়ে এসেছে গোপালীর এই চিঠিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয়—

সেই পাতাই তুলে ধরে দেওয়া যাচ্ছে আজ্কের প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে।

গ্রাণ্ড হোটেল। এর ধারে রোজই সন্ধ্যায় বহু মোটর এসে থামে। বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরা অভিজাত সুন্দরী মহিলাদের সমাবেশ হয়। কেউ বা একাকিনী, কেউ বা প্রণয়ী বন্ধু, স্বামীর, স্বজন-পরিজন বা স্বামীকে সোসর করে আনেন। এঁরা হোটেলে প্রবেশ করেন অভিজাতসুলভ মার্জ্জিত ভঙ্গীতে সৈশভোজ, নৃত্যগীত ও নানা আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে। মনে হয় আসে তখন দিবসের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য। সহস্র সহস্র বিজলী বাতির দীপালোকে কলিকাতা নগরী নটীর মত প্রসাধন সজ্জায় সুশোভিতা হয়ে অভিসারিকার রূপ ধারণ করে।

বালিগঞ্জের সার্কুলার পার্ক রোড থেকে পার্থ এসি সন্ধ্যায় এসে দাঁড়ায় তার প্যাকার্ড গাড়ীখানি এক ধারে রেখে ঠিক হোটেলে ঢুকবার পথে। একটু পরে দেখা যায় একটী পরমা সুন্দরী তরুণীকে অতি আধুনিক মডেলের বিরাট মোটরখানি ড্রাইভ করে এখানে আসতে—সঙ্গে থাকে শুধু লোকেয়ার আর বালকভৃত্য। পরণে শাড়ী আছে বটে, কিন্তু দেখলে মনে হয় না বাঙালী—ঠিক যেন চেক যুবতীর মত বর্ণাঢ্যা ও স্বাস্থ্যবতী। তার বয়স যে ত্রিশ পেরিয়ে গেছে, তা বলে মনে হয় না, বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। হাবভাবে, চালচলনে সে যে বেশ 'স্মার্ট', তা সহজেই অনুমেয়।

পার্থ ক্ষুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়ায় বেশ কৌতূহলভরে হয়ে সে যখন গাড়ী থেকে নামে। অবশ্য এই তরুণও সুদর্শন, দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণোজ্জ্বল। তাকে দেখলেই মনে হয় বড় ঘরের ছেলে, ব্যাঙ্কে বেশ মোটামুটি টাকাই জমেছে, কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তার যৌবনের সুখের স্বপ্ন, তার জীবনের নিত্য আশা আকাঙ্ক্ষাকে সুন্দরী তরুণীর মাঝে মূর্ত্ত করে তুলতে।

একজন কবি যেমন একটা বিশেষ মুহূর্ত্তে ভালোমন্দ সব কিছুর মধ্যেই খুঁজে পায় কবিতার উপাদান—অনুরক্ত রসের পাত্র সন্ধান, তেমনই কোন প্রেমিক কোন সুন্দরী তরুণী দেখলে তার সান্নিধ্যলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, উত্তেজনার চরম মুহূর্ত্তে অনর্গল বাক্চাতুর্য্য দেখাতে উদ্যত হয় কিন্তু পরিণতি অনেক সময়েই করুণ ট্রাজেডিও ঘটিয়ে দেয়। একথাও সত্য, কিউপিড যুগের নাইটের মত ছেলেই

যে সুন্দরীর বরমালা পাওয়া যাবে, দুটো ঠুমরি গান গেয়ে সম্মোহিত করে নারীর মনে রিরংসা জাগানো যাবে, ফোলো প্রেমের কবিতা লিখে রূপসী ললনার প্রণয়পত্র পাওয়া যাবে, যাদের খাতা আর নিউ মডেলের চটকদার মোটর দেখিয়ে তরুণীকে কুক্ষিগত করা অসম্ভব হবে না—এ ধরণের ধারণা যাদের ভেতর আছে তারা ভ্রান্তবিলাস ঘটিয়ে দুঃসাহসিকতার শোচনীয় পরিণতির ওপর নিজেদেরই জীবনের সমাধিক্ষেত্র নিজেরাই রচনা করে। কারণ সুন্দরী নারীকে যতখানি নিকটে পাওয়া সম্ভব, ততখানি হয়তো পাওয়া অসম্ভব নয় সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মাধ্যমে বা নানা অমলিন প্রলাপোক্তির অপকৌশল প্রয়োগে কিন্তু আত্মসমর্পণ করে বা সমস্ত অনুভূতি উজার করেও তার আত্মার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, একথা অনেকেই ভুলে যায়—ঐশ্বর্যের বর্ণাবরণে আচ্ছাদিত আত্মার রৈক্ত কি নারীর ভালোবাসার পথ রচনা করতে পারে?—ইন্দ্রিয় সেবাই হোক্ আর প্রেম চর্চাই হোক্ কামাচর্চার মতই কঠিন কলাবিদ্যা—এই ধরণের মতবাদ বহু মনস্তাত্ত্বিকের গ্রন্থ থেকে অন্তরে আহরণ করেছে পার্থ। এইসব নীতি-মূলক রচনাগুলি তার কাছে কেমন করে ভালো লাগবে? তার মনে শুধু একটি প্রশ্নই বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়—'তবে কেমন করে নারীর প্রেমে পড়া যায়?—'

পার্থ কলেজে পড়বার সময়ে উচ্ছৃঙ্খল বয়সের চাপে কয়েকটী তরুণীর সঙ্গে অবাধ ও অবৈধ মেলামেশা করেছে, কবিতাও লিখেছে তাদের নিয়ে—কারো চুলের জিতে, কারো মাথার কাঁটা, কারো শাড়ীর পাড় হয়েছে তার কবিতার বিষয়বস্তু যার ফলে তার অনেক অর্থব্যয় আর সময়ের অপব্যবহার হয়েছে—আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে, নারীর চরিত্র চরিত্র বুঝবার চেষ্টা করতে করতে শেষে তার নৈতিক আদর্শ নষ্ট হয়ে গেল—ভালো ছেলে হয়েও শেষে কোনরকমে থার্ড ক্লাস এম-এ হয়ে যখন বেরিয়ে এলো তখন বহু আত্মীয় স্বজনের কাছে সে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে যে ছেলে বরাবর স্কলারশিপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী সিঁড়ি উঠলো, তার এই শোচনীয় পরিণতিতে সব চেয়ে আঘাত পেয়েছিলেন তার বৃদ্ধ দাদু হরিশঙ্কর চৌধুরী—পিতামাতা ও যে আঘাত পাননি তা নয়, তবে তাঁদের সান্ত্বনা এই যে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা কৃতী হয়ে সংসারক্ষেত্রে সুখের ভাবে কালাতিপাত করছে—কনিষ্ঠ পার্থ-ই কেবল ব্যতিক্রম—মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান বলে বৃদ্ধ হরিশঙ্কর এই ছেলের ওপর অনেক আশা পোষণ করেছিলেন, তাই আঘাতটা দারুণভাবে তিনিই পেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর পয়সার তো অভাব নেই, প্রতিষ্ঠোর হয়ে যা গুছিয়ে নিয়েছেন, তার আনুকূল্যে করেক পুরুষ ধরে চাল বজায় রেখে চলবার মত হয়েছে।

পার্থর প্রত্যেকটি ভাইবোনের পেছনে লাগর পারের ভিড়ী আছে, কাজেই তারা উঠেছে সমাজের অনেকখানি উপরতলায় বেশ হোমরা চোমরা হয়ে—তার দুই বোনের বিয়ে হয়েছে লিভিলিয়ানের সঙ্গে, অথচ তারা সংসারে চুপ করে বসে থেকে অলস জীবন যাপন করে মেয়েলীত হচ্ছে না, তারা ও উচ্চ পদে রয়েছে ভারত সরকারের দপ্তরে। এটা তো ঠিক—আজকের দিনে মেয়ে পুরুষের ভেতর প্রত্যেকেরই স্বাবলম্বী না হোলে শেষে অনুশোচনায় অশ্রুপাত করতে হয়।

যা হোক্ পার্থ যে প্রেমের মোহাই দিয়ে ভাবের উন্মাদে প্রমত্ত হবার উদ্দেশ্যে মেয়ে মহলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, এ সম্পর্কে চৌধুরী পরিবারের কেউ জানবার ও চেষ্টা করেনি, আর কারো কানে ও কোন কথা আসেনি। হাসি, উচ্ছ্বাস, প্রলাপ, অর্ঘ আর নির্লজ্জ প্রেম নিবেদন করেও যাদের মন পায়নি, তারা তাকে এড়িয়ে চলে গেছে কিন্তু কেউ তার বিরুদ্ধে কোথাও অভিযোগ করেনি, এমন কি কোন উড়ো চিঠি ও চৌধুরী পরিবারের কাছে গিয়ে পৌঁছোয়নি।

গ্রাণ্ড হোটেলে বেশ কিছুদিনের বহু মেয়েই তো আসে,—এই অপরিচিতা মেয়েটির জন্যে সে যে কেন এমন ভাবে এসে রোজ তাদের কাজের মত অপেক্ষা করে, এর উত্তর হয়তো তার জীবনের পাটীগণিতের পরিশিষ্ট ভাগে আছে। তরুণীর তরীদেহের যৌবন শ্রী পার্থকে এমনই আকৃষ্ট করে যে, তার মুখের পানে তাকিয়ে বহুবারই মুগ্ধ হেসেছে কিন্তু তার ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি মুখভঙ্গীর মনে বোধ হয় কোন রেখাপাত করেনি, তা হোলে তো তার জীবনের

একটা নতুন অধ্যায় রচিত হোতে পারতো। এই ইঙ্গিতকে আশ্রয় করে সঙ্গে সঙ্গেই!

সংজ্ঞাত লীলায়িত ভঙ্গীতে যুবতী সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের উপরতলায় উঠে যায়, পার্থও তার পিছু-পিছু গিয়ে তাকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে আর অনবরত সংগ্রাম করে ঔদাসীন্যের প্রাচীর ভাঙবার জন্যে। যে টেবিলের ধারে বসে তরুণী ভোজনের তালিকা দেখে 'বয়কে' প্লেট সাজিয়ে আনবার জন্যে আদেশ করে, পার্থও অনুরূপ আদেশ করে ঠিক তারই কাছাকাছি এসে। খাওয়া দাওয়ার পর মেয়েটী চার্জ মিটিয়ে দিয়ে মোটরে ওঠে, পার্থও তারই তালে তাল দিয়ে পিছু পিছু চলে আসে। মেয়েটি মোটরে উঠে ষ্টীয়ারিং ঘুরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্থও তার মোটরে 'ষ্টার্ট' দিয়ে পিছু পিছু চলতে থাকে।

তরুণী 'মে-ফেয়ার'এ এসে তার বাড়ীর দরজায় গোড়ায় মোটর থামিয়ে নেমে পড়ে', পার্থ বাঁকা চোখে তাকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তার মোটর নিয়ে—এই ভাবেই দিনগুলি যায় রোমান্টিক পরিবেশে। পার্থ কোন মতেই তরুণীর সঙ্গে আলাপ করবার অবকাশ পায় না,—তার হৃদয়ে ভাবে নারী চরিত্র অদ্ভুত! দেবতারাও চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে না, মানুষ তো এ বিষয়ে একেবারেই শক্তিশূন্য।

মাঝে মাঝে আচম্বিতে তার চেহের স্নায়ু শিরায় তড়িৎ খেলে যায়। একটি প্রহরের সাহচর্য্যের বদলে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে ও পার্থ প্রস্তুত, তবু পায় না তরুণীর অনুকম্পা—তবে কি পাষাণ প্রতিমার মত বধির! তরুণীর কাছে কেমন করে সে হৃদয়ের উত্তপ্ত কামনার সামান্যতম আভাস দেবে? রূপসীর বিলাস-লব্ধ গর্ব্বিত মনের কোণে শক্তি ও ঔদার্য্যের সন্ধান করবার সুযোগ ও আসে না, পার্থ ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ে।

সে ভেবে দেখেছে বিশ্বাসী বান্ধবী হিসেবে একথা যাদের পেতে চেয়েছে, তারাও শেষ পর্য্যন্ত তাকে ঠকিয়েছে। তবে কি হতাশায় আত্মহত্যা করবে! নিজের মনে বলে ওঠে—

'কেন? আমি কি পুরুষ নই!'—অন্তরের গহন-গুহাশ্রিত আত্মা নিরন্তর চীৎকার করছে—'সাহস অবলম্বন করো'—'

বোধ হয় সেদিন ডিসেম্বর মাসের কোন একটা তারিক। কনকনে শীত—ঝুপ্ ঝুপ্ করে ঝরছে বৃষ্টি। গ্রাণ্ড হোটেল থেকে বাড়ী ফেরার পথে যুবতীর ষ্টিয়ারিংয়ের গাড়ীখানির কল বিগড়ে গেল। পার্থ নিজের গাড়ীখানি একটু আড়ালে রেখে লক্ষ্য করতে লাগলো যুবতীর কার্য্যকলাপ। লোকেয়ার নেমে গাড়ীটা মেরামত করবার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু মুষলধারে শীতের দিনে অসময়ে বৃষ্টি নেমে এমন একটা পরিস্থিতি ঘটিয়ে তুললো যে, লোকেয়ারের পক্ষে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হোলো না।

পার্থ এই সুযোগই তো খুঁজছিল—তার গাড়ীখানি সেখানে এনে তরুণীকে বললে—'আমার গাড়ীতে আসতে পারেন যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারি'—

তরুণী পার্থের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে বললে—থ্যাঙ্কস্, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, 'ব্যবস্থা করে নিতে পারবো'খন'—

—'বলেন তো, ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারি, এ, এ, কি কে খবর দিতে পারি'—

—থ্যাঙ্কস্, আমার জন্যে আপনার ভাবতে হবেনা'—

পার্থ ভেবে দেখলো এরপর আর কথা চলে না। অন্তরেও খুব আঘাত পেলো—তার মানসিক দৌর্ব্বল্য যে কোথায় তা হয়তো তরুণী বুঝতে পেরেছে। যা হোক্ পার্থ ম্লান মুখে হতাশায় বাড়ী ফিরে এলো। যাকে সে মনোমত সঙ্গিনী করে নেবার জন্যে দিনের পর দিন গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে দাঁড়ায় আর তবু বাড়ী পর্য্যন্ত তাকে অনুসরণ করে, তার বিষয়ে সে তো কিছুই জানে না। নিজের মনে বলে—'তার অন্তর কি লোহের মত নিরেট!'

পরদিন তরুণী যথা সময়ে গ্রাণ্ড হোটেলের সামনে এলে পার্থ অদ্ভুতভাবে আত্মগোপন করে অন্তরালে রইলো। গাড়ী থেকে নেমেই তরুণী দ্রুত পদে গ্রাণ্ড হোটেলের ভেতর ঢুকে গেল। অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলো পার্থ। তরুণীর গাড়ীর কাছে গিয়ে সে লোকেয়ারকে ডাকলো।

গাড়ী থেকে সোফেয়ার বেরিয়ে এলো। বল্‌লে—'আমাকে ডাক্‌ছেন কেন?'—

পার্থ একটু ইতস্তত: করে বল্‌লে—'যদি কিছু না মনে করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি'—

সোফেয়ার আগ্রহ ভাব প্রকাশ করে বল্‌লে—'কি কথা?'

—'এই ইণ্ডিয়েকার গাড়ীখানি চালিয়ে যে মহিলাটী গ্রোভ গ্রাণ্ড হোটেলে আসেন উনি কে?'

এ কথায় সোফেয়ার ঈষৎ হাস্‌লো—বল্‌লে—'ঠিক এই কথাই উনি আমাকে কাল জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন কাল যখন তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে চলে গেলেন, কোন উত্তর দিতে পারিনি'—

—'তা হোলে আমার ওপরও নজর পড়েছে দেখ্‌ছি—হাঁ, ওর পরিচয়টা'—

—'ওঁর নাম মিস্ ইন্দিরা ঘোষাল,—মা বাপের একমাত্র মেয়ে—বিলেত থেকে পি, এচ্ ডি, হয়ে এসেছেন'—

—'ওঁর বাবা কি করেন?'

—'ওঁর বাবার মস্তবড় হার্ডওয়ার বিজিনেস—ওঁর বাবা বিজিনেস ম্যাগনেট, নাম শচীন্দ্র ঘোষাল'—

—'ওঁর পূর্ব্বপরের কথা হচ্ছে কি?'—

—'হচ্ছে বটে, ওঁর একেবারেই ইচ্ছে নেই, তবে মা বাবার বিশেষ জেদ হয়েছে, তাই অমত কর্‌তে পার্‌ছেন না'—

—'কোথাও ঠিক হ'য়েছে কি?'—

—'ঠিক হয়নি বটে, তবে এক জায়গায় অনেকখানি এগিয়ে গেছে কথাবার্ত্তা,'—

—'কোথায়? জান্‌তে পারি কি?'

—'দেখুন, বলাটা কি ভালো হবে'—

—'বলুন না, আপনাকে কিছু সন্দেশ খেতে দিয়ে যাচ্ছি'—

কথা শেষ হতে না হোতেই পার্থ দশ টাকার একখানি নোট বের করে সোফেয়ারের হাতে দিল। গরীব বাঙ্গালী ভদ্র ঘরের ছেলে এই সোফেয়ারের পক্ষে দশটাকার নোট প্রত্যাখ্যান করা দুঃসাধ্য। টাকাটা হাতে পেয়েই সোফেয়ারের মুখ খুলে গেল। বল্‌লে—

'সার্পিপার্কে ষ্টিভিডোর হরিশঙ্কর চৌধুরী বলে যে একজন মস্ত বড় ধনী ভদ্রলোক আছেন, তাঁর ছোট নাতির সঙ্গে'—

পার্থ অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হোলো। সে যেন বোধ কর্‌লো পৃথিবীটা বন্ বন্ করে ঘুর্‌ছে—এ কি রহস্য না বাস্তব ঘটনা! সংশয় দোলায় তার মন দুল্‌তে থাকে। বল্‌লে—

—'তার নামটী কি?'—

—'তা ঠিক বল্‌তে পার্‌ছিনে'—

—'আচ্ছা, তার বাবার নাম তো জানেন'—

—'হাঁ, শিবশঙ্কর বাবু'—

পার্থের সন্দেহ এরপর তিরোহিত হয়ে গেল। সোফেয়ার ঔৎসুক্য দেখিয়ে বল্‌লে—

—'আপনার পরিচয়টা কি জান্‌তে পারি?'

কি যে বল্‌বে পার্থ তেবেই ঠিক কর্‌তে পারছিল না। একটু তেবে বল্‌লে—

—'পরিচয়টা দিতে পারি কিন্তু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে আপনি তাকে আমার আসল পরিচয়টা দেবেন না—যা শিখিয়ে দেবো, তাই বল্‌তে হবে'—

—'বেশ, তাই বল্‌বো'—

—'তবে শুনুন আমি শিবশঙ্কর বাবুর ছোট ছেলে পার্থ চৌধুরী'—

—'আপনিই'—বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সোফেয়ার পার্থকে বারে বারে দেখ্‌তে থাকে। কিন্তু অদৃষ্ট দেবতার এমনই কৌশল যে পরিস্থিতি অন্যরূপ হয়ে গেল।

—যে পরিচয়টা সোফেয়ারকে দিতে হবে ভরণীর কাছে, সেটা যে সময়ে পার্থ প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে বল্‌তে উদ্যত হচ্ছেন, সেই সময়ে গ্রাণ্ড হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে ইন্দিরাকে নেমে আস্‌তে দেখে আর বলা হোলো না। কালবিলম্ব না করে পার্থ ইন্দিরার দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন কর্‌লো।

কথাটা যে একেবারে বাজে নয় পার্থ বাড়ীর সরকার মশায়ের কাছ থেকে জান্‌তে পেরেছে। এরপর তার পক্ষে গ্রাণ্ড হোটেলে রোজ যাওয়াটা যে অশোভন, এটা

তার অন্তরে কে যেন বলে উঠ্‌লো। ইন্দিরার রূপ মুগ্ধ পার্থ। ইন্দিরাকে দিনে অন্ততঃ একবার না দেখলে কেমন করে সে কবিতা লেখার প্রেরণা পাবে। রোমান্টীক কবি হিসাবে এর ভেতরই তার একটু নামও হয়েছে। সারাদিন মনের ভেতর তোলপাড় কর্‌তে থাকে কেমন করে ইন্দিরাকে নিবিড় ভাবে পাওয়া যাবে! 'যাবো কি যাবো না'—এই ভাবে অন্তর দুল্‌তে থাকে, সেসময়ে ঠিক সময়ে গ্রাণ্ড হোটেলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায় ইন্দিরার প্রতীক্ষায়। ইন্দিরার গাড়ী আর আসে না। ঘড়ির কাঁটা ঘুর্‌তে থাকে, ক্রমে ক্রমে আটটা বাজলো, রাত হয়ে এলো। শেষে হতাশ হয়ে বাড়ী ফির্‌লো। তার মন ভেঙে পড়্‌লো। সন্দেহ হয় সোফেয়ারের ওপর—তবে কি সোফেয়ারের কাছে পরিচয়টা পেয়ে গাড়ীটা দিয়েছে? আজকালকার মেয়েরা তো এরকম বড় একটা হয়না—বিলেতী বাতাস গায়ে লেগেছে, তবু সেকেলে ভাব? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? আবার ভাব্‌তে থাকে, হয়তো এই তরুণী পুরুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তেই আনন্দ পায়, বাহু বন্ধনে বেষ্টিত হতে চায় না। তবুও পার্থ ধৈর্য্য হারায় না, রোজই গ্রাণ্ড হোটেলের কাছে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু ইন্দিরা আর আসে না।

কতদিন আর এভাবে পথ চেয়ে থাকা যায়! সোফেয়ারের বাড়ীতে সোফেয়ারের কাছে না গেলে কিছুই জানা যাবে না—সমস্যা হোলো কে যাবে! চিন্তাক্লান্ত পার্থ কি কর্‌বে তার কোন ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌লো না। সমস্যা যেখানে গভীর হয়ে ওঠে, সেখানে সমাধান ও সহজে হয় না। নিজের দুর্ব্বলতা কি সহজে মানুষ কারো কাছে প্রকাশ কর্‌তে চায়।

সোফেয়ারের কথা মনে পড়ে, সোফেয়ারের বাড়ীটাও চোখের ওপর ভাসে, প্রতিটি ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে সেই সুন্দর মুখখানি—চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়লো পার্থ। ব্যর্থ প্রেমের কবিতা কয়েকটী লিখে পাঠালো বিভিন্ন পত্রিকায়। সে যখন নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ কর্‌ছিল তখন তাকে ডেকে পাঠালেন হরিশঙ্কর বাবু। সে সময়ে বৃষ্টিধারায় স্নাত হচ্ছিল শীতের রাত্রি, মাঝে মাঝে আকাশে ডাকছিল মেঘ।

পার্থ শঙ্কিত হয়ে বৃদ্ধ হরিশঙ্কর বাবুর ঘরে প্রবেশ কর্‌লো। বৃদ্ধ গড়গড়ায় তখন ধূমপান কর্‌ছিলেন। নলটা মুখ থেকে বের করে নিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি বল্‌লেন—'একখানা চিঠি আছে, পড়ে দেখোতো কি লিখেছে? তারপর কথা হবে'—

পার্থ প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, তবে বৃদ্ধের কথার ভঙ্গীতে সে বুঝেছে গুরুতর কিছু একটা কাণ্ড ঘটেছে, তা না হোলে তার ডাক পড়্‌বে কেন? চিঠিখানি পড়্‌তে পড়্‌তে সে বিস্মিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য দুজনের মধ্যে ঘনিয়ে এলো নিস্তব্ধতা। শেষে বৃদ্ধ বল্‌লেন—'এখন তোমার কি বক্তব্য আমাকে খুলে বলো'—

সে মাথা হেঁট করে বসে রইলো। বৃদ্ধ বল্‌লেন—'দেখো তো তোমার ভাইবোনেরা কত বড় হয়েছে আজ, আর তুমি! তোমার মধ্যে যাজ্জিত বুদ্ধির ও অভাব ঘটেছে। ছিঃ দাদু! ছিঃ ছিঃ'—

পার্থ লজ্জায় ক্ষোভে ও আত্মগ্লানিতে নিজেকে বিকৃত কর্‌তে থাকে। আত্মর কামনার তাড়নায় এতদিন তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করেও এই তরুণ যে আশায় বুক বেঁধেছিল, তা হরিশঙ্কর বাবুর কাছ থেকে পত্রখানি পড়বার অধিকার পেয়ে আকস্মিকভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

নিজের মনে বল্‌লে—'পৃথিবীর সব দুঃখই সহ্য করা যায়, আর এটা পারা যাবে না সহ্য কর্‌তে!'

সে উপলব্ধি কর্‌লো প্রেমের জন্যে এতদিনের কৃচ্ছ্র সাধনাও সম্পূর্ণ অর্থহীন ও ঐকান্তিক ব্যর্থ প্রয়াস—নারী চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়।

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ধরে ধূমপান করে বল্‌লেন—'এই থেকে যেন তোমার শিক্ষা হয় দাদু! জেনে রেখো কাণ্ডালের মত মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ালে, কোন মেয়েকে ধরা যায় না—পাওয়া যায় বটে, তোমরা যাকে প্রেম বলো, সেটা কাম ও কামনার অভিব্যক্তি—প্রেম স্বর্গীয়, আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা ভিন্ন প্রেম হয়না। আজ শচীন ঘোষালের মেয়ে বলে কিনা তোমাকে সে নাচাতে

পারে, তোমাকে নিয়ে নাচ্‌তে পারে না,—পুরুষ হয়েও পৌরুষ হারালে তুমি! ফলে সচীন ঘোষালের বিপুল সম্পত্তি, সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা কন্যা আর ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা তোমার সামনে থেকে সরে গেল'—

পার্থ অল্প-স্বল্প চোখে বল্‌লে—'দাদু! আমাকে ক্ষমা করুন—যে ভুল করেছি আমি সেই ভুলের মাশুল দিয়ে যাবো সারাটী জীবন ধরে—আর কখন ভুল পথে যাবো না'—

বৃদ্ধ হেসে বল্‌লেন—'তোমাদের কবি মন কিনা, তাই আশেপাশে 'পদ্য ছুটতে থাকো, তোমার কথায় খুব খুশী হলাম—আশীর্ব্বাদ করি তুমি মনস্বীদের একজন হও'—

এরপর বহু অভিজাত সুন্দরী তরুণী এই কবি-হৃদয়কে জয় করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের কোন প্রলোভনই তার দেহ ও মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি—পরিবার বর্গও একে বিয়ে দিয়ে ঘর সংসারী করাতে পারেনি, তবে এই ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে পার্থ সার্থকতা লাভ করেছে কাব্য ও সাহিত্য সাধনা করে আর এনেছে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বিপুল ভাবে; তা না হোলে আজ গৌহাটীতেই বা তাঁকে এনে সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি করা হবে কেন?

গদ্য-কবিতা

শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য নিয়ে যাদের কারবার তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, পত্র পত্রিকায় যে বস্তুটীর আধিক্য অত্যন্ত বেশী সেটি কবিতা এবং গদ্যকবিতা। এর থেকে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মানো অস্বাভাবিক নয় যে কবিতা বিশেষতঃ গদ্যকবিতা লেখা খুবই সোজা। লোকের মনে ধারণাও তাই। কবিতা সাহিত্য সমাজে যেন কিছুটা অবহেলিত। বেচাকেনার হাটে কবিতা পণ্য হিসাবে যেন অতি নগণ্য। তালাতরা কবিতা তালি হয়েই থাকে কাব্য পসারিণীর তালায়, যদিবা কিছু বেচা কেনা হয় তার মূল্য অতি সামান্য। তবু কবিতা লেখা হয় এবং কেউ পড়ুক না পড়ুক—ছাপাও হয়। এ থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কবিতা অমর। রসজ্ঞদের বিস্তীর্ণ হাটে কবিতার দাম না থাক কদর আছে।

কবিতা লেখা কিন্তু সহজ নয়, তার চেয়ে বড় কথা কবিতা পড়া তো নয়ই। কবিতা লেখা যদি বা কিছু সহজসাধ্য হয়, পড়া একেবারেই নয়। বললে ভুল হবে না যে পড়ার ত্রুটিতে কবিতা বেহাৎ পদ্যের বিড়ম্বনা বলে মনে হয়। বিশেষতঃ গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে একথা অত্যন্ত সত্য। "কাব্যটাব্য আমার আসেনা"—একথা প্রায় অনেকের মুখেই শুনেছি কিন্তু "কবিতা পড়া আমার আসে না।" একথা শুনিনি। বরঞ্চ আবৃত্তি করা অত্যন্ত সোজা···এ ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়ে আছে অনেকের মনে। আমাদের ধারণা—যে গান জানেনা, বাজনা বাজায় না, লিখতে পারেনা সে পারে আবৃত্তি। বল নিবেদনের আসরে তারা করেন আবৃত্তি, ফলে শ্রোতাদের কপালে অশেষ দুর্ভোগ। কিন্তু সে কথা থাক।

কবিতা লেখা সহজ নয়···এটা অত্যন্ত সত্য কথা। কবিতা লেখার মধ্যে যে কয়টি প্রধান গুণ আছে, তার মধ্যে শব্দচয়ন ও ছন্দগঠন প্রধান। কিন্তু এই দুটি প্রাথমিক স্তর···শেষ কথা নয়। এর পরও আছে বহু স্তর। সমাজবোধের সঙ্গে প্রতীকতার মূল্যমান একসূত্রে গাঁথা কবিতার তৃতীয় স্তর। বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কবি সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে এর পরিচয় পাই। এর পরও আছে তার, কবিতার স্থান মগজ নয়···হৃদয়, হৃদয়ের তারে যদি সাড়া জাগাতে না পারে তবে সে কবিতাই নয়···তার মধ্যে যতই যুক্তির পারম্পর্য্য থাকনা কেন। এই ভাবস্থটি করা কিন্তু অত্যন্ত শক্ত। পরিবেশ বা পটভূমিকা বলতে কবি কিছুই পান না; যেমন পান

গদ্য লেখক। কবি একেবারে মর্ম্মের মধ্যে এই পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

কবিতায় প্রাথমিক স্তর যে শব্দ চয়ন ও ছন্দ গঠন তার সম্বন্ধে বহু উপদেশ দেওয়া যায় কিন্তু ভাব সম্বন্ধে কথার একান্ত অভাব, উপদেশামৃতে কারও মন এ বিষয়ে অবহিত করা যায় না। কবিতার মধ্যে ভাবের স্থান নিয়েও কিছু বলা যায় না। কবিতা শৃঙ্খলমুক্ত হ'ক বা প্রবহমান হ'ক ভাব না থাকলে সে কবিতা। "সহৃদয় হৃদয় সংবাদী" হবে না। কিন্তু এই ভাব বস্তুটি কি? কোন গুণে তাব কবিতাকে প্রাণবন্ত করে?

তারও আগে প্রশ্ন···কবিতা কি? কোন গুণে বাক্য কাব্য হয়? খুব শক্ত প্রশ্ন। কাব্যরসিকরা বলেন··· "কাব্য হচ্ছে অলংকৃত বাক্য।" কিন্তু সুন্দরী নয় যে মেয়ে তাকে অলংকার পড়ালেই কি সে লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে না? কাব্য আর যাই হ'ক, অলংকৃত বাক্য নয়। কেহ বলেন রীতিই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। কিন্তু রীতিই কাব্যের শেষ কথা নয়। কাব্যে মাধুর্য্য আনে রীতি। সমালোচকগণ এমনও বলেন যে বক্তব্য বা বাচ্য হচ্ছে কাব্যের মূলকথা। তার বস্ত্র রীতি ও অলংকার এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। আলংকারিকেরা বলেন ধ্বনী বা ব্যঙ্গ হচ্ছে কাব্যের সারতম বস্তু, কাব্য যদি কথাতেই থেমে যায় বা রীতিতে অবলুপ্ত হয় তবে তা কাব্য হয় না। গুণীজন একটু অবহিত হলেই বুঝতে পারবেন যে কাব্যের গুণ ব্যঞ্জনায় অতিব্যক্তিতেও নয়। কাব্য যেখানে বাক্যকে অতিক্রম করে যায় সেখানেই সে সার্থক। কাব্যের আত্মা বাচ্য নয় কথা নয়, ধ্বনী—এ ধ্বনী কিসের? রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। তাই এই ধ্বনী রসের। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" কিন্তু কোহয়ং রসঃ? রস হচ্ছে "সহৃদয়হৃদয়সংবাদী"

কাব্যের মূলকথা শেষ হল। প্রশ্ন উঠল কবিতার গঠনভঙ্গী হবে কেমন? কবিতা যে সব সময়ে পদ্য হবে এমন কি কথা আছে? নিছক গদ্যময় হলেই বা দোষ কি? ঘুরিয়ে বলা যায় কাব্যের সৌন্দর্য্য কী বন্ধনে না মুক্তিতে? সোজা কথায় গদ্য কবিতার মূল্যায়ন করা। এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠল। একজন বললেন—কবিতা হবে পদ্যময়। যদি না মিল রইল, তবে কিসের কবিতা। গদ্যের আছে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কবিতার মধ্যে গদ্যকে আবার আনা হল কেন? কিন্তু আমরা কি এ কথা জোর করে বলতে পারি না যে মিলের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে কবিতা স্বতোৎসৃত প্রাণের আনন্দে আজ সার্থক হয়ে উঠছে। মিলিত কবিতায় ভাব পদে পদে বাধা পায়। পায়ে শৃঙ্খল নিয়ে চকল বর্ষার মত নেচে চলা যায় না—এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

কিন্তু তাই বলে কবিতা মিল তুলে নিলেই তা গদ্য-কবিতা হয় না। প্রবহমানতা গদ্যকবিতার বড় গুণ। ভাব এসে প্রথম ছত্রের শেষ পদকে দাঁড়িয়ে কাব্যের রস-সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটাবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখুন—

হে অতিথি বৎসল,
পথের মানুষকে এবার ডেকে নাও ঘরে
আপনি যে ছিল আপনার হয়ে
সে থাক আপনারে—"

ছত্রের শেষ অর্থ এখানে বন্ধী রইল না। ভাব বয়ে চলল অন্যছত্রে···সেখানেও থামল না, বাক্যকে ছাড়িয়ে চলে গেল বাক্যাতীতলোকে, জীবনানন্দের একটি কবিতা থেকে দুটি লাইন দেখুন—

"কে বলবে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি
রাতের ভিতর
কেন যেন আজও আমি জানিনাক হাজার হাজার
ব্যস্ত বছরের পর

এর মধ্যে সুর কোথাও কাটল না থামল না বয়ে গেল এই বয়ে যাওয়াই গদ্যকবিতার প্রাণস্পন্দন। সুকান্ত কবির জীবনবেদ এই প্রবাহমানতার মধ্যে কত সাবলীল ভাবে ছুটেছে·····

"হে দেবতা···আলো চাই সূর্য্যের সকল,
তারুণ্যের কী নিঃসীম জ্বালা,
অন্ধকার অরণ্যের উদ্দাম উল্লাস
লুপ্ত হোক আপনার উদ্ধত মৃত্যুতে"

শুধু বড় কথাই নয়। সাধারণ জীবনের অতি তুচ্ছ কথা···সামান্য ঘটনা···তাই বা তুচ্ছ কিসের। প্রায় অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছে সে কথার অর্থ নেই—শেষ নেই। শুধু কথা বলার আনন্দে কথা বলা।

সমিল কবিতায় যেটা শুধু ছবি হোতো, গদ্য-কবিতায় তার প্রাণ ধরা পড়ল—

আলোচরা বড় রাস্তা লোকচরা কোলাহল চলাচলতা
(দুজনায় গল্প জমিয়াছে)

অনেক স্রোতের মত দিকে দিকে গজিছে ট্রাফিক ঝড়িছে অজস্র আলো:-মোটরের দোকানের-ইলেকট্রিকের বোকা ওরা, বোকা ওরা স্তব্ধতার মুখোমুখী বসেছিল ওরা

আমরা অনেক কথা বলি,
আমরা অনেক কথা শুনি
আলোটা সিঁড়িতে রেখে গল্প করি, গল্প করি আমরা দুজন।"

ঘরের আলো ওদের কথা বলতে বাধা দিয়েছে, চারদিক বন্ধ দেওয়ালে তারা মুখ খুলতে পারেনি, প্রত্যাশার বিষাদের মুহূর্তে তাদের কথা জমেছে সিঁড়িতে।

গদ্য কবিতার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উঠেছে। গদ্যকবিতা বড় বেশী বাস্তব, একটু পাশ্চাত্যপন্থী আর দুর্বোধ্য। কোন কথাটাই ভুল নয়। বাস্তবতা গদ্য কবিতার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু শুধু গদ্য কবিতা কেন—বাস্তবতা কী সাহিত্যেরই পটভূমিকা নয়? কালিদাসের যুগের বাস্তবতা নিয়েই সে যুগের কাব্য···সে বাস্তবতা আজকের দিনে অলীকতা আবার আজকের নির্মম বাস্তব সে যুগের তুলনায় বীভৎস। কিন্তু কোনটাই অসত্য নয়। আজকের জীবন ও সমাজকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা···সে যতই দুঃসহ হোক না কেন? সাহিত্যে তাকে বাদ দোব কি করে?

তাই—"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন পোড়া ঝলসানো রুটী"

আর সেই চাঁদের মধ্যে কাব্যের রূপ দেখেছে, স্বপ্ন দেখছে আজকের চাষী আগামী দিনের সোনার ফসলের··· এই বাস্তবতাকে কী অস্বীকার করা চলে। হৃদয়ের চেয়ে মগজের আজকে চাহিদা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু মগজের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই কাব্যে মগজও থাকবে। কিন্তু সে হৃদয় আজকের হৃদয়···চিরন্তন রস-পিপাসু মানবমনের চিরদিনের হৃদয় কাব্যকে অমর করে। কিন্তু বাস্তবকে সে অস্বীকার করে না।

দ্বিতীয় কথা—গদ্যকবিতা। পাশ্চাত্যঘেষা। গদ্য-কবিতার রীতি একেবারেই বিলিতি। কথাটা কিছু সত্য। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতি আমাদের মনে এত গভীর ছাপ ফেলেছে যে সেখানে তাকে এড়াবার উপায় নেই।

তৃতীয় কথা—দুর্বোধ্য। কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু সার্বজনীনও নয়। কয়েকজন লেখকের জন্য সমস্ত কাব্যজগৎ দায়ী নহে।

অতএব কাব্যে বাস্তবতা থাকবে—নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়াও সেখানে বাইরের ভাবধারা মিশবে। কিছুটা দুর্বোধ্যও হবে। কিন্তু এরজন্য গদ্যকবিতাকে বাতিল করা চলে কি? অবশ্য বাস্তবতার মাত্রা রাখা বড় কঠিন। সব বাস্তব নিয়ে কাব্য লেখা যায় না। যে বাস্তবের মধ্যে থাকবে বাস্তবাতীতের আভাষ—তাই কাব্যের উপজীব্য-একথা মনে রাখতে হবে। তা না হলে গদ্যময় বিড়ম্বনা গদ্যকবিতায় এসে গদ্যময় বিড়ম্বনা হবে—কাব্য হবে না।

"সমস্যা"

শ্রীরমা দেবী

চৌধুরী বাড়ীর বড় বৌ সকাল বেলা মেজবৌকে ডেকে বল্লেন, ও মেজবৌ আজ বিকালে বীণাকে দেখতে আসবে ভাই, তুই একটু সকাল সকাল উঠে ওকে সাজিয়ে দিস্। শ্বশুর নিজে সঙ্গে বড় ছেলে ও বৌ নিয়ে দেখতে আসবেন। তাঁদের পছন্দেই পছন্দ বাড়ীর সকলের। তাই তোকে বলছি যা মানান সই হবে সেই মত করিস।

বড়বৌ মানুষটি বেশ গোছা। সংসারের কামাই নিয়েই ব্যস্ত সারাদিন এই দুনিয়ায় কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে কোনো খবরেরই ধার ধারেন না তিনি। মেয়ে বীণা কিন্তু এম-এ. পাশ। তাকেই আজ দেখতে আসবে। পাত্রের বাবা লোহার কারবারে বেশ পয়সা করেছে এবং ছেলেটি এ্যাটর্নী। মুরুব্বী বাবুর বড় আদরের মেয়ে এই

বীণা। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে এই মেয়েটির ওপরই তাঁর আশা ভরসা বেশী। মেয়েটি ও বড় বুদ্ধিমতী এবং গৃহকর্মে নিপুণা। বড় বৌ বিমলা সেদিন সকাল সকাল ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে নিয়ে লেগে গেলেন রান্না খাবার তৈরীর কাজে। যতই হোক বড় লোক কুটুম, প্রথম আসছেন তাই কোনো ত্রুটী না হয়। সারা দুপুর ধরে তৈরী হোলো—মাছের কচুরী মটন কাটলেট ডিমের পুডিং ইত্যাদি আবার যদি মাছ মাংস না খান কেউ তাই লুচি রাধাবল্লভী, দিদাভাজা নিমকী মেঠাই। আনানো হল সিমলের সন্দেশ স্পঞ্জ রসগোল্লা। সব ব্যবস্থা শেষ কোরে যখন বিমলা ওপরে উঠে এলেন তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন ২-১০ মিনিট। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিমলা ভাবেন ভদ্রলোক যখন কথা দিয়েছেন ৪-৪৫ মিনিটে আসবেন তখন একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক্। ওধারে বসে আছে বীণা, ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে বসে আছে আর নানান জল্পনা কল্পনা করছে তাদের দিদিকে ঘিরে। কেউ বা বোলছে—দিদি তোর শ্বশুর আজই তোকে নিয়ে যাবেন না তো? ছোট্ট ভাইয়ের কথায় সবাই হেসে উঠছে বলছে কেউ তাকি হয় আগে আমাই বাবু বিয়ে কোরতে আসুক। এম্-এ, পাশ মেয়ে লজ্জায় লাল হোয়ে বসে আছে যেন আজই তার সত্যি বিয়ে। বীণার জীবনে এই প্রথম কনে দেখতে আসা কাজেই সে লজ্জাবতী লতার মতই সারাদিন ঘাড়টি নীচু কোরে আছে। অতদিন তার বইএর টেবিলের ধারে কেউ গেলেই সে বকে কিন্তু আজ আর তার সেদিকে কোনোই দৃষ্টি নেই। পড়ার ঘরেই ভদ্রলোকদের বসানো হবে তাই অগোছাল বইএর টেবিলটি তাড়াতাড়ি গোছাতে মেজবৌদি একবার আড়চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে নিল। কিন্তু নাঃ দিদি আজ নির্লিপ্ত, যেন কার ধ্যানে মগ্ন। চেয়ে চেয়ে দেখেন বিমলা। তার মন যেন বলে এইখানেই বিয়ে হবে। কাল রাত্তে সুহৃৎ বাবু তো এসে বোল্লেন—ভদ্রলোক বলেছেন মেয়ে যদি আমার পছন্দ হয়ে যায় তবে আর কিছুতেই আটকাবে না। আর ও বল্লেন সুহৃৎ বাবু—জানগো! যেই আমি ও বাড়ীতে ঢুকেছি অমনি আমার ডান চোখটা নেচে উঠলো। তুমি দেখো ঠিক বীণামার এখানেই বিয়ে হবে। চোখ বন্ধ করে ভাবেন মনে মনে "বীণার মা" বীণার বিয়ের কত লোক জড় হয়েছে। বাড়ীখানা যেন গম্ গম্ করছে আত্মীয় কুটুম্বে। নাঃ ঢং ঢং ঢং কোরে তিনটে বাজলো এইবার সুহৃৎ বাবু কোর্ট থেকে এসে যাবেন উঠে পড়েন বিমলা। মেজবৌকে ডেকে তোলেন "নে ভাই! সাজিয়ে দে মেয়েকে"। যথাবিত্ত ঘর তার বীণারা সাত ভাই বোন কাজেই এই দুর্মূল্যের দিনে খুব জমকালো শাড়ী নেই কারও। তবুও ওরই মধ্যে একটা হাল্কা নীল রংএর শাড়ী পরানো হলো তাকে। গায়ের সঙ্গে কিছু কথা শাদা সিল্কের ব্লাউস, হাতে একগাছি করে মুক্তার চুড়ী আর কানে মুক্তার দুল, ব্যাস্, এতেই যেন বীণার রূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মেজবৌ সাজাতে সাজাতে মুগ্ধ চোখে চেয়ে বল্লে, দেখো দিদি আমাদের বীণার এইখানেই বিয়ে হবে। ওর শ্বশুর এত রূপ পাবে কোথায়? পিঠের ওপরের মস্ত সাপের মত বেণীটার দিকে চেয়ে বিমলা বলেন, তাই আশীর্ব্বাদ কর ভাই। মেজবৌ বলে আবার, দেখো দিদি বীণার বিয়ের গহনার ডিজাইন্ কিন্তু আমি পছন্দ করবো তোমাদের আমলের পছন্দ কিন্তু আজকাল আর চলেনা ভাই। বিমলা বলেন, বেশ তো। পড়ার ঘরটা কেমন গুছানো হোলো দেখতে এসে শোনেন বীণা ও মেজবৌয়ের বেণুর কথা। শোনেন বীণা বলছে "দেখ ভাই এরকমভাবে আজকালকার দিনে আর থাকা চলে না"। বেণু বলে অনুযোগের সুরে "দেখ্‌না দিদি ঠিকে ঝিকে বহুদ্ অজানগুলো সামনে জড় কোরোনা তা ঠিক সামনে ফেলে গেছে। তোমার শ্বশুর এসে কি ভাববেন বলো তো"? বীণা বলে "যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে গৃহের ও আমূল পরিবর্ত্তনের দরকার তা এদের বোঝানো যাবেনা।" বেণু বলে—"তুমি। তুমি দিদি শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে খুব আজকালকার মত ঘর সাজিও"। বীণা বলে—"জানিস্ বেণু! আমার খুব সখ, ঘরের সামনে ছোট্ট একটু বারান্দা থাকবে আর সেই বারান্দায় টবে করে থাকবে নানা রকম ফুলের গাছ"। বেণুও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে "হ্যাঁ দিদি সেই বেশ হবে ভাই। সেখানে দুটি চেয়ারে বসে চলবে তোমাদের অবসর সময়ের কাব্য চর্চা"। বীণা লজ্জিত ভাবে একটু হাসে। হৈ হৈ করে এসে

পড়েন সুহৃৎ বাবু বলেন—"কই? সব ঠিক আছে তো? বীণা মা কই?" এগিয়ে আসে বীণা। মেয়ের সাজ সজ্জা দেখে অবাক হোয়ে জিগেস্ করেন তিনি বীণার আর উদ্দেশে কিছু গহনা পরালে না? বিমলা বলেন "ওই তো মুক্তার চুড়ী আর কাণে মুক্তার দুল!" সুহৃৎ বাবু বলেন "গলায় তোমার সেই প্রজাপতি পুষ্পহারটা পরিয়ে দাওনা বেশ মানাবে"। বেণু আপত্তি তোরে ওঠে, না! না! ওসব চলে না আজকাল। সুহৃৎ বাবু একটু চুপ তোরে বলেন "তবে তোর মার সেই মোটা সকর মুখো বালা জোড়াটা পরিয়ে দেনা।" এবার বলে বীণা "না বাবা ওসব আগেকার কিছুই এখন চলে না সবই বদলে গেছে"। সুহৃৎ বাবু অগত্যা খেতেই যান। বেণু বলে "বাবা তুমি মুখ হাত ধুয়ে এসো বিধির শ্বশুর এসেন বলে"। সুহৃৎ বাবু চলে যান বাথরুমের দিকে। মুখ হাত ধুয়ে আসতে না আসতে এসে পড়েন ভদ্রলোক এবং আসেন একাই। ওপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলতে থাকেন, মশাই আমার বড় তাড়াতাড়ি আছে কই? মা কই? বলতে বলতেই হঠাৎ বন্ধ হোয়ে যান নজর পড়ে যায়, মেয়েরাসজ্জিত বাড়ীটার দিকে; বোলে ওঠেন, ইস্ তাহলে বাড়ী মেয়াদুষ্ট হয়নি? সুহৃৎ বাবু লজ্জিতভাবে বলেন, এই ধুমধামের বাজার আর ওই তো চাকরী তার ওপর সাতটি ছেলেমেয়ে……। ভদ্রলোক বলে যান বলেন না—ত—টী!!! মেয়ে কটি? সুহৃৎ বাবু বলেন, পাঁচটী। ভদ্রলোকের মুখে হতাশ ভাব ফুটে ওঠে বলেন "কই মাকে আহ্বান আমার বড় তাড়াতাড়ি"। পড়ার ঘরটাও এক নজরে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বসে পড়েন। সুহৃৎ বাবু পাশের ঘর থেকে বীণাকে নিয়ে আসেন। বীণা এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরে বসে। তার দিকে এক-নজর দেখেই নামটি জিগেস্ করেন। বীণা নামটী মুখ নীচু করেই বলে। ভদ্রলোক যার সারা গোল ভাবে বলে ওঠেন, যাও মা! তোমার এবার ছুটী। ততক্ষণে বেণু খাবার নিয়ে এসে হাজির। ভদ্রলোক আঁৎকে উঠে বলেন, না না ওসব কিছুই চলবে না এই খেয়ে আসছি, বুড়োমানুষ, মাপ কোরবেন। সুহৃৎ হাত জোড় করে একটু দীন অনুরোধ জানান হাতের তৈরী মেয়েদের, একটু কিছু মুখে দিন। না না মাপ কোরবেন বোলে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠে পড়েন তিনি খুব সুহৃৎ বাবু তাঁকে এগিয়ে দিতে যান। রান্নাঘরে তখন হাতের তৈরী খাবারগুলোর দিকে চেয়ে বিমলা ভাবেন--বিয়ের দিনের কথা। বীণার বিয়ের দিন এই রান্নাঘরে আর ও কত জিনিসই বৈ বৈ কোরবে! তারি ভালো লাগে ভাবতে। কিন্তু? কাল রাত্তে উনি না বোল্লেন? ওসব আর আজকাল চলে না! আজকাল মার্কিন রেকাবে করে টেবিল চেয়ারে বসে চপ্ কাটলেট মাংস ইত্যাদির চলন হয়েছে। তাই হবে!! গালে হাত দিয়ে বিমলা বসে ভাবেন সত্যি সবই বদলে যাচ্ছে। ভদ্রলোককে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন সুহৃৎ বাবু। মুখটি দেখে ভাল লাগে না বিমলার, যেন কেমন মুষড়ানো ভাব। জিগেস্ করেন তিনি, "কি গো?" সুহৃৎ বাবু গম্ভীর বিমর্ষ মুখে বলেন "এত রোগা মেয়ে চলবে না।" বিমলার চোখে যেন একটি ফুৎকারে সব আলোগুলো নিবে যায়। ভূতের মত বলে ওঠেন, সেকি? কেন? কি হবে? সুহৃৎ বাবু বলেন, পাগল হলে নাকি? জাননা মেয়ের বিয়ের ব্যাপার? নিজেরাও তো সাত বোন ছিলে কত জায়গা থেকে কতবার দেখতে এসেছে আর এর এই এক জায়গায় কথা হতেই বিয়ে হয়ে যাবে? বিমলা বলেন, কেন? আজকাল তো সবেরই পরিবর্ত্তন হয়েছে শুনছি তবে এ কেমন বলুন?

বংশ মর্য্যাদা

শ্রীমীরা দেবী

—"হাঁ তাই হয় দিদিভাই!"

—"না দাদু: তোমার এ ধারণা বড় সেকেলে—আমি বিশ্বাস করিনা এ সব।"

—"বিশ্বাস করছ না তর্কের খাতিরে। কিন্তু কোন দিন যদি মনের সঙ্গে বোঝাপড়া হয় সেদিন দেখবে যে আমার এই সেকেলে ধারণাটাকে তুমি অস্বীকার করতে পারছ না। শোন দিদু, তোমার বংশ যদি কোন মর্য্যাদা বহন না করে—যদি কোন ঐতিহ্য বংশকে ঘিরে গড়ে না উঠে থাকে তবে তোমার যুক্তি অকাট্য কিন্তু আমি খুব সাধারণ কথাতেই তোমায় বলছি যদি তুমি বড় বংশের মেয়েও তবে এমন কাজ তুমি কিছুতেই করতে পারবে না যাতে তোমার বংশ মর্য্যাদায় ঘা লাগে।"

"বংশ! বংশ! বংশ! বংশ মর্য্যাদা নামক ভূতো বুলির দিন আর নেই দাদু! আমার বংশে অমুক দিন অমুক হয়েছিল—বলে গর্ব্ব করার মত মনোবৃত্তি এখন আর নেই। অতীতের স্মৃতির তন্তুরাশের একটা জের টেনে আজও আমার জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে? বংশমর্য্যাদা নামক আফিংএর নেশার ঝোঁকার দিন এখন শেষ হয়েছে—ও সবের মূল্য আমাদের কাছে আর নেই, ও সব বলে আমাদের আর ভোলাতে পারবে না দাদু অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে দিব্যি লেপের তলায় ঘুম দাও তোমরা। আমাদের এখন চলবার সময়।"

—"দিদু ভাই! নতুনের ডাকে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে তোমরা। পুরাণ নিয়ে পড়ে থাকলে তাহলে সৃষ্টি যে একঘেয়েমীর রোগে ভুগে ভুগে লোপ পাবে। এগিয়ে তো যাবেই এর একটা গল্প বলি শোন।" বাংলা দেশের বনেদী জমিদার বংশ। লক্ষ্মী সরস্বতী অকৃপণ ভাবে কৃপা বর্ষণ করেছেন সেই পরিবারে। বল্লাল সেনের খাতা খুললে আজও হয়তো দেখা যাবে কুলীন শ্রেষ্ঠ সেই বংশের নাম ধাম কুলুজি ইত্যাদি। সে বংশে যৌ হয়ে আসবে যারা তাদের পিতৃপরিচয়টা বেশ জোরাল হওয়ের থাকা চাই আবার সে বাড়ীর মেয়েরাও যে বাড়ীতে যাবে সে বাড়ী পদমর্য্যাদায় অনেকখানি উঁচু হওয়া চাই। কাজেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হত বেশ বয়েস গড়িয়েই। তাই বলে মেয়েরা ভোগ বিলাস নিয়ে দিন কাটাত না। তাদের পড়াশুনো করতে হত আর করতে হত দেব সেবা। এই ছিল সেই বংশের রীতি। তাদেরই এক মেয়ের সম্বন্ধ হল এক বড় ঘরে। মা বাপের একমাত্র সন্তান। অনেক আশা আকাঙ্খা তাকে ঘিরে দিনের পর দিন সেই বাড়ীটার আনাচে কানাচে জমে উঠেছে—মেয়ে তো ছোটটি নয় তারপর শাস্ত্র পড়েছে মা ভেবে বলেন—এতদিনে মনের মত ঘর পেয়েছি বংশ মর্য্যাদা বজায় থাকবে বটে।

মেয়ের বুকের মধ্যে চকিতের জন্য একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে—"ঘর পেয়েছ কিন্তু বর?" না! না! প্রশ্নটা প্রকাশ করেনি সে। মনের মধ্যে হয়তো একবারটি গুমরে উঠেছিল কিন্তু উঠলই বা—অতবড় ঘরের মেয়ে তার কি অমন ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করা সাজে। বরকে কনে চিনবে কিন্তু বরকে তো সবাই চিনবে। বংশ মর্য্যাদা বজায় থাকবে। তাই বরের সম্বন্ধে অতটা খোঁজ নেবার দরকার হয়নি যতটা দরকার হয়েছিল ঘর সম্বন্ধে জানবার।

বিয়ে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হল না ভাই! খবর এল বর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দিন যায় বছরও যায় বর আর ভাল হয়ে উঠলো না। অনেক সম্বন্ধ এসেছিল কিন্তু বংশ মর্য্যাদায় খাপ খায়নি। এসেছিল আরো একটা কিন্তু—শিবমন্দিরের ওপারে গোঁসাইদের বড় তরফের বাদু,—ব্রজরাজ। সে এসেছিল বসুমতীর মনের দুয়োরে কিন্তু বসুমতী দরজার খিল এঁটেছিল। কুলিনের ঘরের মেয়ে গোঁসাইর গলায় মালা দিতে পারবে না। বংশ মর্য্যাদায় আঘাত লাগবে তেমন কাজ সে কিছুতেই করতে পারবে না। তার চেয়ে অনেক সহজ কষ্টটাকে একা ভোগ করা। নিজের সুখ, নিজের পাওয়াটাই কি এতবড়, যাতে আর সকলের না চাওয়াটাকে উপেক্ষা করতে হবে? বসুমতীও তাই পারলনা ব্রজরাজকে স্বীকার করে নিতে। বছরের পর বছর কাটল, যুগের পর যুগ। সেদিনের

কালোচুল সাদা হল। রংএর জৌলুস খানিকটা নিষ্প্রভ ও হল তবু একটা জ্যোতি যার হত তার শরীর থেকে—সেটা কিসের জানু দিদিভাই,—ত্যাগের! যাক্ তারপর শোন—

বসুমতী বিরাট একটা পুকুর কাটিয়েছেন—তীরে তীরে বট অশ্বত্থের গাছ লাগিয়েছেন—আর অহরহ জলদান করিয়েছেন প্রান্ত পথিকের জন্য। বোধহয় নিজেরই তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ের ছায়া দেখতে পেতেন সেই পুকুরের জলে। জলের বুকে ভোরের সূর্য্যের লাল আলো এসে পৌঁছবার আগেই তাঁকে দেখা যেত সেই পুকুর পাড়ের শিব-মন্দিরে—আবার অস্ত সূর্য্যের রক্ত রাঙা আলো মিলিয়ে যাবার পরও তাঁর মধুর স্তোত্রপাঠ অনেকক্ষণ শোনা যেত। এ যেন তাঁর অনন্ত প্রতীক্ষা। তারই ছবি বুকে নিয়ে যেন নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতো সেই পুকুর, মন্দির, পুকুরের তীরে তীরে বট অশ্বত্থ।

হঠাৎ একদিন ব্যতিক্রম দেখা দিল। বাজনা, আলো, আর হরি সংকীর্ত্তনে মুখর হল। সেই নির্জ্জন পথ যেটা সেই পুকুরের পাশ দিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়েছে। চলনেও আর গতি বেগ নেই। কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন বসুমতী—"কে যায় রে?"

উত্তর এল—মণিরামপুরের জমিদার গো ঠাকুরুণ! গঙ্গা যাত্রায় চলেছেন।"

"থামা! ওরে সংকীর্ত্তন বন্ধ কর—শাঁখ বাজা হনু রে, বসুমতীর কাঁপা কাঁপা গলা কিন্তু সাধ্য নেই কারো সে কথার প্রতিবাদ করার। পুরোহিত এসে মন্ত্র পড়লেন। বৃদ্ধ পুরোহিতকে নিজেই ডেকে বল্লেন—পুরুত দাদা! আপনি চিনতে পারলেন না? এ বরই যে বসুমতীর বর। লগ্ন পার হয়ে যায় যে—মন্ত্র পড়ুন।" মন্ত্রমুগ্ধের মত বিয়ের মন্ত্র পড়েন বিস্মিত পুরোহিত। মহাদেবের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন বসুমতী সেই অতিবৃদ্ধ গঙ্গাযাত্রীর গলায়।

হাসাহাসির টানটা তখন খুবই বেড়ে উঠেছিল এর পরেই। বসুমতী একই সঙ্গে গঙ্গা-যাত্রা করলেন। নাতী গঙ্গায় নেমে বলেছেন—"বংশ মর্য্যাদা আমা হতে ক্ষুণ্ণ হয়নি—এটা যেন কেউ না ভোলে।"

আজও বহু পাড়ায় সেই বহু পুকুরটা রয়েছে যদিও সেটাকে আর পুকুর বলে চেনা যায় না। মনে হয় একটা এঁদো ডোবা।

হ্যাঁ—ওটা এঁদো ডোবাই। এর কোন মানে হয় দাদু? এ এক রকমের ডিপ্‌থিরিয়া।

কিন্তু দিদি! যে বংশে বসুমতী জন্মেছিলেন, যদি যদি তুমিও সেই বংশেই জন্মেছ তবে পারবে তুমি এমন কোন ছেলের গলায় মালা দিতে যার বংশের কোন পরিচয়ই নেই। বুকের ভেতরটা বুঝি কেঁপে উঠলো নমিতার। বুড়ো দাদুর চোখে ছানি পড়েছে তাই রক্ষে!

ইউনিভার্সিটির কোরিডোরের পাশ দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে যায় নমিতা। অনিলের ডাক তার কানে এসে পৌঁছল কি? ভ্রুক্ষেপের ভাবেও সাড়া দেননি বসুমতী। উড়ন্ত চুলের গোছা চোখে মুখে এসে পড়েছে। হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে সে। পথপ্রান্তে রংটা হয়তো মলিন দেখাচ্ছে তবে জ্যোতি কি একটা যায় হচ্ছে না: ত্যাগের জ্যোতি! কিন্তু কে দেখবে! বুড়ো দাদুর চোখে যে ছানি পড়েছে।

সঙ্কট তারিণী ব্রত কথা

শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য্য

পল্লীবাংলার মেয়েরা যে কোন সংকটের সম্মুখীন হলেই মানত করেন সংকটক তারিণী ব্রতের। সংকট তারিণী ব্রতে হরপার্ব্বতীর পূজো করতে হয়। পুরোহিত পূজো করেন। পূজো শেষে মেয়েরা বলে ব্রত কথা। তারপর বাড়ীর সকলের মাথায় ছিটিয়ে দেয় ঘটের শান্তিজল।

ব্রতের নিয়ম—মাঘ মাসের রবিবার অথবা বৃহস্পতিবারে এ ব্রত করে প্রত্যেক ব্রতীর নামে আট মুঠো আতপ চাউল নিয়ে সরাপীঠে তৈরী করে ও সাধ্যমত পায়েস রেঁধে ভোগ দেবে পূজার কাছে। আর দিতে হবে যথারীতি চাউল-কলার ও ফলমূলের নৈবেদ্য। ব্রতীরা সেদিন ঐ আট মুঠো চাউলের পিঠে আর পায়েস ভোগই

খেয়ে থাকবে। তারপরে আর কিছুই খেতে পারবে না। সাধারণতঃ গ্রামের মেয়েরা পাঁচজন একত্র হয়েই এ ব্রত করে। ঢাকা জেলার মধ্যেশ্বরদি পরগণায় এ ব্রতটির বিশেষ প্রচলন।

ব্রতকথা : এক ছিল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। সে সারাদিন ভিক্ষা করে যা পেতো তাতেই স্বামী স্ত্রীর বেশ চলে যেতো।

একদিন ব্রাহ্মণ ফিরে এলো শূন্য ঝুলি নিয়ে। পরদিনও ঘটলো তাই। তারপর দিন ব্রাহ্মণী আশায় ছিল—আজ হয়তো কিছু মিলবে। সেদিনও ব্রাহ্মণ শূন্য ঝুলি দাওয়ায় ছুড়ে ফেলে হাত পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো রোয়াকে।

ব্রাহ্মণী রেগে বল্লেন—এখানে আমার চোখের সামনে মরতে হবে না, রাস্তায় গিয়ে মর। আর আমিও ঘরেই মরে থাকবো। আর ভিক্ষে চাইতে পারবো না।

ব্রাহ্মণেরও সমস্ত শরীর ক্ষিধের যন্ত্রণায় ঝিম্ ঝিম্ করছে ব্রাহ্মণীর কথা শুনে রাগে দুঃখে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বনের নির্জন পথ দিয়ে চলেছেন হরপার্বতী আগে আগে পেছনে যাচ্ছেন মহাদেব। সহসা পার্বতী পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মহাদেব বল্লেন—ওকি থামলে কেন?

পার্বতী অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন একটি মৃতপ্রায় লোক রাস্তা আটকে পড়ে আছে।

মহেশ্বর অবহেলা ভরে বললেন—ওকে ডিঙিয়ে চলে যাও না। পার্বতী জিভ কেটে বললেন—সেকি! মেয়েরা কি পুরুষ ডিঙোতে পারে! আচ্ছা প্রভু এ লোকটা এখানে এমন ভাবে পড়ে আছে কেন? সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল একটু পরেই বাঘ-ভালুক এসে হয়তো ওকে খেয়েই ফেলবে।

মহাদেব মুচকি হেসে বললেন—তোমার ওর দুঃখ জেনে কী প্রয়োজন। যার যা' কর্মফল তাকে তা' ভোগ করতেই হবেই।

তবু বলুন। আমি ওর দুঃখ মোচন না করে এখান থেকে যাব না। ছল ছল চোখে মহাদেবের দিকে চেয়ে বললেন পার্বতী।

মহাদেব ব্রাহ্মণের দুঃখের ইতিবৃত্ত শেষ করে বল্লেন—সংকট তারিণীর ব্রত করলে ওর এ দুঃখ মোচন হবে। এ ব্রত করলে যে কোন সংকট হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ জানবে কী উপায়ে একথা?

পার্বতী হেসে বললেন—সেজন্য আপনার ভাবতে হবেনা। আপনি শুধু আমাকে ব্রতের নিয়ম-আচারগুলো বলে দিন।

একটু পরেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো ব্রাহ্মণ। আকাশের পানে চেয়ে ভাবতে লাগলো এ স্বপ্ন কী সত্য। সংকট তারিণী ব্রত করলে আমার যদি সংকট দূর হয়ে যাবে!

আচ্ছা একবার চেষ্টা করেই দেখি। দেবতার আশীর্বাদে হ'লে হতেও পারে।

গাছের তলায় কোপের আড়ালে জমাট হ'য়ে উঠেছে অন্ধকার। ব্রাহ্মণ গ্রাম অভিমুখে রওনা হল। প্রথমে যে বাড়ীটি পেল সে তারই দাওয়ায় শুয়ে পড়লো।

পরদিন সংকট তারিণীর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ভিক্ষায়। ব্রতের নাম করতেই সকলে ভিক্ষা দিলো। আধসের আতপ চাউল হতেই সে চলে গেল গোয়ালা পাড়া। ভিক্ষে চেয়ে নিল আধসের দুধ। দোকানীর নিকট হ'তে চেয়ে পেল চিনি। চেয়ে চিন্তে এর ওর বাগান থেকে সংগ্রহ করলো ফুল-ফল।

বাড়ী এসে দেখে মৃতপ্রায় হ'য়ে প'ড়ে আছে ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ তার মাথায় সংকট তারিণীর নাম জপ করতেই চোখ মেলে চাইল। ব্রাহ্মণকে দেখে তো রেগে আগুন—মরতে পারো না আবার ফিরে এসেছ আমাকে জ্বালাতে।

আর মরতে হবে না ব্রাহ্মণী—দেবতার বর পেয়েছি। এই দেখ আজ কত ভিক্ষে পেয়েছি—বলে সব খুলে দেখাতে লাগলো সে স্ত্রীকে।

বিস্মিত হ'য়ে উঠে বসলো ব্রাহ্মণী। একি এত জিনিষ পেলে কেমন করে? পুজো করেছ নাকি কোথাও? এত ফুল ফল কেন?

সব ঘটনা খুলে বললো ব্রাহ্মণ। আনন্দে দুলতে দুলতে স্নান করতে চললো ব্রাহ্মণী।

স্নান করে এসে ব্রাহ্মণী আয়োজন করে দিল। ভক্তি গদগদ চিত্তে পূজায় বসলো ব্রাহ্মণ।

পরদিন রাজবাড়ী থেকে লোক এল ব্রাহ্মণকে নিয়ে যেতে। ব্রাহ্মণ তো ভয়ে অস্থির। বললো তার কী! সংকট তারিণীর নাম স্মরণ করে যাও।

রাজা বললেন—আপনি নাকি তিন দিন অনাহারে থেকে মনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করতে গিয়েছিলেন?

ভয়ে বিস্ময়ে নীরবে নত মস্তকে ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগল। এ খবর মহারাজ জানলেন কেমন করে? এখনি হয়তো আমাকে কারাগারে যেতে বলবেন।

ব্রাহ্মণের বিবর্ণ মুখ দেখে রাজা স্মিত হাস্যে বলেন—ভয় পাবেন না ব্রাহ্মণ—আপনাকে এজন্য আমি শাস্তি দেব না। আর এ সংবাদ আমি কোন মানুষের মুখে শুনতে পাইনি—আমার গৃহদেবী কাত্যায়নী স্বপ্নে আমাকে এ কথা জানিয়েছেন। আর আদেশ করেছেন আজীবন আপনাকে রাজকোষ হ'তে ভরণ-পোষণ করতে। অতএব কাল থেকে প্রতিদিন আপনার বাড়ী ভোজ্য পাঠাব।

ব্রাহ্মণ রাজাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলো।

সব শুনে ব্রাহ্মণী বললে—এ সবই সংকট তারিণীর মহিমা। এমন যে দয়াময়ী প্রত্যক্ষ দেবী—ওঁর পূজা ঘরে ঘরে প্রচার হওয়া দরকার তাতে আমাদের মতো সকলেই নানা রকম দুরূহ সংকট হ'তে রক্ষা পেতে পারবে। এখন তো তোমাকে আর ভিক্ষে করতে হবে না—তুমি মায়ের মহিমা প্রচার কর।

পরদিন হ'তে ব্রাহ্মণ তাই করতে লাগলো—কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। সকলেই উপহাস করে বলে—ব্রাহ্মণ যোড়শোপচারের কথা ভাঁটছে।

এমনি করে দিন যায়। ভাবনা ঘুচেও ব্রাহ্মণের মনে শান্তি নেই—দিন রাত সে কেবলি ভাবে কেমন করে দেবীর পূজোর প্রচার হবে—ভাবে আর সংকট তারিণীকে ডাকে।

একদিন ব্রাহ্মণ পথে যেতে যেতে কয়েকজন লোকের মুখে শুনতে পেল—রাণীর সাত দিন যাবৎ প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়েছে। অথচ প্রসব হচ্ছে না। আজ বুঝি আর রাণীকে বাঁচানো যাবে না।

এ খবর শুনে হন্তদন্ত হ'য়ে ব্রাহ্মণ ছুটে গেলো রাজবাড়ী রাজপ্রাসাদে ঢুকবার পথেই বাধা দিল দারোয়ান।

পথ ছেড়ে দাও দারোয়ান, আমি রাণীমাকে বাচাব—বলে ব্রাহ্মণ।

উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো দারোয়ান। তুমি বাচাবে রাণীমাকে। দেশ বিদেশের কত নামজাদা বৈদ্য ওঝা ফেল হয়ে গেল। আর বাকী রয়েছ এবার তুমি। আচ্ছা দাঁড়াও মহারাজের আদেশ নিয়ে নিই।

রাজা শুনে বললেন—বেশ তো নিয়ে এসনা ব্রাহ্মণকে দেখি কী করতে চায় সে।

ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে হাজির হ'য়ে বললো—মহারাজ আমিও একদিন মৃত্যু-সংকটে পড়েছিলাম—স্বপ্নে সংকট তারিণীর ব্রতের আদেশ পেয়ে এ ব্রত করেই রক্ষা পেয়েছি। মায়ের কৃপাতে লাভ করেছি আপনার সহায়তা। তাই আজ রাণীমার মৃত্যু-সংকটেও সংকট তারিণীর পূজা করে আমি ওঁকে বাচিয়ে তুলতে চাই।

রাজার আদেশে ব্রাহ্মণের কথা মত সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হল। অসীম ভক্তি ও অটল বিশ্বাস নিয়ে পূজোয় বসলেন ব্রাহ্মণ। পূজা শেষে ঘটের শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন রাণীর সর্বাঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এল রাণীর, কিছুক্ষণ পরেই প্রসব করলেন পুত্র সন্তান।

রাজা খুশী হ'য়ে বললেন—ব্রাহ্মণ আপনি আজ আমার যে উপকার করলেন তার কোন প্রতিদান নেই। আপনার বাসের জন্য অট্টালিকা তৈরী করে দেব। আর প্রতি বৎসর মাঘ মাসে আপনি আমার গৃহে সংকট তারিণীর পূজো করবেন।

ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুসারে রাজা দেশে দেশে প্রচার করে দিলেন এ ব্রতের মহিমা। কত যুগ পূর্বে এক ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ এ ব্রতের উদ্‌যাপন করেছিলেন তা কেউ জানে না—কিন্তু ব্রতটি আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে সুপ্রচলিত।

ভালোবাসা

শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়

কালের আলো জানিয়ে দিল ছোট্টো তারাটিকে,
দিনের হুকুম একটু সবে চাঁদের পাশ থেকে।
একটু হাসি জাগলো ঠোঁটে চাঁদের পানে চেয়ে,
পড়লো খসে ছোট্টো তারা আকাশ ঘরের মেয়ে।
বিজ্ঞ যারা বললো ডেকে বজ্জ বোকা তুমি।
আকাশ চেয়ে কত নীচু ধরাতলের ভূমি।
নাইবা হোল চাঁদের পাশে আকাশ কত বড়।
সেই বড় ঘর উঁচু নজর তাকে ছেড়ে কর।
বলে তখন ছোট্ট তারা সবার সেরা স্থানে
ছেড়ে আমার বাঁচার মাঝে পাইনা খুঁজে প্রাণ
বলে আমি বাণী ছিলাম হলাম ভিখারিণী,
পারবোনা তাই হতে রাণীর করতবাহিনী।
প্রেমের আসন হৃদয় জোড়া ভাগের কথা নেই
ছাড়বো যদি সবই দেবো তাইতো বিদায় চাই।

অমৃত-জিজ্ঞাসা

শ্রীমমতা দত্ত

অমৃতের পুত্রদের কেন জাগে অমৃত-পিপাসা
জন্মলগ্নে মিশে যায় জীবনের একান্ত জিজ্ঞাসা
কেন জন্ম হ'ল মোর? কেন ধরণীর ধূলিকণা
রোমাঞ্চিত মোর স্পর্শে? কেন জাগে নবীন-চেতনা
জড়-জীবে? ধ্যানাসনে বসি পৃথ্বি কি স্বপ্ন দেখেছে,
করাঙ্গুল বক্ষে চাপি শঙ্কাভরে কি নাম জপিছে?
কর্মচক্রে ঘুরে জীব, অন্ধ চক্ষু বন্ধ মুঠি পড়া
অমৃত বন্ধন ডোরে জননীর বক্ষ কেন ভরা?
তাই কিরে আসা জননীর স্নেহাঞ্চল ছায়ে
মৃত্যু আর জীবনের নব নব অনন্ত-বিবাহে।

"ভিক্ষা"

শ্রীমতি যূথিকা দাস

শিক্ষা তুমি শিখাও আমারে
এ ধরাকে ভালবাসিবারে!

তোমার মতন এই পুষ্প সম প্রাণ
একদিন তরে শুধু কর মোরে দান।

পাই আমি অমৃতের স্বাদ
ভুলি যাহা বিষাদ বিষাদ।

তোমার পবিত্র হাসি ভুলায় বেদনা,
মুছি জীবন-গ্লানি জাগায় চেতনা।

প্রাণ ভরা আনন্দের শুধু এক কণা
তোমার হৃদয় দ্বারে করি যে প্রার্থনা।

"বিভূতি ভূষণ স্মরণে"

কুমারী অনুরাধা বন্দোপাধ্যায়

অমৃত খেতন সার্থক তব
সাহিত্য সভাতলে
অমর পুণ্য স্মৃতির বহ্নি
জ্বলে তাই ধরাতলে
প্রকৃতির মনে পেয়েছিলে বুঝি
অমৃতের সন্ধান
গান করি সবে ধন্য হয়েছে
তৃপ্ত হয়েছে প্রাণ।
সরস তোমার লেখনীতে ঝরে
বনানীর শ্যামলতা
জাগায়ে তুলেছে নবীন প্রাণের
উচ্ছ্বাস সজীবতা
অস্তাচলের অরুণ আলোয়
বিদায় বাঁশীর সুর
জানায় তোমার বিদায় বারতা
প্রতিদিন নিষ্ঠুর
তোমারি চরণ স্মরণে আজিকে
করি তাই প্রণিপাত
লেখনীর মাঝে পাই যেন খুঁজি
তোমারি আশীর্ব্বাদ।

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

৮

শঙ্করের মিলে কয়েকজন শ্রমিকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তারা নানা রকম কানাঘুষা করে বেড়াচ্ছে। এই ঘটনা লোক পরম্পরায় শোনা যাত্র, রঞ্জয় এবং শঙ্কর, এর প্রতিকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তারা চেয়েছিল ফ্যাক্টরীর মধ্যেই ঘটনার একটা মীমাংসা করে ফেলতে। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী বললে, আজ-কালকার মানুষের মন মেজাজ কখন যে কার কথায় বসলায় কিছুই বলা যায়না; সেই জন্য সকলকে একত্রে ডেকে একটা সভা করে আপনাদের উদ্দেশ্য ও তাদের ভবিষ্যৎটা বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিন; সভা, সমিতি, হৈ চৈ করে একটা ব্যাপার না করলে এখন ত মানুষের মন ওঠে না। বুঝতেই পারছেন স্যার?

সরল কর্মচারীটীর পরামর্শ শঙ্করের প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হোল। তাই সে ভোরবেলা থেকে ফ্যাক্টরীতে গিয়ে তাদের ময়দানে বিকেলে একটী জনসভার ব্যবস্থা করেছে; সকলকে বলা আছে বিকেলে ময়দানে এসে উপস্থিত হবার জন্য। সকালের দিকের ব্যবস্থা শঙ্কর করেছে; দুপুরের বাকী কাজের ভার আছে রঞ্জয়ের উপর। কাজেই নিজের কাজ শেষ করে শঙ্কর ট্রামে উঠে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কাজের মধ্যে যতক্ষণ ছিল, নিজের কথা ভাববার অবসর ছিল না; কিন্তু যেই কর্মহীন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে যত অপ্রিয় চিন্তা এসে তাকে ছেঁকে ধরল। সুধার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করার জন্য তার মনে অত্যন্ত অনুশোচনা হতে লাগল। আহা, তার দোষ কি, তাকে যেমন ভাবে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করা হয়েছে তার চরিত্র ঠিক সেইভাবেই গঠন হয়েছে। এখন অসময়ে তাকে ভেঙে নতুন করে গড়তে চাইলে, চলবে কেন? এতে উভয়েরই অন্তরে আঘাত প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। বিশেষ করে সুধা এখন সন্তান সম্ভবা; তাকে খুব সাবধানে যাওয়া উচিৎ। সামান্য ঘটনা নিয়ে যদি তাদের মধ্যে এখন প্রায়ই এইরকম মনান্তরের সৃষ্টি হয়, তবে সুধার স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত হানিকর হবে। তাই সে মনে মনে স্থির করেছে; সুধাকে এ সময় মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তার ইচ্ছে ছিল আগের সময়ে শুরুর কাছে কয়েকদিনের জন্য সুধাকে পাঠিয়ে দেবে—কিন্তু সুধা তাতে রাজী হয়নি; সে দেশে মায়ের কাছে যাবার বাসনা জানিয়েছিল। দেশ বিভাগের পর থেকে পূর্ববঙ্গবাসীদের দেশে যাতায়াত এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; তথাপি পারিপার্শ্বিকের অবস্থা লক্ষ্য করে তার ইচ্ছাকে মেনে নেওয়াই শঙ্কর মনে মনে স্থির করল।

বেলা তখন প্রায় দশটা বাজে।

কৃষ্ণা আহারাদি সেরে কলেজ যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় সিঁড়িতে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শঙ্করকে দেখে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, "এই যে শঙ্কর এস, এস, চেহারা এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? অসুখ করেনি ত?"

তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকে, একটা ইজি চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে শঙ্কর বললে, "শরীরটা ভালো নেই কৃষ্ণা; একটু কোকো খাওয়াবে?" উদ্বিগ্ন হয়ে কৃষ্ণা তার নিকটে এসে কপালে হাত দিয়ে বললে, "ওমা, গায়ে তোমার গরম লাগছে, জ্বর হয়েছে তোমার শঙ্কর; শীঘ্র খাটে উঠে শোও"—

শঙ্কর মৃদু হেসে বললে, "ও কিছু নয়; বোম্বেতে থোরাকেরা করেছি অনেকক্ষণ তাই গা গরম লাগছে। তুমি যাও লক্ষ্মীটি আমার জন্য একটু চা কি কোকো নিয়ে এস; মস্ত হেঁটা পেয়েছে। পিসিমাকে একটু ডেকে দিও"—

কৃষ্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে উচ্চ কণ্ঠে বললে, "পিসিমা বাড়ী নেই শঙ্কর; কালীঘাটে গেছেন, এখনি

ফিরবেন বোধহয়"—কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণা এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসে, শঙ্করের হাতে দিল! শঙ্কর কিছু মাত্র আপত্তি না করে দুধের গ্লাসটি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে সেটা শেষ করে মাটিতে নামিয়ে রাখল। কৃষ্ণা হেসে বললে, "কেমন, মজা, বড়বে কোকো চেয়েছিলে, এই দুপুর বেলায়?"

শঙ্কর বললে, "তুমি দিলেনা ত কি হবে? যা দিবে তাই খেলুম"—

কৃষ্ণা হাসিমুখে বললে, "তবে তুমি বসে বিশ্রাম কর, এখুনি পিসিমা এসে পড়বেন। আমি কলেজ যাই।"

"তুমি কলেজ যাচ্ছ?" শঙ্কর প্রশ্ন করলো।

"হাঁ। শঙ্কর", কৃষ্ণা বললে, "আজ মিঃ লাহিড়ীর ফিলোসফির ক্লাশ আছে; মিস্ করা চলবেনা।"—

"ওঃ আচ্ছা"; বলে শঙ্কর অলসভাবে চক্ষু মুদ্রিত করল।

তার কাছে এগিয়ে এসে কৃষ্ণা বললে, "কেন, তুমি, কিছু বলবে কি আমায়?" সেইরকম মুদ্রিত চক্ষেই শঙ্কর বললে, "তোমার যদি সুবিধে হয় সুধাকে একটু ফোন করে দিও; বলো, আমার ফিরতে একটু বেলা হবে। আমার জন্য সে হয়ত না খেয়ে বসে থাকবে"—

"আচ্ছা" বলে কৃষ্ণা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এসে বইখাতাগুলো টেবলের উপর ছুঁড়ে ফেলতেই শঙ্কর চোখ মেলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে তাকাল। কৃষ্ণা বললে, "আজ আর ক্লাশ কোরবোনা শঙ্কর, ইচ্ছে করছে না"—

"তোমার যা খুশী তাই কর", বলে শঙ্কর উঠে ঘরে দক্ষিণ দিকের বারান্দার পাশে যে পরিচ্ছন্ন শয্যাটি ছিল, তার উপর শুয়ে পড়ল। কৃষ্ণা সন্তর্পণে গিয়ে তার শিয়রে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

শুষ্ক দ্বিপ্রহর। পথ ঘাট প্রায় জনশূন্য। কাছের বাড়ীর বেতারযন্ত্রে অনুচ্চস্বরে বিবাহসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে; তার বেশ খানিকটা ভেসে আসছে। রাস্তার ধার ঘেঁষা নারকোল গাছটার মাথায় বসে একটা শঙ্খচিল, আপন মনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকেই চলেছে; কাছের দুয়ারে একটী ভীখারী, করুণ স্বরে আর্তনাদ করছে, "মাগো, মা, কিছু খেতে দাও; বাসি পান্তা যা আছে তাই দাও মা"—তন্দ্রাচ্ছন্ন পল্লীকে সচকিত করে কেরী ওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে, "ঘুঁটে নিবে গো ঘুঁটে?" সেই সময় সহসা ধরমর করে শয্যার উপর উঠে বসল শঙ্কর। তার শিয়রে বসেছিলেন গুরু। তিনি বললেন, "উঠলে কেন বাবা শোও?"

শঙ্কর উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "কটা বেজেছে পিসিমা?"

টেবিলে রক্ষিত ঘড়ির পানে দৃষ্টিপাত করে গুরু বললেন, "আড়াইটে বাজে; এখন কেমন আছো শঙ্কর?"

"এখন বেশ ভালো আছি পিসিমা", বললে, "আমায় এখনি বেরোতে হবে, উঠি এবার। কৃষ্ণা কোথায়?"

শয্যার অপরাংশে কৃষ্ণা বসে ছিল। সে উঠে এসে বললে, "আবার কিছু বলছো? এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? কোথায় যাবে?"

শঙ্কর বললে, "বেলা ওটের সময় আমাদের জাহাজীয় মহলে একটি জরুরী সভা আছে; তাই আমি এত ব্যস্ত হচ্ছি যাবার জন্য"—

ব্যস্ত হয়ে গুরু বললেন "সে কি বাবা, সারাদিন কিছু খাওনি, শরীর অসুস্থ; কিছু না খেয়ে তোমায় আমি কিছুতে যেতে দেবোনা।"

"আমারও বড্ড কিধে পেয়েছে পিসিমা; আপনার ঘরে যা আছে আমায় তাই দিন"—শঙ্কর বললে। গুরু উঠবার উপক্রম করতেই, শঙ্কর বাধা দিয়ে বললে, "আপনি বসুন পিসিমা, আপনার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে। কৃষ্ণাকে বলুন; ও আমায় খাবার এনে দেবে।"

গুরু কৃষ্ণাকে কাছে ডেকে কোথায় কি খাবার আছে বলে দিতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন শঙ্কর ধীরে ধীরে সুধার শারিরীক এবং মানসিক অবস্থার কথা সমস্ত গুরুকে বলল। সমস্ত শুনে গুরু বললেন, "সবই ভালো বাবা; তবে এখন দেশে পাঠানো কি ঠিক হবে?"

"আমি কি করবো পিসিমা," শঙ্কর বললে, "ও যে মার কাছেই যেতে চাইছে। আপনি এই কথা মাকে বুঝিয়ে লিখে দেবেন তিনি যদি একান্তই এখানে না আসতে পারেন; তবে যেন ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন?"

গুরু চিন্তিত ভাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। মুখে কিছু বললেন না।

এমন সময় বেকাবীতে লুচি তরকারী কল মিষ্টি ইত্যাদি, সাজিয়ে নিয়ে কৃষ্ণা সে ঘরে প্রবেশ করল। শঙ্করের সামনে একটী ছোট টেব্‌ল দিয়ে তাতে খাবারের পাত্রগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। গুরু বললেন, "খাও, শঙ্কর; আহা, সারাদিন না খেয়ে বাছার মুখটা শুকিয়ে গেছে"—

কৃষ্ণা খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, "আহা তাই যেন; ওর যে জ্বর হয়েছে সিসিমা?"

চমকে উঠে গুরু বললেন, "সত্যি নাকি শঙ্কর; এ তোমার ভারী অন্যায় বাবা"—

শঙ্কর খেতে সুরু করে বললে, "মানা সিসিমা, ওর কথা শুনবেন না। আমি বেশ ভালো আছি; তাহলে এত খিদে পায়?"

গুরু কিন্তু বললেন না। শুধু অনুসন্ধিৎসু চোখে তার পানে চেয়ে রইলেন। আহারাদির পর শঙ্কর জামা পরে চুল আঁচড়াচ্ছিল। কৃষ্ণা পিছন থেকে বললে, "আমি তোমার সঙ্গে যাবো শঙ্কর"—

শঙ্কর বললে "কেন—"

"এমনি" কৃষ্ণা বললে।

শঙ্কর বললে, "আসল কথা বলনা কেন; অসুস্থ শরীরে আমি যদি রাস্তায় পড়ে মরে যাই সেই ভয়ে সঙ্গে যাচ্ছ?"

কৃষ্ণা রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, "যাও, আমি যাবোনা"—

শঙ্কর মুখ নীচু করে হাসি চেপে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগল।

যখন সময় গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণার উদ্দেশে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখলো, সে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দুয়ারে অপেক্ষা করছে।

একটী প্রকাণ্ড খোলা মাঠ। খুব সম্ভব ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠ। তার চতুর্দিকে, আম কাঁঠাল, জাম, জামরুল গাছের বাগান ঘেরা। মাঠের মধ্যে বাঁশ-বাড়ও আছে। তারই মধ্যভাগে একটি সুন্দর মঞ্চ সভামঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। মঞ্চের সামনে একটি মাইক ফিট করা আছে। শঙ্করের এই জায়গা বৈঠকে এসব অযথা অর্থব্যয়ের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তার সহকর্মীরা বললে, এখনকার জনসাধারণ মাইক ছাড়া কথা বললে শুনতেই চাইবে না। তাই মাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঠের মাঝখানে একটী বংশদণ্ডের আগায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। অপরাহ্নের মৃদু মন্দ বাতাসে আকাশের দিকে মাথাতুলে সেটি পত পত করে উড়ছে। মাঠখানিকে ঘিরে বিরাট জনতা নাবি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সভার নিয়মানুসারে জনৈক বিখ্যাত বেশনেতাকে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সভায় পৌঁছে শঙ্কর দেখলো, তিনি তখনও এসে উপস্থিত হননি। নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, স্বয়ং জনতার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে শঙ্করের সঙ্গে কৃষ্ণাকে আসতে দেখে তার মন আনন্দে খুশী হয়ে উঠল। দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে এসে বললে, "শঙ্কর, তোমার খবর কি? সারাদিন ছিলে কোথায়? ওদিকে বৌদি ত একেবারে কেঁদে কেঁদে সারা"—

বন্ধুর হাত ধরে শঙ্কর বললে, "আমায় মাপ কর ভাই; ভোরবেলায় বেরিয়েছিলুম এখানের কাজে; ফেরার সময় সিসিমার সঙ্গে একটা বিশেষ কারণে দেখা করতে গেলুম; কিন্তু সেখানে গিয়ে এমন শরীর খারাপ হোল যে আর উঠতে পারলুম না?"

"সত্যি তোমার চেহারাটা ভারিক শুকনো দেখাচ্ছে" বন্ধু বললে, "কি হয়েছিল ভাই; এখন কেমন আছো?"

"মাথা ধরে গা বমি বমি করছিল," শঙ্কর বললে, "এখন অনেক সুস্থবোধ করছি, চল সভার ব্যবস্থা দেখিগে।"

"হ্যাঁ চল", বলে বন্ধু কৃষ্ণার পানে তাকালো। সেদিন রাত্রের নিজের আচরণের কথা কৃষ্ণা ভুলে যায় নি; তাই আজ বন্ধুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে একটি ছোট্ট নমস্কার করল। এইতেই বন্ধু নিজেকে ধন্য মনে করল। নমস্কার বিনিময় করে সে বললে "চল তোমায় বসিয়ে দিয়ে আসি"—

মঞ্চে উঠে সুধাকে একটী আসনে রাণীর মত তার অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে বসে থাকতে দেখে, শঙ্কর এবং কৃষ্ণা উভয়েই একসঙ্গে, ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। সুধার অবস্থাও তদ্রূপ। গভীর লজ্জায় সে যে কি করবে ঠিক

করতে না পেরে অলাবণে মাথার ওঠন নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। ও দিকে পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের অবস্থা দেখে, রঞ্জন হেসে আকুল। হাসির বেগ একটু কমলে সে বললে, "কেমন সকলকে অবাক করে দিলুম দেখলে ত? বৌদি আমায় কি খাওয়াবে বল?"

তখন আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ একে একে আসতে সুরু করেছেন। সেচ্ছাসেবকরা তাঁদের নিয়ে আসছে। রঞ্জন বললে, "শঙ্কর ওঁরা সব আসছেন আমি দেখি গিয়ে। তুমি অল্পক্ষণ চুপ করে বসে থাকো, বেশী ঘোরাফেরা কোর না"—

রঞ্জন মণ্ডপ থেকে নেমে গেলে, সুধার দুই পাশে দুই-খানি চেয়ারে শঙ্কর এবং কৃষ্ণা বসল। সুধার সহজ সুন্দর বেশভূষার পানে চেয়ে শঙ্করের মনে তার প্রতি যত বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ জমা হয়ে ছিল সমস্তই যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় উবে গেল। তার আনমিত মুখখানির পানে চেয়ে দুটো মিষ্ট কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার মন ছটফট করতে লাগল। কিন্তু সুধা যে একবারও মুখ তোলে না সে করবে কি? ওই তো, অতিথিরা এদিকে আসছেন। তাদের অভ্যর্থনার জন্য শঙ্কর উঠে পড়ল।

শঙ্কর উঠে যেতেই কৃষ্ণা সুধার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "তোমায় এখানে দেখে, যে কি আনন্দ হোল দিদি কি বলবো"—

গভীর স্নেহে সুধার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। সে বললে, "ঠাকুরপো আমায় জোর করে নিয়ে এল ভাই; আমার ত এসব জায়গায় আসা অভ্যাস নেই; কি জানি, কি করতে কি করে ফেলবো"—

কৃষ্ণা বললে, "কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই; এই রকম বেরোতে বেরোতে তোমার সব ভয় কেটে যাবে দেখো"—

"হ্যাঁ ঠাকুরপো ও সেই কথা বললেন", সুধা বললে "ভাই পাড়াগাঁয়ে ছিলুম একরকম; কিন্তু সহরে এসে আমি যেন হাবুডুবু খাচ্ছি। সকলকে সন্তুষ্ট করতে চাই, কিন্তু কেউ সন্তুষ্ট হয় না"—

কৃষ্ণা বুঝতে পারল, তার মনের কোথায় লেগেছে আঘাত। তার বাথা করুণ মুখখানির পানে চেয়ে কৃষ্ণার মনে ভাবী মমতা হোল। আহা, দুদিন বাঁদে সে যা হবে; শারিরীক মানসিক কত কঠিন পরীক্ষার সামনেই না তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; তখন তুচ্ছ বিলাস বাসন, ও আত্ম-সুখের কথা তার ভাববার কি অবকাশ থাকবে? শঙ্কর কত নিষ্ঠুর অকারণে তাকে দুঃখ দেয়। দুপুরবেলা তরুর কাছে সুধার আসার সংবাদটা শোনা পর্যন্ত তাকে দেখার জন্য কৃষ্ণার মন আকুল হয়ে উঠেছিল। এখন তার এই অসহায় ব্যথিত মূর্ত্তি দেখে কৃষ্ণার কেবলিই মনে হতে লাগল, ঝড়ের সময় পক্ষীমাতা যেমন, তার শাবককে নিজ পক্ষপুটে আবদ্ধ করে রাখে, সেও সেইরকম সুধাকে নিজ স্নেহচ্ছায়ায় লুকিয়ে রাখে। সংসারের কড়তাপটা তার মনকে যেন এতটুকু বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে না পারে।

সুধার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললে, "শঙ্করের কথায় তুমি কান দিওনা দিদি; ও চিরদিনই ওইরকম ভাব পাগল। নিজের খেয়াল নিয়ে থাকে। তবে আজ দুপুরে তুমি ওর জন্য না খেয়ে বসে থাকবে, এই কথা ভেবে ওর দুঃখ তুমি দেখতে যদি দিদি, তবে ভেসে যেতো"—

হাসির বদলে গম্ভীর মুখে সুধা বললে, "একটা খবরও দিতে পারতো ভাই!"

"সেটা ওর ইচ্ছাকৃত দোষ নয় দিদি", কৃষ্ণা বললে, ও বাড়ী ফিরে যেতেই ঢেলেছিল কিন্তু শরীরের এমন অবস্থা হোল যে শেষে উঠতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমায় বলেছিল, তোমায় ফোনে খবর দিতে; কিন্তু ওর শরীরের অবস্থা দেখে, আমি বেরোতে পারলুম না দিদি"—

সেই সময় তরুতা গভীর জয়ধ্বনি করে উঠল। শঙ্কর ও রঞ্জন প্রধান অতিথি মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে এসে যথাস্থানে বসিয়ে দিল। রঞ্জন বললে, "চারটে বাজে এইবার সভার কাজ আরম্ভ করা যাক?" সকলে বলে উঠলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ" রঞ্জন কৃষ্ণার সামনে গিয়ে বললে, "তোমায় একটা গান করতে হবে কৃষ্ণা?"

"আমি?" কৃষ্ণা ত আকাশ থেকে পড়লো। "এ তোমার ভারী অন্যায় রঞ্জন; আগে আমায় কিছু বলোনি; আমি তৈরী হয়ে আসিনি"—

"নাই বা এলে তৈরী হয়ে তাতে কি হয়েছে? "রঞ্জন

বললে, "আমিই কি জানতুম, তুমি এ সভাতে আসবে? নাও নাও উঠে পড়—"

রঞ্জন গিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "এখন উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবেন, শ্রীমতী কৃষ্ণা লাহিড়ী"—

কৃষ্ণা উঠে এসে মাইকের সামনে দাঁড়াতেই লজ্জায় তার পা কাঁপলো না, কিন্তু মাথা ঘুরে গেল। মাঠ ভরি বিরাট জনতা তার প্রতি অসীম কৌতূহলে তাকিয়ে আছে। এদের সামনে তাকে গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে। চোখ বন্ধ করে সে সুমুখের দৃশ্যাবলী ভুলে গিয়ে মধুর কণ্ঠে গাইল—"বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং সুখদাং বরদাং মাতরম্।
কোটী কোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে;
কোটী কোটী ভূজৈধৃত খর করবালে,
.....
ত্বমি বিদ্যা ত্বমি ধর্ম,
ত্বমি হৃদি ত্বমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
অবলা কেন মা এত বলে।
বহু বল ধারিণীং নমামি তারিণীং
.....রিপুদল বারিণীং মাতরম্।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী কমলা কমল দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং, অমলাং অতুলাং;
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং, সুস্মিতাং ভূষিতাম
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ করতালিতে সভাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণা ফিরে এসে নিজের আসনে বসে পড়ল। প্রথম অতিথিকে মাল্যদান করে যথারীতি সভার কাজ সুরু করা হোল। প্রথমে শঙ্করের বলার পালা। সে উঠে দাঁড়িয়ে তার মিলের কর্মীদের সম্বোধন করে বললে, "ভাই সব আজ আমরা সকলে এখানে এসে মিলেছি কেন জানোত? সকলের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করার জন্য। সকলে মনখুলে মনের কথা পরস্পরের কাছে বলার জন্য। কারো মনে যদি কোনও রকম অসন্তোষ জেগে থাকে, আমাদের মিলের প্রতি, বেতন ইত্যাদি নিয়ে, তবে সে অকপটে তার অভিযোগ এখনি জানাও। আমরা তোমাদের অভাব অভিযোগ মেটাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। তাইসব, নিজেদের মধ্যে প্রথমে যোকাপড়া না করে, কখনও বাইরের লোকের কাছে নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা জানাতে যেওনা। তাহলে ভবিষ্যতে তোমরা অতল দুঃখের মধ্যে পড়বে। জানোত, কথা আছে, 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়', সেই রকম কোনও ব্যাপারে যত বেশী লোকের সমাবেশ হয়, ততই সেখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই আবার বলছি ভাইসব, তোমরা আমাদের মনিব মনে কোরনা, ভাই মনে কোর; এবং ভাই যেমন ভাইর কাছে নিজের মনের কথা বলে, তোমরাও সেইরকম মনখুলে আমাদের কাছে তোমাদের মনের কথা বল। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের কথা আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে শুনে সততার সঙ্গে পালন করতে বদ্ধপরিকর হবো"—।

শঙ্করের বক্তৃতায় শ্রোতার দল অভিভূত হয়ে গেল। তারা যে কি বলবে ঠিক করতে না পেরে শুধু করতালি এবং আওয়াজ দিতে লাগল। একের পর এক অতিথিদের বক্তৃতাদি শেষ হবার পর সভা ভাঙতে রাত্রি হয়ে গেল। শ্রমিকদের মধ্যেকার সর্দাররা যথারীতি প্রসন্নমুখে এসে শঙ্কর ও রঞ্জনকে প্রণাম করে বিদায় নিল। তারপর অতিথিদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তারা সকলে মিলে গল্প করতে করতে এসে গাড়ীতে উঠে বসল। আজ এই খোলা জায়গায় মন খোলা পরিবেশের মধ্যে এসে তাদের সকলের মনের বাঁধ যেন খুলে গেছে। শতদল বাবু তারা তিনজনেই সভার সাফল্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। তারি সঙ্গে ছুটে চলেছে রাজপথের শতধা বিচ্ছিন্ন সামাজিক জীবন ধারা।

(ক্রমশঃ)

ভুল

ডাঃ শ্রীসতীদেবী মুখোপাধ্যায়

সেদিন ছিল কোম্পানীর হিসাব নিকাশের দিন। সমস্ত অফিস কর্মব্যস্ত। কর্তাধীকারী মিষ্টার সেন ৯টা থেকেই একেবারে কাজের সমুদ্রে ডুবে গেছেন। একে কাজ পাগলা মানুষ তার ওপর বাৎসরিক হিসাব নিকাশ হচ্ছে, কাজেই আজ তিনি আরো ডুবে আছেন কাজের ভেতর।

এত ব্যস্ততার মাঝে একমাত্র মিস রায় অলস ভাবে নিজের টেবিলে বসেছিলেন। মিষ্টার সেনের ষ্টেনো তিনি। বছর খানেক হোল এই অফিসে কাজ করছেন—তাঁর কাজে মিষ্টার সেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট, তাঁর ব্যবহারে সারা অফিসের কর্মচারী তাঁকে পছন্দ করেন।

বহুক্ষণ নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থাকার পর হঠাৎ মিস রায় টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। প্রকাণ্ড হলঘরটায় কর্মচারীতে পূর্ণ থাকলেও নিস্তব্ধ। সকলেই টেবিলের ওপর ঝুঁকে কর্মব্যস্ত—মিস রায়কে দেখে কেউ কেউ মাথা তুলে তাকাল, তিনি কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা চেক ক্লার্কের কাছে গিয়ে বললেন, মিষ্টার ঘোষ, একেন্টকে যে ষ্টেনোর জন্যে খবর দিয়েছিলেন কেউ এসেছেন কি।

চেককার্ক সমর ঘোষ বললেন, না এখন পর্যন্ত কেউ আসেন নি। মিস রায় বললেন, যতদিন না কোন ষ্টেনো রাখা না হয় ততদিন আমিই কাজ চালিয়ে যাব।

মিস্ রায় কথাটা শেষ করে মন্থর পদে মিষ্টার সেনের অফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন।

সমর ঘোষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন সাহেবের যে কি খেয়াল। শুধু শুধু মিস রায়কে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে অত একজন ষ্টেনো রাখছেন। এই এত বছর উনি কাজ করছেন সকলেই ওর কাজে ব্যবহারে খুসী। সাহেব নিজেও তো কতবার বলেছেন একথা। তবে কি হোল যার জন্যে—ওকে জবাব দিচ্ছেন?

এই নিয়ে অফিস শুদ্ধ সকলেই মাথা ঘামিয়ে ফেললেন, তবু এ প্রশ্নের উত্তর খুজে পেলেন না।

মিস রায় অফিসে প্রবেশ করে মিষ্টার সেনের টেবিলের ধারে দাঁড়ালেন। মিষ্টার সেন ফাইলের পাহাড়ের মাঝে যেন ডুবে আছেন। বড় বড় কক্ষ চুলগুলি কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে, খেয়াল নেই। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিস রায়ের বড় ইচ্ছে হোল চুলগুলি তুলে দিতে। কিন্তু বলবার আগেই মিষ্টার সেন অন্য মনস্ক ভাবে মুখ তুললেন, সামনে মিস রায়কে দেখে ভ্রু ঈষৎ কুঁচকে বললেন—এখন কোন প্রয়োজন নেই, যেতে পারেন।

মিস্ রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে সরে এলেন। অদ্ভুত ভাঙ্গ পাগল মানুষ।

সমস্ত দিন একভাবে কেটে গেল। বিকেলে অফিসে ছুটির পর মিষ্টার সেন উঠলেন। একভাবে বসে কাজ করতে করতে ঘাড় টনটন্ করছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে হাত পা টান করতে গিয়ে নাকে একটা সুমিষ্ট গন্ধ এলো। বড় পরিচিত গন্ধ। এই সুমিষ্ট গন্ধের অধিকারিণীকে মিষ্টার সেন নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে বড় ভালবেসে ফেলেছেন। সমস্ত মনটা তার কাছে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

তিনি দরজা ঠেলে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। মিস্ রায় বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন. তাঁকে দেখে সুমিষ্ট ভাবে হাসলেন।

মিষ্টার সেন এগিয়ে এলেন টেবিলের ধারে। মুগ্ধ চোখ দুটী মিস রায়ের মুখের ওপর রেখে গভীর সুরে বললেন দেখুন, আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

বিস্মিত মিস রায় সপ্রশ্ন নেত্রে তাকিয়ে রইলেন।

মিষ্টার সেন বললেন—কাজ ছাড়া আমি কিছু বুঝি না, তাই ঠিক মত সুন্দর ভাবে কথা বলতেও পারছি না। আপনাকে আমার বড় ভাল লেগেছে—আপনাকে—আমি বিয়ে করতে চাই।

মিষ্টার সেনের কথা শুনে এবার মিস্ রায় খিল্ খিলিয়ে হেসে উঠলেন। জলতরঙ্গের মত সে হাসি। শুনতে শুনতে মিষ্টার সেন রোমাঞ্চিত হলেন। মিস্ রায় হাসি থামিয়ে বললেন,—

তোমার কি মনে নেই, গত কাল যে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

এবার অবাক হলেন মিষ্টার সেন। সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন মিস রায়ের পানে—তাঁর স্ত্রীর পানে।

মিসেস্ সেন এগিয়ে এলেন স্বামীর কাছে সস্নেহে স্বামীর দুই হাত ধরে বললেন, এত কাজ-পাগল যে, বিয়ে করেও ভুলে গেছ—সে কথা। কোন দিন না আমাকেও ভুলে যাও মিষ্টার সেন।

মহিলা সমাচার

শ্রীমতী রমা মিত্র

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব সম্মিলনী—বঙ্গ রমণীর কৃতিত্ব :

নভেম্বর মাসে নূতন দিল্লীতে যে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল—তাহাতে বঙ্গরমণী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শ্রীমতী রেবা সাহুনি সেতার বাজাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদের ক্রাইষ্ট কলেজের ইংরাজি এম-এ ক্লাসের ছাত্রী।

শ্রীমতী তনিমা ভট্টাচার্য্য এ-আই-আর সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়বার সঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাশয়ের হাত হইতে নয়া দিল্লীতে গিয়া পুরস্কার গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার শিল্পী।

ভাটালের সুপ্রীম কোর্টে প্রথম মহিলা এটর্নী :

দক্ষিণ আফ্রিকার ভাটাল রাজ্যের সুপ্রীম কোর্টে কুমারী পণ্ডামাদি মুদু কৃষ্ণা এটর্নীর তালিকাভুক্ত হইয়া আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনিই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ভারতীয় রমণী এটর্নী।

ব্যায়ামে নারী বীর শিবানী :

হাওড়া বসন্ত আদর্শ ব্যায়াম সমিতির সভ্যা কুমারী শিবানী দাস প্লাষ্টিক বেড ব্যায়াম পদ্ধতি দেখাইয়া বালিগঞ্জ সার্কাসের এই নব ব্যায়াম কৌশলের দক্ষ উত্তর দিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শিবানী দাসের ৬ ছবি তোলার হাড়তাড়া (রোমলেস) ব্যায়াম যেমন বিস্ময়কর তেমনই কৃতিত্ব পূর্ণ।

রাণী এলিজাবেথের আমেরিকা ভ্রমণ :

গত মহাযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যাইত না—বর্ত্তমানে ইংরাজ রাজ্যের সে সম্মান প্রতিপত্তি নাই। তথাপি জনসাধারণের নায়িকা ও যুক্ত রাজ্যের রাণী এলিজাবেথ সম্প্রতি কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়া প্রতিপত্তি প্রসার না করিলেও সৌহৃদ্যতা স্থাপন করিয়া বিশ্বের কল্যাণ স্থাপন করিয়াছেন এবং গণতন্ত্রবাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট আইজান হোর মহাশয় রাণী এলিজাবেথকে যে সম্মান ও ভক্তি দেখাইয়াছেন তাহা বৃটিশদের পূর্ব্ব ঐতিহ্য প্রতি সম্মান প্রদর্শনে।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাতিমহিলাদের বাংলা শিক্ষায় আগ্রহ :

নিখিল ভারত যুবভাষা প্রসার সমিতিতে বাঙ্গলা শিখিবার জন্য কলিকাতায় মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাতি মহিলাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীমতী মালিনী দিবাকর এম-এ, বি-টি, শ্রীমতী আশা গ্যাডগীল, শ্রীমতী বসন্তলা ব্যানির্জ্জি, শ্রীমতী মালিনী মারহেথে শিক্ষিতা মারহাঠী মহিলাগণ এবং শ্রীমতী শান্তা প্যাটাল এম-এ, জ্যোতি বেলাড়ী বি-এ, পল্লবী মেহেটা বি-এ, সুধা সাহা বি-এ আগ্রহের সহিত বাংলা শিখিতেছে।

স্বর্গিক কবিরাজ কবি পুত্রবধূ :

বিখ্যাত স্বর্গিক কবিরাজ মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী স্নেহলতা সেন বাংলা সাহিত্যতে কাব্য সৃষ্টি করিয়া সুনাম

অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'পাখের' ও 'ঘরের কোণে'—পুস্তকদ্বয় বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার পুষ্ট করিবে। তাঁহার পুত্র সহীরঞ্জন সেন চীনা ভবনের প্রতিষ্ঠাতা।

লটারীতে বঙ্গ রমণীর ভাগ্যে ৪০,০০০৲ :

সামান্য ঘরের গৃহিণী শ্রীমতী সুরবালা দাস ৬২ ডি সদানন্দ রোড নিবাসী মহিলা কি. বি. চ্যারিটির লটারীতে ২৲ মূল্যের টিকিট কিনিয়া ৪০,০০০৲ পুরস্কার পাইয়াছেন।

মিসেস্ চিনআওংএর হস্তে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুস্তক প্রদান :

গত ১২ই ডিসেম্বর মিঃ ডাঃ বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী ইউ নু কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সমিতি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা রচনা প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলা বার্ষিক ১০০৲ পুরস্কারের জন্য ৩৫০০৲ এ্যাওাউমেণ্টে স্থাপন করিতে চ্যান্সেলাররূপে মিঃ ইউ নু প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন।

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি এইদিন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ খানি বাঙ্গলা পুস্তক প্রদান করেন। এই পুস্তকগুলি একটি তাম্রতাটে প্রশস্তি বাক্য ঘোষিত করিয়া প্রদান করা হয়। সেই উপহার তিনি গ্রহণ করিয়া রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরএর পত্নী শ্রীমতী চিন্ আওংএর করকমলে অর্পণ করেন এবং বলেন—"এই পুস্তকগুলি প্রীতির নিদর্শন ও মূল্যবান সম্পত্তিরূপে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত হইবে।"

তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র (পুঁথি আকারে মুদ্রিত করিয়া চিত্রিত কাষ্ঠের পাটার মধ্যে রক্ষিত) প্রদান করা হয়, তাহার উত্তর প্রদানকালে বলেন—বাঙ্গলা ভাষা আমি যে সব ভাষা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট ভাষা। যখনই আমি বাংলা শুনি তখনই মনে হয় আমি যেন পদ্য বা গান শুনিতেছি।

কলিকাতায় মার্কিণ গায়িকা এণ্ডারসন :

গত ২৪শে নভেম্বর আমেরিকার কোকিল কণ্ঠী গায়িকা মিস্ মেরিয়ান এণ্ডারসন এক সঙ্গীত আসরে সকলের চিত্তে পরম তৃপ্তি দিয়াছিলেন। ২০০০ দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ২ ঘণ্টা গান শুনান। তার কণ্ঠ যেমন সুমিষ্ট, তেমনই সুরের উঠা নাবার কায়দা। কলিকাতা সহরে এই বিশ্ববিশ্রুত নিগ্রো গায়িকা অপূর্ব্ব সঙ্গীত রস পরিবেশন করিয়া ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ভগবান মানুষকে সমান গুণ ও অধিকার দিয়া সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিতে ধনী-কাঙ্গালে প্রভেদ নাই। সবার উপর মানুষ সত্য—ইহাই প্রমাণিত হইল।

'৫৭ সালের জন্য স্নাতক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এস্-সি, বি-কম্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণকে মাসিক ৩০৲, করিয়া ৩০টি বৃত্তি দুই বৎসর যাবৎ সরকার প্রদান করিবেন। তাহার মধ্যে ইংরাজিতে—অমিতি সেন (লরেটো); বাংলা—অনিতা গুপ্ত (প্রেসিডেন্সী), সংস্কৃত—দীপ্তি সিংহ (বেথুন) ফার্সী—সিতারা জীবন (লেডী ব্রেবর্ণ); উদ্ভিদবিদ্যা—সুজাতা গুহ ঠাকুরতা (প্রেসিডেন্সী)।

মিঃ ভারতীয় লেখক সম্মেলন :

২০—২৪ ডিসেম্বর (১৯৫৭) কলিকাতার মহাজাতি সদনে ভারতের প্রধান ১৪টি ভাষার লেখকসঙ্ঘের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রথম অধিবেশনের, সভানেত্রী হন ত্রিপুরার মহিলা লেখিকা—মহাদেবী বর্মণী। উদ্বোধন করেন—হুমায়ুন কবীর তামিল সাহিত্যিক রাজ-গোপালাচারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিবর্ত্তে।

ভাষা সমস্যা ও লেখকদের কর্ত্তব্য শাখার ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ, রাষ্ট্র ও সাহিত্য শাখার কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী (উড়িষ্যা) ভারতীয় কবিতা ও কথাসাহিত্যের ধারা শাখা—মিঃ জর্জ (তামিল) ভারতীয় সাহিত্যে প্রগতিবাদ শাখা—উমাকান্ত যোশী (গুজরাতি), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের মিলন সূত্র শাখায়—বি. ডি. গুরেরকার (মারাঠী)—সভাপতিত্ব করেন। শ্রীজহরলাল নেহেরু দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বক্তৃতা দেন।

বিশ্বভারতী সমাবর্ত্তনে আজারবাইজানের ছাত্রী :

গত ২৩শে ডিসেম্বর, শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আচার্য্য শ্রীজহরলাল নেহেরু সভাপতিত্ব করেন।

তিনি বলেন—"বিশ্বভারতীর আচার্য হইবার সম্মান যোগ্যতা নির্ধারণ করা উচিত যে বাঙলা ভাষা বলিতে না পারিলে কেহ বিশ্ব ভারতীর আচার্য হইতে পারিবে না।"

তাঁহার চাত্র হইতে অনেক আন্তর্জাতিক ছাত্রী সাহচর্যের প্রতীক সম্পর্কে পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আজারবাইজানের এক ছাত্রী বাংলা ভাষায় গানের জন্য প্রশংসা পত্র লাভ করেন।

সারাজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র

অন্যান্য সমাজ মঙ্গল কাজের সহিত মা ও শিশুদের সেবা কার্যও সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি (কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অর্থ সাহায্যে) গত ১৯৫৫ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। এই বিভাগে একজন অভিজ্ঞ পুরুষ ডাক্তার, একজন অভিজ্ঞা মহিলা ডাক্তার, একজন নার্স একজন আয়া ও একজন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত আছেন। যাঁহাদের আয় মাসিক ১৫০৲ টাকার উর্দ্ধে নয় তাঁহাদের স্ত্রী ও শিশুরা এই কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। পুরুষ ডাক্তার সপ্তাহে তিন দিন শিশুদের এবং মহিলা ডাক্তার সপ্তাহে দুই দিন স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ঔষধ ইনজেকশন প্রভৃতি ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে সাগু, বার্লি, দুধ, প্রভৃতি পথ্য বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৫১ জন শিশু এবং ১২৬ জন মাতা এই কেন্দ্রে চিকিৎসিত হইয়াছে। তাহাদের রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৫৬-৫৭ সনে গড়ে প্রতিমাসে শিশু বিভাগে ১০৩ জন নূতন ও ৩০৫ জন পুরাতন, মোট ৪০৮ জনকে চিকিৎসা করা হয়। মহিলা বিভাগে গড়ে প্রতিমাসে নূতন ৪১ জন ও পুরাতন ৬৮ জন মোট ১০৯ জন চিকিৎসিত হইয়াছে। ১৯৫৭ এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গড়ে প্রতিমাসে নূতন ও পুরাতন মিলিয়া ৩২২ জন শিশু ও ৫০ জন মাতাকে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

এই কেন্দ্রে প্রত্যহ দরিদ্র শিশু ও প্রসূতিদের জনপ্রতি ১ সোয়া হিসাবে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। শিশু ও বালক বালিকারা যাহাতে এখানেই দুগ্ধ খাইয়া যাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার শিশুদের ওজন লওয়া হয় এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি অবনতি লক্ষ্য করা হয়। ১৯৫৫ সনে গড়ে প্রতিদিন ৩০টি ছেলে মেয়েকে দুগ্ধ দেওয়া হয়। ১৯৫৬-৫৭ সনে গড়ে প্রতিদিন ৬০টি শিশু ও ১৯ জন প্রসূতিকে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সন পর্যন্ত United Council of Relief & Welfare প্রয়োজনীয় গুড়া দুগ্ধ দান করিয়াছেন। এই বৎসর Indian Red Cross Society মাসে ২০০ পাউণ্ড গুড়া দুগ্ধ দিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শিশু-প্রদর্শনী

শিশু পালনে মায়েদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য গত ২৩শে নভেম্বর এক শিশু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীতে কলিকাতা ও বালিগঞ্জের বস্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মুসলিম পরিবারের শিশুদের যোগ দিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। মোট ৫৩টি শিশু প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। প্রথম দলে এক বৎসরের অনধিক বয়সের ১০ জন, দ্বিতীয় দলে ১ হইতে ২ বৎসর বয়সের ২১ জন এবং তৃতীয় দলে ২ হইতে ৩ বৎসর বয়সের ২৪ জন। ডাঃ শ্রীমতী মীরা বোস, ডাঃ শ্রীমতী অমলী ব্যানার্জী, ডাঃ শ্রী বি, এন্, চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ রায় শিশুদের প্রাথমিক পরীক্ষা করেন। টীকা দেওয়া হয় নাই বলিয়া ১০জন শিশুকে প্রতিযোগিতায় গ্রহণ করা হয় নাই। অতঃপর ডাঃ মিসেস সরলা বোস,

ডাঃ সুশীলা রায় ও ডাঃ মিসেস এস ব্যানার্জি শিশুদের শেষ (final) পরীক্ষা করেন। প্রতি দলে ৩টি করিয়া মোট ১৫ ও ১টি বিশেষ সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

এতোপলক্ষে গত ৩০শে নবেম্বর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের সহ অধিকর্ত্রী ডাঃ অনিলা ব্যানার্জী সভানেত্রীত্ব এবং শ্রীমতী অঞ্জলি খান এম্-এস্ ও, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মাতৃ ও শিশুমঙ্গল বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী শেফালী চৌধুরী অনুরোধ করায় সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মনিকা গুপ্তা কেন্দ্রের (উল্লিখিত) বিবরণী পাঠ করেন। সভানেত্রী, প্রধান অতিথি এবং সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ বক্তৃতায় এই ধরণের শিশু প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উল্লেখ করেন।

১১ জন শিশুকে খেলনা, জামা কাপড়, ইত্যাদি দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়, প্রায় অতিরিক্ত শিশুদের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

সমিতির সাহায্যার্থ "নৌকাবিলাস" লীলাভিনয় ও নৃত্যগীতানুষ্ঠান

গত ১৮ই জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সমিতি ভবনে মহিলা সমিতি বিভাগীয় সম্পাদিকা শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী এবং কার্য্যকরী সমিতির অন্যতমা সদস্যা শ্রীমতী প্রীতি সেনের উদ্যোগে মেয়েদীলালী সঙ্ঘের কিশোর বিভাগের পরিচালিকা শ্রীমতী বিমলা মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কিশোর কিশোরীদের "নৌকাবিলাস" লীলাভিনয় এবং শ্রীমতী রত্নাবাস ও শ্রীমতী শেলী সাহানের পরিচালনাধীনে নৃত্য-গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষে সমিতির সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকগণ সমিতির সাহায্যার্থে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান।

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ, অ্যাডিশ্ শ্রী নির্ম্মল কুমার সেন, শ্রী কে, পি, বৈতান ও শ্রীমতী বৈতান, শেরিফ পত্নী শ্রীমতী প্রতিমা রায় এবং আরও অনেক বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই সকল সম্মানীয় অতিথিবর্গের উপস্থিতি উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত, ভজন, নৃত্য, প্রভৃতি সকলের আনন্দবর্দ্ধন করে। কিশোর কিশোরীদের অভিনীত শুক্তিরসাত্মক "নৌকাবিলাস" লীলাভিনয় বয়সোত্তীর্ণ হয় ও বিশিষ্ট দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের চিত্ত বিনোদনে সাফল্য লাভ করে।

শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী, শ্রীমতী প্রীতি গাঙ্গুলী, শ্রীমতী সবিতা ব্যানার্জী ও শ্রীমতী অমিতা গুহ অভিনয়ের উৎকর্ষতার জন্য এ জনকে রৌপ্যপদক দ্বারা পুরস্কৃত করেন।

সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ এই অনুষ্ঠানের সকল উদ্যোক্তাদের, পরিচালকদের এবং সম্মানীয় অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ জানান।

মঙ্গল মহিলা সমিতির বার্ষিক শিল্প পরীক্ষা

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতি সমূহে সুনির্দ্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী নানাবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে এই সকল শিক্ষার্থীদের জুনিয়ার ও সিনিয়ার কোর্সের পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সনের বার্ষিক শিল্প পরীক্ষা ৪টি কেন্দ্র গৃহীত হয়।

১। সরোজনলিনী শিল্পবিদ্যালয়, কলিকাতা।

বিবেকনগর, হাওড়া রেলওয়ে, হালতু ইউনিয়ন, মহুশ্রী পল্লি, শ্রীকলোনী, শ্রীরামপুর, লালবাগান, গান্ধীকলোনী, এবং দক্ষিণ কলিকাতা মহিলা সমিতি এবং সরোজনলিনী সমিতির বয়স্কা শিক্ষা বিভাগের মোট ৫১ জন জুনিয়ার ও ১০ জন সিনিয়ার শিক্ষার্থী এই কেন্দ্রে পরীক্ষায় যোগদান করে। সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মমিতা রায় চৌধুরী এই পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহকর্মীদের অনেকে তাঁহাকে সাহায্য করেন। সরোজনলিনী সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির সভ্যাদের ভিতরে শ্রীমতী প্রীতি সেন ২ দিন, শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী এবং শ্রীমতী সবিতা ব্যানার্জী একদিন করিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

নৈহাটী কেন্দ্র : মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

নৈহাটী রেলওয়ে, নৈহাটী সেন্ট্রাল ক্লাব, রাহুতা, চাকদহ, ও ব্যারাকপুর মহিলা

সমিতির মোট জুনিয়ার—২৬ জন ও সিনিয়ার ৮ জন পরীক্ষার্থী এই কেন্দ্রে পরীক্ষায় যোগদান করে।

মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অনেক অসুবিধার ভিতরে ও পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য বিদ্যালয়ের ২ খানা ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার সহকর্মী-গণ ও ডাক্তার শ্রীরঘুনাথ চ্যাটার্জী এই পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় বহুবিধ প্রকারে সাহায্য করেন। এই জন্য কেন্দ্র সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান যাইতেছে।

কেন্দ্র সমিতি হইতে সমিতির কর্মী শ্রীমতী সুবোধবালা ঘোষ নৈহাটী থাকিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করেন, নৈহাটী কেন্দ্রের সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী উষা ব্যানার্জী, সম্পাদিকা শ্রীমতী বেলা গুপ্তা, সেন্ট্রাল ক্লাব সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী নিশ্মলশশী দেবী, ব্যারাকপুর সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী রমা ঘোষ উপস্থিত থাকিয়া কেন্দ্র পরিচালনায় সাহায্য করেন। তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।

ব্যাটরা পরীক্ষা কেন্দ্র

তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনায় ব্যাটরা মহিলা সমিতির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গৃহীত হয়। জুনিয়ার—২ জন ও সিনিয়ার—৭ জন পরীক্ষার্থী এই কেন্দ্রে যোগদান করে। তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও তাঁহার সহকর্মীদিগকে ধন্যবাদ জানান যাইতেছে।

কাঁচড়াপাড়া পরীক্ষা কেন্দ্র

হার্পেট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পরিচালনায় হাই ওমার্ন বেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হয়। এই কেন্দ্রে ভাটপাড়া ও কাচড়াপাড়া সমিতি-দ্বয়ের মোট জুনিয়ার ৯ ও সিনিয়ার ৪ জন পরীক্ষার্থী যোগদান করে। সমিতিদ্বয়ের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী হেলেনা সেন-গুপ্ত, সমিতিদ্বয়ের সম্পাদিকা ও অন্যান্য সভ্যাগণ পরীক্ষা গ্রহণে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। হার্পেট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও তাঁহার সহকর্মীদিগকে এবং সমিতিদ্বয়ের সভ্যাগণের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।

কাটিহার ও পুরী পরীক্ষা কেন্দ্র

কাটিহার রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদকের পরিচালনায় কাটিহার মহিলা সমিতির পরীক্ষার্থিদের পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই কেন্দ্রে জুনিয়ার ৪ জন ও সিনিয়ার ৩ জন পরীক্ষার্থী যোগদান করে।

পুরী বনজকুমারী বিধবা আশ্রমের জুনিয়ার—৭ ও সিনিয়ার—৭ জন মোট—১৪ জন পরীক্ষার্থী বড়মা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে পুরী বিধবা আশ্রমে পরীক্ষা দেয়।

বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন

সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্র সমিতিতে ও বিভিন্ন মহিলা সমিতিতে গত ডিসেম্বর মাসে বয়স্কা শিক্ষা দিবস পালন করা হয়। এতদুপলক্ষে প্রচারকেরী ও শোভাযাত্রা বাহির করা হয় এবং আবৃত্তি, নাচ-গান, ও নাটকাভিনয় করা হয়।

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির
মুখপত্র

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বঙ্গলক্ষ্মী

৩৩শ বর্ষ] বঙ্গলক্ষ্মী—বৈশাখ, ১৩৬৫ [২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরী মা

শ্রীঅম্বুজ বালা দেবী

আজ থেকে শতবর্ষ আগে ভবানীপুরের সম্ভ্রান্ত স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌভাগ্যে গিরিবালা দেবী কালী সাধনা করতে করতে ধ্যানাচ্ছন্না হয়ে পড়লেন। রাত্রি গভীর। সমগ্র বাড়িটি ঘুমিয়ে রয়েছে, জেগে আছেন শুধু ঐ পরমাসুন্দরী যুবতী গিরিবালা। ধ্যানাচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে এলো তাঁর নিবিড় তন্দ্রা দেখলেন এক অপূর্ব স্বপ্ন। চারি দিক ঘন তমসাচ্ছন্ন। এই তমসার আবরণ ভেদ করে দেখা দিল একটি জ্যোতির্মণ্ডল, সেই মণ্ডলের মধ্যে বিরাজিতা মহামায়া—এক দিব্য শিশু রয়েছে তাঁর দুই হাতের ওপর প্রসারিত অবস্থায়। গিরিবালা সেই দেব শিশুকে তুলে নিলেন আর আনন্দে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর তন্দ্রা কেটে গেল।

এই দৈবীপট ভূমিকার ওপর গিরিবালার দ্বিতীয়া কন্যা মৃডানী, (অজ্ঞাতনামা কন্যানী) যিনি পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীগৌরী মা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন, ১২৮৪ সালে (১৮৭৮ খৃঃ) নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে ফাল্গুন মাসে চিন্ময় লোক থেকে অবতরণ করেছিলেন এঁর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইনি বৈদিক যুগের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর আদর্শ নিজের বিচিত্র লীলাময় পূত চরিত্রের ওপর ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই তপস্বিনী ও সন্ন্যাসিনীর অলৌকিক জীবনের কাহিনীগুলির সহিত পরিচিত হোলে, বেশ বুঝতে পারা যায় যে ইনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ হয়ে জন্মেছিলেন। ইনি এসে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের আলোর চেতনা—দীর্ঘশতাব্দী ধরে আমাদের মুখে ছিল না কথা, অবগুণ্ঠনে ছিল তা ঢাকা। ইনি মুখর করে গেছেন আমাদের কথা, খুলে দিয়ে গেছেন সব অবগুণ্ঠন আর দেখিয়ে গেছেন এক একটি নারী 'জ্যান্তো জলন্তা'। দীর্ঘ আশী বছর ধরে ইনি এঁর ত্যাগ ও তপস্যাদীপ্ত জীবনকে বিশ্ববাসীর কাছে আদর্শের জলন্ত পাবক শিখা করে রেখে গেছেন।

গৌরী মা বলে গেছেন—'মাতৃজাতির দুর্গতি যতদিন থাকবে, দেশের উন্নতি হবে না। মায়েদের ঠেলে রাখলে স্বর্গ কখনও হবে না'—নারীর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ইনি বলেছেন 'স্নেহ, সেবা, আত্মসংযম, ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি মনুষ্যত্বাবলীর মিলন ক্ষেত্র বলিয়াই হিন্দু নারী 'দেবী' আখ্যা পাইয়াছিল। তাহাকে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইবে। তাহা না হইলে, কুশিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা অনেকাংশে শ্রেয়।' ইনি আরও বলেছেন—"মায়েরাই জাতির শিক্ষক···বাইরের চাক চিক্যে মেয়েদের সৌন্দর্য্য বাড়ে না। মেয়েদের আসল সৌন্দর্য্য—তাদের দেহ মনের পবিত্রতায়···পরের সেবা করতে এসে যদি মনের কোনরূপ আত্ম প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা জাগে তবে সাধন-জীবনে তা আত্মহত্যারই তুল্য জানবে। যদি প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পেতে চাও, তবে সব ছেড়ে ভগবানকে ডাক। পেছন ফিরে চেয়ো না।··· তোমরা মায়েরা কম কিসে গো? এই যে যুগে যুগে কত কত সাধু সন্ন্যাসী অবতার এসে জগতের কল্যাণ করছেন, এঁরা সবাই মায়েদের পেটেই জন্ম নিয়েছেন। মায়েরাই সমাজ এবং ধর্মকে ধরে রেখেছেন। তাঁদের ভক্তি বিশ্বাস বেশী। চেষ্টা করলে তাঁরাই শীঘ্র শীঘ্র ভগবান লাভ হোতে পারে।'

আজ শ্রীশ্রীগৌরী মার শত বার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর অমূল্য বাণী গুলিই হোক্ আমাদের বক্তব্য—আমাদের আলোচ্য। তাঁর বাণীই হোক্ আমাদের বিশ্ব প্রবাসের পথে সম্বল পাথেয়।

মুড়ানী গ্রামে গৌরী মার পিতার নাম পার্ব্বতী চরণ চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম গিরিবালা দেবী। পার্ব্বতী চরণের নিবাস হাওড়া জেলার শিবপুরে। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত তেজস্বী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভবানীপুর নিবাসী ভবানী চরণের কন্যা কালিকানী দেবীর কোন পুত্র দীর্ঘজীবী না হওয়ায় গিরিবালা দেবী তাঁর সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন। এই সূত্রেই শিবপুর থেকে এখানে এসে তাঁকে জীবনের অধিকাংশ সময় থাকতে হয়েছে। আর মুড়ানী ও ছেলেবেলা থেকে এখানে মানুষ হয়েছিলেন। পিতা শিবপুরে এক সওদাগরী অফিসে চাকুরী করতেন। মাতার চরিত্র বহু গুণান্বিত ছিল। তিনি ধর্মপরায়ণা, দয়াবতী ও বুদ্ধিমতী এবং অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, পারসী ও ইংরাজী ভাষায় এই অন্তঃপুর চারিণী মহিলার অধিকার ছিল। তিনি সুগায়িকা ও কবি ছিলেন। তাঁর অনেক সঙ্গীত ও স্তব সে সময়ে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর রচিত 'নাম মাহাত্ম্য' ও 'বৈরাগ্য' সঙ্গীতমালা বহুকাল আগেই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাল্যেই তাঁর প্রথম বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। তার বয়স তখন সবে সাত। সেসময়ে ভারতের বড় লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ও তাঁর পত্নী কুমারী ক্রাসিস মেরিয়া মিল ব্রাণ্ডের চেষ্টায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উচ্চ বর্ণের হিন্দু বালিকাদের জন্যে ভবানীপুরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথমা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন জনৈক ইংরেজ মহিলা। নাম কুমারী হার কোর্ড।

মুড়ানী এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস শুরু করেন। পড়াশুনায় তিনি সব চেয়ে সেরা ছাত্রী হয়ে ছিলেন, বিদ্যালয়ের তেতর উত্তম ছাত্রী বলে তাঁকে তদানীন্তন বড় লাট পত্নী একটি সুবর্ণ খচিত পেটিকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। কুমারী মিলম্যান তাঁকে ইংরেজি শিখে শিখে উচ্চ শিক্ষিতা করে আনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সেকালের অবর্ণনিষ্ঠা ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

একদিন বিদ্যালয়ে মুড়ানী বল্লেন—'আপনারা যীশু খৃষ্টকে আমরা ভক্তি করি। কিন্তু আপনারা পড়ানোর ভেতর নানা কথাচ্ছলে আমাদের কালী কেষ্টর কেন নিন্দা করবেন? আমরা তা সহ্য করবনা—পড়তে এসেছি পড়িয়ে যান এ সব কথা কি?'

তখন মুড়ানীর বয়স দশ বছর ও হয় নি। এই বয়সেই এই ভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সহপাঠীদের নিয়ে মিশনারী স্কুল ত্যাগ করলেন। মিস মিলম্যান মিস্ হারকোর্ট প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পরিচালিকাগণ ছাত্রীদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিলেন, এরপর আর বেশী দিন মুড়ানীর পক্ষে বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁর প্রবল ধর্মানুরাগ ও স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে তৎকালীন সমাজের বিধি নিষেধ প্রধানতঃ এই দুই কারণে তাঁর বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হোলো। কিন্তু এই বয়সের মধ্যেই তিনি বহু বেদ বেদীর স্তোত্র, চণ্ডী, গীতা মুগ্ধ বোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি হোতে বহু অংশ কণ্ঠস্থ করে

ছিলেন। এই বয়সেই সভা সমিতিতে বক্তৃতা করতেন, সঙ্গীত রচনা করে গাইতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন আর ছিলেন রূপে গুণে সরস্বতী।

ছেলে বেলা থেকেই ঠাকুর পূজায় মন দিয়ে ছিলেন। অতি শৈশব হোতেই তাঁর ভাবতন্ময়তা লক্ষ্য করে অনেকেই অবাক হ'য়ে যেতো, ঐশ্বর্য্যের কোলে বসেও তিনি খেলাধূলায় বা বেশভূষায় নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁর মধ্যে সে সময়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল চিত্তের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা আর পার্থিব ভোগবস্তুতে সম্পূর্ণ অনাসক্তি। কনক চাঁপার মত ছিল তাঁর গায়ের রঙ আর সারা অঙ্গে ভাগবতী জ্যোতি। পূজার ফুলে এই বালিকাকে মনে হোতো যেন তপশ্চর্য্যার রতা হিমালয় দুহিতা গৌরী। তাঁর মাও ছিলেন কালীর উপাসিকা ছিলেন কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তিনি কালীর প্রতি যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ দেবের প্রতি ও তেমনই তাঁর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি।

দশ বছরের মেয়ে একদিন ভবানীপুরের এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চুপ করে বসে আছেন, আর সব মেয়েরা খেলা করছে, এমন সময়ে একজন পথিক পথ চলতে চলতে তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁর বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, গলায় যজ্ঞোপবীত, দৃষ্টি উদার, সস্নেহে বললেন—'সবাই খেলছে আর তুমি যে বড় একলাটী চুপ্ চাপ বসে আছ?

মৃড়ানী উত্তর দিলেন—'ওসব খেলা আমার ভালো লাগে না'—

বলতে বলতেই তাঁর এক অভিনব ভাব হোলো। বালিকা পথিকের চরণে প্রণাম করলেন। মাথায় হাত রেখে পথিক আশীর্ব্বাদ করলেন—'তুমি ভক্তি হোক।'

এই পথিকই যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

এরপর একদা অগ্রজ অবিনাশ চন্দ্রের সঙ্গে মৃড়ানী বরাহ-নগরে মাসীমা বগলা দেবীর শ্বশুরালয়ে গেলেন। এই সুযোগ পেয়ে তিনি নিকটস্থ নিমুতে ঘোলার এক কলাবনে গিয়ে উপস্থিত হোলেন। এখানেই পরমহংসদেবের তখন কুটীর। এই কুটীরে প্রবেশ করে মৃড়ানী দেখলেন সেই পথিক ধ্যান-নিমীলিত অবস্থায় সাধনমগ্ন। তারপর সাধনার স্তর থেকে নেমে এসে ঠাকুর বললেন—'তুই এসেছিস'। সাক্ষাতে প্রণাম করে বালিকা তাঁর মনের কথা বললেন। পার্শ্ববর্তী এক গৃহস্থের বাড়ীতে বালিকার থাকবার ব্যবস্থা হোলো। পরদিন রাসপূর্ণিমার প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করে এসে ঠাকুর এই বালিকাকে দীক্ষা দিলেন।

বালিকা নিখোঁজ হওয়ায় অনেক অনুসন্ধানের পর অবিনাশচন্দ্র বোনকে পেলেন এই সাধন কুটীরে। ঠাকুর বললেন—দেখ বাবা, ও ছেলে মানুষ ওকে যেন কেউ বকোনি। হলুদে পাখী ধরে রাখা যায়!" বালিকার ইচ্ছা নয় বাড়ী ফিরে যান।' সাধক ছেলে বললেন—'যাও মা এখন, আবার দেখা হবে গঙ্গা তীরে।'

এরপর অদ্ভুত ভাবে পেলেন তাঁর সারা জীবনের সাথী রামেশ্বরকে সেই কথাই বলছি। বৃন্দাবন থেকে ভবানীপুরে মৃড়ানীদের বাড়ীতে এলেন এক ব্রজবাসী, সঙ্গে সুদর্শন এক নারায়ণ শিলা। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হোলো। একদিন ব্রজবাসী মৃড়ানীকে নিরালায় বললেন—'বড় ভাগ্যবতী তুমি। এই নারায়ণ শিলা আমার ইহকালের ও পরকালের সর্ব্বস্ব-ভাবাবাদের বড় আগ্রহ। তোমার প্রেম মজেছেন। তোমার হাতে এঁকে সঁপে দিয়ে চললুম—' ব্রজবাসীর চোখে জল এলো। তারপর মহন্তময়ী বাসী হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হোলেন, তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

ভগবদভিমুখী চিত্ত পার্থিব ভোগ সম্পদ আর কাম কামনায় কেমন করে নিমজ্জিত থাকবে? তাই বিবাহের কথা উঠলে মৃড়ানী বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলতেন—'তেমন বরকেই বিয়ে করবো যে কখনো মরে না।' তাঁর বয়স তখন প্রায় তেরো। আত্মীয় স্বজন জোর করেই বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বিয়ের আয়োজন প্রস্তুত। বর উপস্থিত। মৃড়ানী কন্যাদানীর রূপ ধারণ করলেন। মা কন্যাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—'মা তোর যদি বৈরাগ্যের ফুল ফুটেই থাকে, আমি বাধা দেবোনা'।

সম্প্রদান আর হোলোনা। মৃড়ানী মায়ের সঙ্গে বিয়ের রাত্রে পালিয়ে গেলেন।

এর পর ধ্যান ধারণায় তিনি উত্তরোত্তর আত্ম সমাহিত হোতে লাগলেন আর রামেশ্বরকে স্বামীরূপে বুকে গ্রহণ

করে তাঁরই পূজার্চনায় বিভোর হয়ে তাঁদের ঘরে লীলা খেলা সুরু করলেন।

বাল্যকাল আঠারো। গঙ্গা সাগর তীর্থ দর্শনে গিয়ে আত্মীয় পরিজনের অজ্ঞাতে একদিন মুক্তাবলী সংসার বন্ধন ছিন্ন করে একদল পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে হরিদ্বার চলে গেলেন। সেখান থেকে বদরী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে ভগবান লাভের মানসে কয়েক বৎসর কঠোর তপস্যা করলেন—অনাহারে অনিদ্রায় চললো তাঁর দুস্কর তপস্যা অত্যধিক শীতে সময়ে সময়ে সংজ্ঞাহীন হোতেন। তাঁকে সিংহবাহিনী দশভুজার মত সুন্দরী দেখে পাহাড়িয়ারা তাঁকে গৌরীমাই বলে ডাকতো। গঙ্গোত্রীর পথে গৌরীমা যে সময়ে উত্তর কাশীতে একটি অতি প্রাচীন মন্দিরে সাধন ভজনরতা ছিলেন সে সময়ে ভূতপূর্ব্ব ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর সেই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর হিমালয় ভ্রমণে বলেছেন—"এ রকম দুর্গম স্থানে (বিশ্বেশ্বর মন্দিরে) একাকিনী এক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারিণীকে দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলুম। গৌরীমা তখন মন্দির মধ্যে নিবিষ্টমনে স্তব কীর্ত্তন করছিলেন।" ব্রহ্মচর্য্যে নিয়ম কঠোর ভাবে পালন করতেন। যেন তেজস্বিতা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। উত্তরাখণ্ডে গোমুখী থেকে দক্ষিণ ভারতে কন্যা কুমারিকা আর পশ্চিমে দ্বারকা ঘাম থেকে পূর্ব্বে কামাখ্যা পীঠ পর্য্যন্ত ভারতের সকল তীর্থ স্থানেই তিনি গিয়েছেন আর আসন পেতে সাধন ভজন করেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হয়ে তিনি বৃন্দাবনে নিধুবনের অন্তর্ভূমিতে বিভোর হয়েছিলেন। তীর্থ পর্য্যটনকালে ঘাঘরার কালী গৌরাঙ্গপট ও চণ্ডী ভাগবত সদা সর্ব্বদা তাঁর বুকে বুলির মধ্যে থাকতো।

প্রায় সাত বৎসর পরে গৌরী মা কলিকাতায় ফিরে এলেন। ভক্ত বলরাম বসুর ভবনে একদিন তাঁর আবির্ভাব হয়। পরদিন প্রত্যুষে সেই অবস্থাতেই তাঁকে আপন মস্তক বস্ত্রাবৃত করে নিয়ে বলরাম বসু সপরিবারে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে।

১২৮৯ সালের কথা। গৌরীমার বয়স তখন পঁচিশ। দীক্ষাদানের দীর্ঘকাল পরে আবার গঙ্গাতীরে গুরু শিষ্যা পিতাপুত্রীর সম্মিলন হোলো। গৌরীমা যে ঠাকুরের চিহ্নিতা অন্যান্য কন্যা। পরদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে বলরাম বসুর বাড়ী থেকে গৌরীমা দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। তাঁকে নহবতখানায় শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর বললেন—'ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে এই নাও একজন সঙ্গিনী এলো।"

এই সময় থেকেই গৌরীমা নহবতখানায় থেকে মনের আনন্দে গুরু ও গুরুপত্নীর সেবা আরম্ভ করেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন গৌরীমার হাতে সন্ন্যাসের বস্ত্র দেন। এবার যখন সন্ন্যাসের স্তর থেকে প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর পর্য্যায় সুরু হোলেন গৌরীমা, ঠাকুর নিজে তাঁর নামে হোমে একটি বেলপাতা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম দিয়েছিলেন গৌরী আনন্দ। ঠাকুর তাঁকে গৌরী নামে ডাকতেন, শ্রীশ্রীমা বলতেন গৌর দাসী।

পুণ্য চরনরতা গৌরীমাকে একদিন ঠাকুর বললেন—'ন্যাখ গৌরী আমি জল চালছি, তুই কাপ চটকা।'

শিষ্যা বললেন—'এখানে কাপ কোথায় যে চটকাবো? সবই যে তাঁবার।"

ঠাকুর হেসে বললেন—'আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের মেয়েদের বড় ছুঁচু, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।' নূতন করে তাঁর মাতৃ ভাবের আঘাত লাগলো। কয়েকদিন পরে অনেক ভেবে চিন্তে ঠাকুরকে বললেন—'সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না, বৈ বৈ আমার ধাতে সয় না। আমার সাথে কতকগুলো মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি।'

ঠাকুর হাত নেড়ে বললেন—না গো না, এই টাউনে বসে কাজ করতে হবে। সাধন ভজন ঢের হয়েছে, এবার এ তপস্যালুপ্ত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগবে। ওদের বড় কষ্ট।"

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের ইতিহাসের পটভূমিকা এই দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে প্রথম প্রত্যক্ষ হোলো। এরপর গৌরীমা ঠাকুরের নির্দ্দেশে বৃন্দাবনে তপস্যা করতে চলে গেলেন, এ দিকে ঠাকুর ও মহাপ্রয়াণের উদ্যোগ আরম্ভ করলেন। নর দেহে লীলা সংবরণের কয়েক দিন আগেও ঠাকুর গৌরীমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বললেন—'এতকাল

কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলোনা। আমার ভেতরটা যেন বিল্‌তে আঁচড়াচ্ছে'—

গৌরীমা ব্রতসমাপ্তির পর যখন ঠাকুরের মহা-সমাধির কথা শুনলেন তখন 'ভূতপাতে' দেহ ত্যাগ করতে গেলেন। ঠাকুর দশরীরে দেখা দিয়ে বাধা দিলেন আর বললেন—'এখনও অনেক কাজ বাকী'। সেকালে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে গৌরীমা যে সময়ে পর্য্যটন করছিলেন তখন স্বামী বিবেকানন্দের জয়রথ চক্রের ধ্বনি চতুর্দ্দিকে শোনা যাচ্ছিল। স্বামী বিবেকানন্দও শুনছিলেন—এক বাঙালী সাধুমায়ী এ পথ দিয়ে গেছেন। তাঁরি ভক্তি-মতী তেজস্বিনী—' 'বাঙালী মাতাজীটি কে ?' এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে স্বামীজী বলে উঠলেন—'খবর শুনে আমি তখনই বুঝেছিলুম ইনি আমাদের সারদেশ্বরী ঠাকুরাণী ছাড়া আর কেহ নন।'

মাতৃ জাতির কল্যাণে গৌরীমা ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসার-দেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমতঃ বাগবাজারে গঙ্গা-তীরে, পরে কলিকাতা নগরীতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেলুড় মুখার্জী ষ্ট্রীটে ৩১ সালে। আশ্রমের উদ্দেশ্য :—(১) হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রী শিক্ষার প্রসার; (২) এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষাব্রতধারিণীদিগের একটি সঙ্ঘ গঠন; (৩) সদ্যঃপ্রসূতা দুঃস্থা বালিকা ও বিধবাকে আশ্রয় দান করা; (৪) আদর্শ জীবন-যাত্রার পথে নারী জাতিকে সহায় দান। শ্রীশ্রীগৌরীমার সাধিকা শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবী বর্ত্তমানে এই আশ্রমের পরিচালনা করছেন।

ঠাকুরের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অনুসরণ করে অক্লান্তকর্ম্মিনী সন্ন্যাসিনী প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ভিক্ষা সংগ্রহ করে কলিকাতার বুকেই নূতন আশ্রম ভবন, অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, আর আশ্রমের মাতৃসদন রচনা করে গেছেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরে শুদ্ধসত্ত্ব নারী কল্যাণ ব্রতে ইনি নিজেকে উৎসর্গ করে যে মহত্তম আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা বাংলার নারী সমাজকে চিরদিন প্রেরণার উদ্বুদ্ধ করবে। শ্রীশ্রীমা বলে গেছেন'—যে বড় হয়, সে একটিই হয় তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরী মা।' স্বামী সারদানন্দ বলেছেন—'ঠাকুরের মেয়ে শিষ্যাদের মধ্যে গৌরীমাই সন্ন্যাসিনী এবং প্রধানা' পাশ্চাত্য জগত থেকে ফিরে এসে একদিন কথাচ্ছলে স্বামী বিবেকানন্দ গৌরীমাকে বলেছিলেন—'আমি কিন্তু ওদের কাছে তোমার কথা বলে এসেছি তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাবো—আমাদের ভারতবর্ষে ও কেমন মেয়ে জন্মায়।'

১৭ই ফাল্গুন ১৩৪৪ (১লা মার্চ্চ ১৯৩৮) মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর রাত্রি আটটা পনরো মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগৌরী মা মহাসমাধিতে মগ্ন হোলেন। একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বেরিয়ে গেল। কাশীপুরের মহাশ্মশানে তাঁর মর্ত্ত্যকায়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিল।

সিংহলে কয়েক দিন

শ্রীহারতি দত্ত

যখন প্রথম Associated Country Women of the World এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যাবার নিমন্ত্রণ এলো তখন সত্যি মন আনন্দে মেতে উঠলো। অনেক দূরের পথ নয়—কিন্তু ছোটবেলা থেকে শোনা রাবণের দেশ লঙ্কায় যাবার আমন্ত্রণ এসেছে, এমন সুযোগ কখনই ছাড়া যায় না। কত রূপেই না সিংহলের বর্ণনা শুনেছি—"Pearl of the Indian Ocean", "Isle of delight", "A tear drop from the cheeks of India". আর রামায়ণে লঙ্কার তো কত বর্ণনাই আছে। আজকাল বিদেশ যাবার পক্ষে নানা বাধা, ভারতবর্ষ থেকে সিংহলের মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান মোটে ৭০ মাইল—কিন্তু তবু সিংহল আলাদা দেশ—অনেক কিছু বাধা নিষেধের গণ্ডি তাই কাটাতে হয় সেখানে যেতে হলে। এই সব বাধা নিষেধ কাটাতে—

অর্থাৎ Pass port, International health certificate, Income tax clearance certificate প্রভৃতি সংগ্রহ করতে কিছুদিন গেল।

কলিকাতা থেকে সোজা আকাশ পথে সিংহলের রাজধানী কলম্বো পৌঁছনো যায় না। তাই মাদ্রাজগামী রাতের উড়োজাহাজে যাত্রা সুরু করলাম। মাঝপুরে রাত ছুটোয় নামতে হলো—এখানে বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, কলিকাতার—চারটি উড়োজাহাজ এসে থামে—ডাকবদল ও যাত্রীবদলের পর আবার তারা যথাস্থানে ফিরে যায়। এখানে প্রায় তিন ঘণ্টা দেরী হলো কারণ বোম্বাইএর 'প্লেন' কোন কারণে দেরীতে পৌঁছলো। অপরিচিতদের মাঝে বসে একা ঝিমুতে লাগলাম—আর ফেলে আসা আপনজনদের জন্যে মন বড় কেমন করতে লাগলো। ভোর পাঁচটায় মাদ্রাজগামী প্লেনে উঠলাম।

ভোরবেলা মাদ্রাজ পৌঁছুলাম। সে দিনটা মাদ্রাজে রইলাম, সারাদিন মাদ্রাজে বন্ধুদের সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটলো; পরের দিন দুপুর ১২টায় কলম্বোগামী প্লেনে উঠলাম।

দেড় ঘণ্টা পর দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সহর ত্রিচিনাপল্লীতে এসে উড়োজাহাজ নামল—এখানে Customs Chequing হয়। যাত্রীদের সকলের মালপত্র খুলে দেখা হলো। এখানে আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। ত্রিচি থেকে কলম্বো আকাশপথে মাত্র আড়াই ঘণ্টার পথ। প্লেনে উঠে প্রথমেই আমাদের বড় বড় কাগজ দেওয়া হলো—সঙ্গে কি আছে declare করবার জন্যে। এমন কি গায়ের ও ব্যাগে রাখা গয়নারও একটা ফর্দ দাখিল করতে হলো। ক্রমে আমরা রামেশ্বরমের উপর দিয়ে পার হলাম। সেখানকার মন্দিরগুলি ওপর থেকে বড় সুন্দর দেখায়। তালাইমান্নারের উপর দিয়ে যাবার সময় আকাশ থেকে ভারতের দক্ষিণ ভাগের ত্রিকোণ রূপটি বড় সুন্দর দেখা যায়। ছোটবেলায় ভূগোলের খাতায় যখন মানচিত্র আঁকতাম তখন ভাবিনি একদিন এমন প্রত্যক্ষভাবে চোখের উপর সেই রূপটি দেখতে পাবো। এইখানে ছোট ছোট দ্বীপের সারি ভারতবর্ষ থেকে সিংহলের দিকে চলেছে। অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক জায়গায় মাটি জলে ঢাকা কিন্তু ওপর থেকে বেশ দেখা যায়। একেই রামায়ণের 'সেতু' বা Adam's Bridge বলা হয়। আরো খানিক দূর সমুদ্রের ওপর এগোতে দেখতে পেলাম দিক্‌চক্রবাল রেখায় যেন অষাঢ় বাঁধা মেঘ নেমে এসেছে। উড়োজাহাজ যত এগোতে লাগল, ততই সিংহল দ্বীপের রূপটি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগলো। নীল সমুদ্রের বুকে মস্ত যেন একখানি সবুজ পাথর কে ফেলে রেখেছে। কাছে আসতে চোখ জুড়িয়ে গেলো, সিংহলের সবুজ রূপ দেখে। অজস্র নারকেল গাছের সার, একেবারে সমুদ্রের ধার পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। তালাই মান্নার থেকে সিংহলের ভারতের নিকটবর্ত্তী বন্দর তিনকোলির পথে যাত্রী ভরা জাহাজ চলেছে; ওপর থেকে ঠিক—ছোট ছেলেদের খেলবার জাহাজের মত দেখাচ্ছে। ক্রমে সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে এসে আমাদের উড়োজাহাজ নামলো। ওখানকার Airport-এর নাম 'রাতমালানা' (রত্নমালা)। সিংহলের বন্ধুরা এসে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। রাতমালানা থেকে কলম্বো সহর প্রায় বারো মাইল পথ। পরের দিন—সিংহলের পুরাতন রাজধানী Kandyতে যাবার কথা। সেখানে এশিয়ার নানা দেশের প্রতিনিধিরা আসবেন, সপ্তাহব্যাপী Seminar বা আলোচনা সভায় যোগ দিতে।

পরের দিন সকালবেলা কাটলো কলম্বোর Museum বা বাদুঘর দেখে। আমার সঙ্গে দুটি শ্যাম দেশের (Thailand) প্রতিনিধি মেয়ে গিয়েছিল। একটি বেশ হাসিখুশী; কথা বলে একটু গানের সুরে, অল্প ইংরাজী ভাষা না জানার কথা বলে না, কেবলি হাসে। কলম্বোর Museum এ সিংহলের পুরাতন শিল্প বস্তু ছাড়া, কিছু সুন্দর আবার কিছু ভীষণাকৃতি মুখোস আছে। মুখোসগুলি দেখে রাবণ রাজার সাঙ্গপাঙ্গদেরই মনে পড়ে যায়। সিংহলীরা কিন্তু রাবণ রাজার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করেন না। রামায়ণে সিংহলের আদিম অধিবাসীদের কথা আছে। বাদুঘরে তাদের জীবনযাত্রার বহু চিত্র—মাটির পুতুলের সাহায্যে দেখানো রয়েছে। বর্ত্তমান সিংহলীরা বলেন তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ বহু যুগ আগে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন। সেই বিজয়সিংহের কথা—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়"। সিংহলীদের নামও সবই প্রায় সংস্কৃত থেকে নেওয়া। যথা 'গুণভিলক' 'নয়র মায়ক', 'বিজয় রাথব', 'ধনপায়ক' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে সিংহলী ভাষার গান চারিদিকে শোনা যায়। সিংহলে অবশ্য তামিল ভাষাভাষী লোক প্রচুর আছেন এবং সেজন্য ভাষা বিরোধের কথা সকলেই জানেন। বাংলা দেশ থেকে গিয়েছি বলে বিশেষ করে সিংহলীরা এত আপন করে নিতেন। তামিলদের পূর্বপুরুষরা তো ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছেন তাই তাঁরা তো ঘর করেছেনই। কিন্তু বাঙালীর একটি বিশেষ স্থান আছে সিংহলীদের কাছে।

দুপুরবেলা কলম্বোতে যাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলাম সেডি কুমার স্বামী, তাঁর সঙ্গে, তাঁর গাড়িতে আমরা ক্যাণ্ডির পথে রওনা হলাম। সহরের সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমে গাড়ি পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলো। দুপাশে নারকেলের চাষ (plantation)। হাজার, হাজার নারকেল গাছ, তাতে লাল রঙের নারকেল হয়। গাছগুলি আমাদের দেশের নারকেল গাছের তুলনায় আকারে অনেক ছোট। সিংহলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্দর নায়কের মস্তবড় নারকেলের plantation আমরা পার হলাম। এরপর সুরু হলো রবারের চাষ। রবার গাছের ছাল বড় বড় টুকরোয় কেটে নিয়ে গেছে—বেশ দেখা যায়। সিংহলের অধিবাসীরা আমাদের মত ভাত খায়। ফলে ওদেশে ধান উৎপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অথচ চাল আমদানির জন্য ওদের নির্ভর করতে হয় ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের উপর। সেইজন্য সিংহলের ধানচাষের চেষ্টা খুব হচ্ছে। Kandy-র পথে ধানের জমি অনেক চোখে পড়ল। চাষীরা আমাদের দেশের মতই, প্রায় কৌপীন পরে মাঠে চাষ করে কিন্তু চাষের কাজে বলদের পরিবর্তে মহিষ ব্যবহার করে। এই কৌপীন পরা চাষীদের বাড়ি গিয়ে দেখেছি, আশ্চর্য রকম পরিষ্কার তাদের ঘর দুয়ার। তাদের ছেলেমেয়েরা স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়ে। চাষীর ঘরে টেবিল ঢাকা ও ফুলদানিতে ফুল সাজানো দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

ক্যাণ্ডির সমুদ্র বেলা থেকে উচ্চতা মোটে ২০০০ ফিট কিন্তু যাবার পথটি বড় সুন্দর। পাহাড় ঘিরে ঘিরে পথ উপরে উঠেছে; একদিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের মাঝে মাঝে উপত্যকাগুলির অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। আর একটু উপরে উঠবার পর কফি ও চা বাগান দেখা গেলো। সিংহলের সব সম্পদ ও আয় হলো জমি থেকে। তাই মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ সিংহলে একটুখানি জমিও নষ্ট করা হয় না। কিছু না কিছুর চাষ হচ্ছে। সিংহলের পশ্চিম দিক—পুরই অনুর্বর।

ক্যাণ্ডি পৌঁছবার ১০ মাইল আগে—তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় নগর প্যারিডানিয়া (Perydenia) পৌঁছলাম। প্যারিডেনিয়াতে সিংহলের residential বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সিংহলে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত সবই অবৈতনিক। কেবল ছাত্রছাত্রীদের থাকা খাওয়ার খরচ লাগে। স্বাধীনতা পাবার পর কয়েক বছরের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতিও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়। ওখানে বিরাট Gymnasium দেখবার মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি গৃহ ও অট্টালিকা সুন্দর শিল্পসম্মতভাবে তৈরী। সিংহলের সবচেয়ে বড় নদী মহাবালি গঙ্গা পাশ দিয়ে প্রবাহিত। এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে, তারা সত্যি ভাগ্যবান। এইখানেই প্রাচ্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ Botanical Garden আছে—যা পরে আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল। 'Bridge on the River Kwai' ছবিটিতে এই বাগানের খানিকটা অংশ দেখানো হয়েছে। প্যারিডেনিয়া বাগানের এক অংশ থেকে মহাবালি গঙ্গার হাতিদের স্নান দেখা যায়। হাতিরা শুঁড়ে করে নদীর জল তুলে ফোয়ারার মত নিজেদের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। দৃশ্যটি বড় সুন্দর।

Kandy সিংহলের শেষ স্বাধীন রাজার রাজধানী ছিল। এখানেই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহল বৃটিশ শাসন মেনে নেয় আবার এখানেই ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ফিরে পাবার চুক্তিপত্র সই হয়।

বৃটিশ সরকারের আমলেই কলম্বো সিংহলের রাজধানী হয়েছে।

Kandy সহরটি খুব বড় নয়, প্রথমেই চোখে পড়ে সহরের মাঝখানে সুন্দর একটি হ্রদ—তার পাশেই বুদ্ধদেবের মন্দির (Tooth Temple), যেখানে তাঁর দাঁত রক্ষিত আছে। এই পবিত্র, অতি মূল্যবান, ভগবান তথাগতের দেহের অংশ (relic), বহু শতাব্দী আগে সিংহলে এসেছিল ও বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরে গেছে।

তখনকার সবচেয়ে ভাল ও প্রসিদ্ধ Queen's Hotel এ আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। হোটেলের ঘরের জানালা থেকে রাতের বেলা হ্রদের জলের উপর আলোর প্রতিচ্ছায়া বড় সুন্দর দেখাতো। হ্রদের পাশ দিয়ে পাহাড়ের উপর পথ চলে গেছে, সেখান থেকে ক্যাণ্ডি সহরটি সবুজ বনানীর 'ফ্রেমে' বাঁধানো একটি ছবির মত দেখায়। ক্যাণ্ডি সহরের অল্প দূরেই সরকার সংরক্ষিত জঙ্গল (Reserved forest) সুরু হয়েছে। পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে ডানবুলা উপত্যকা ও সিগ্রিয়া পাহাড় দেখা যায়। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম আছে। সেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।

ক্যাণ্ডি সহরের চারপাশে বড় বড় চা বাগান আছে। একটি চা বাগান ও সেখানে চা তৈরী হয় দেখতে গিয়েছিলাম। চা পাতার বাগান থেকে বাজারে যাবার সময় পর্যন্ত নানা অবস্থার ক্রমবিকাশ দেখলাম। কিন্তু নিজের দেশের চায়ের factory না দেখার ফলে কোন প্রভেদ আছে কিনা বুঝলাম না।

ক্যাণ্ডি সহরটি পেতলের উপর শিল্পকার্যের জন্য বিখ্যাত। ক্যাণ্ডির মেয়েদের কাপড় পরার ধরণটিও খুব মৌলিক ও সুন্দর। এটি সিংহলের মেয়েদের নিজস্ব কাপড় পরার ধারা বলে বলা যেতে পারে।

এখান থেকে একদিন আমরা মেয়েদের কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান (Kuodaswala girl's farm) দেখতে গেলাম। এখানে মেয়েদের গোপালন, মৌমাছি সংরক্ষণ, হাঁস মুরগী দেখা, চাষের নানা ধরণের কাজ, ঘি, মাখন তৈরী করা ও ঘর সংসার সুপরিচালিত করার ধারা (domestic science) প্রভৃতি শেখানো হয়। এখানে এত পরিপাটি ভাবে মেয়েরা গোয়ালঘরে, মাঠে, ফলবাগানে সব্জী ক্ষেতে, রান্নাঘরে—সর্বত্রই কাজ করছে দেখে বেশ ভালো লাগলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও এখানকার সরকার মেয়েদের এই শিক্ষা সমাপ্তির পর তাদের কাজে লাগানোর সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি।

একদিন আমরা "জনুসহপিটিয়া" গ্রামে একটি খুব সুন্দর পল্লীর মহিলা সমিতি দেখতে গেলাম। সেখানে মহিলা সমিতির কাজে, অল্পবয়সী মেয়েদের উৎসাহ দেখে বড় আনন্দ হলো। মেয়েরা নানারকম হাতের কাজ ও নানাধরণের রান্না শিখছে। একটি শিশুদের Cresche রয়েছে—সেখানে মায়েদের শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমিতির মেয়েরা নিজেদের যত্নে সুন্দর সব্জী বাগান করেছে। UNESCO gift coupon থেকে মহিলা সমিতি যে সাহায্য পেয়েছেন তারই সাহায্যে সমিতির জন্য একটি ঘর তৈরী হয়েছে ও রান্নার বিবিধ উপকরণ এবং কয়েকটি সেলাই-এর কল কেনা হয়েছে। সমিতির সম্পাদিকার বয়স ২০/২২ এর মধ্যে। শিক্ষয়িত্রী ঐ গ্রামেরই মেয়ে—তিনি মহিলা সমিতির পরিচালিত শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছেন। শিক্ষয়িত্রী ও সভ্যাদের—বেশির ভাগই ১৬ থেকে ৩০ এর মধ্যে বয়স। তারা সুন্দরভাবে পল্লীনৃত্য করে আমাদের দেখালো ও নিজেদের হাতের তৈরী মিষ্টি খাওয়ালো।

যে দেশেই যাওয়া যাক—পল্লীগ্রামের মানুষের আন্তরিকতা সর্বত্রই সমান। মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামের সমিতিতে কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম—পুণার কাছে। সেখানে গিয়েও মনে হলো যে বাংলার গ্রামের মেয়ে, মহারাষ্ট্রের গ্রামের মেয়ে ও সিংহলের সুদূর নিভৃত পল্লীর মেয়ে, সবাই তারা সমান; আন্তরিকতায়, সরলতায় ও আতিথেয়তায় তাদের আর কোথাও তুলনা মেলে না। সহরের কৃত্রিম জীবনের স্পর্শ নেই বলেই তাদের ব্যবহার এত সহজ ও আন্তরিকতা পূর্ণ।

আগামীবারে সিংহলের অন্যান্য দিকের কথা বলবার ইচ্ছে রইলো।

বেকার সমস্যা ও আমরা

শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য এম, এ.

আজকাল পথে ঘাটে সর্ব্বদাই একটা কথা শোনা যায় কাগজ বা পত্রিকা খুলুন, বেড়িও শুনুন, সভা সমিতিতে যান ট্রামে বাসে উঠুন এমন কি বিকালে বেড়াতে যান…সব জায়গাতেই ঐ একটী কথা আর যে কথাই হকনা কেন, ঘুরে ফিরে ঐ কথাতেই এসে পৌঁছবে সব আলোচনা—সে হচ্ছে বেকার সমস্যা। ঘরে বাইরে, ছেলে মেয়ে সবারই সমস্যা চাকরী আর সেই সমস্যা নানাভাবে নানাদিকে নাড়া দিচ্ছে। বেকার সমস্যা সম্বন্ধে নূতন কিছু বলার নেই, আমি সেই সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। এ সমস্যা বৃহত্তর জগতের, মহিলা মহলে এই সমস্যা মাঝে মাঝে উঁকি দিলেও সব স্থান জুড়ে বসেনি এখনও। অতএব মহিলা মহলে এই আলোচনার সার্থকতা নেই। তবু কেন বেকার সমস্যা নিয়ে শুরু করছি? প্রশ্ন করতে পারেন। উত্তরে বলব, আমার বেকার সমস্যা একটু অন্য ধরণের। যদের যার হাতে প্রচুর সময় কিন্তু কোন কাজ নেই, তারা কি বেকার নয়? কিংবা যার উপর সংসারের দায়িত্ব নেই কিন্তু যার অর্থ প্রয়োজন কিন্তু অর্থকরী বিদ্যা কিছু নেই, সে কি করবে? আসুন না এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি।

বেকার সমস্যার মত এ সমস্যা এত ব্যাপক না হলেও সমস্যা ত বটে এবং সে সমস্যা মেটাতেও হবে।

এমন বহু মহিলা আছেন যারা শ্বশুর বাড়ী ভাসুর দেওরের সংসারে থাকেন। কেউ বা দুটী একটী ছেলে মেয়ে নিয়ে ভাইএর সংসারে আছেন, সংসারে এদের সংখ্যা কম নয়। যারা খেতে পরতে দিচ্ছেন তারা যে খুব সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছেন তা নয়। তাঁদের সেই অনুগ্রহমিশ্রিত দান কতখানি মর্ম্মান্তিক তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে জানে, উঠতে বসতে যা বা খোঁটার মুখঝামটা বাড়ীর ছোট বাচ্চাদের অবহেলা…শুধু আশ্রিতার জীবন বিষময় করে যে এমন নহে তার ছেলেমেয়েদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাছাড়া অসুখ বিসুখ ডাক্তার সামান্য সব সব দিকই তো আছে।

যদের যেখানে তারা রইল সেখানে অবহেলা নেই। তাই যা যেওর সন্তুষ্ট চিত্তেই গ্রহণ করেছে। বাড়ীতে বিধবা পিসীমা বা জেঠাইমার কর্তৃত্ব ও বিরল নয়। কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে। সামান্য দুচার পয়সার জন্য সব সময়ে হাত পাতা যায় না। অথবা দেওর বা ভাইপোর আয় অল্প, পোষ্য অনেক। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তবে বাড়ীর লোকের মুখে অন্ন যোগায়। এ সব ক্ষেত্রে যদি তাদের হাতে অল্প কিছুও দেওয়া যায় তা হলে কি সেই দেওয়ার আনন্দে আপনার মন ভরে উঠেনা। ভাইএর আপনাকে মস্ত অবলম্বন বলে মনে হবে। বলবেন, দুচার টাকায় সংসারের এমন কি স্বাচ্ছন্দ্য হবে? হবে, আর সেইটুকুর বিনিময়ে সংসারে শ্রী ও আপনার মনে শান্তি দেখা দেবে।

এবার প্রশ্ন হবে…কী সে কাজ আর পাবেনই বা কোথায় যার যৌতুকে আপনি দুচার টাকা পাবেন। চারদিকে যখন এত বি, এ, এম, এ, চাকুরীর জন্য ঘুরছে সেখানে আপনার চতুর্থ শ্রেণী বা পঞ্চম শ্রেণীর বিদ্যা নিয়ে কি করবেন? সেলাই গানই বা কতটুকু জানেন যে স্কুলে বা প্রাইভেট কাজ পাবেন। সেই কথাই বলছি।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত শুনে আপনারা হয়তো বলবেন—এই ধরণের কাজ যাতে দুচার টাকা পাওয়া যায় সে কাজ ভদ্র লোকের নয়। আর এত সামান্য টাকার জন্য করতে হবে কেন? শিশি,বোতল,কাগজ পুরনো জরি বেচেই পান। তা পান কিন্তু সেগুলি বেচে কত কতি হয় জানেন কি? শুধু মিষ্ক এ সব শিশি এজেন্সীরাই বেচবেন না। যত ভেষাল ওষুধ ও মিষ্ক বাজারে বেড়িয়েছে তাকে অনেকখানি সাহায্য করে এই লেবেল লাগানো শিশিগুলি। এছাড়া টয়লেটের শিশি কৌটাতো আছেই। আরও বলব এই আয় অস্থায়ী এরপর বলবেন তাহলে করনীয় কি?

করনীয় যা বলার তাতে আগে নজর রাখতে হবে

আপনার পরিবেশের উপর, কি কাজ করলে আপনার লাভ অথচ পারিবারিক শান্তি ক্ষুণ্ণ না হয়। তারপর বেছে নেবেন কোন ধরনের কাজে আপনার দক্ষতা বেশী। আপনার যদি শিক্ষণ কাজে উৎসাহ থাকে আর ধৈর্য্য থাকে আপনি নিচু ক্লাসের ছেলে মেয়ে পড়াতে পারেন। প্রত্যহ ঘণ্টা দুই খাটলে মাসে টাকা দশ পনের হবেই। যদি সেলাই জানেন। কখন মেয়েকে নিয়ে দুপুরে বসতে পারেন মাথা পিছু ১৲ টাকা আট আনা টাকা নিয়ে। তৈরী জামা কাপড়, উলের জিনিষ, ছেলের ব্যাগ বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারলে আপনারও লাভ মেয়েগুলিরও লাভ। বড়ি আচার আছে। ভালো খাবার তৈরী করে কাছাকাছি স্কুলে টিফিন সরবরাহ করতে পারেন। এ কাজ আপনি একা পারবেন না। আপনার মত কয়েকজনকে নিয়ে ৩৪ কজন এ কাজ। ছোট ছেলে মেয়ের জন্য খেলনা পুতুল করে দিতে পারেন।

এসব কাজ ছাড়া আরও বহু কাজ আছে যা আপনি একা পারেন কিন্তু পরিশ্রম বেশী নয়। সে কাজগুলি বলার আগে একটু ভূমিকার দরকার। কারণ প্রতি সংসারেই একটা বিশেষ মতবাদ আছে, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেগুলো অবহেলা করা উচিত নয়। বর্ত্তমান আর্থিক অনিশ্চয়তা মানুষের রক্ষণশীলতা অনেকটা শিথিল করে দিয়েছে। প্রত্যেকেই কিছুটা উদার মত পোষণ করেন। কারণ সকলেই বুঝেছেন নিখুঁত মর্য্যাদার জন্য জীবনকে দুর্বিসহ করার দরকার নেই, তাই কর্ম্মজগতে মেয়েদের আবির্ভাবে সমাজ বিশেষ বিচলিত হয়নি। কিন্তু সকলে সমান নন, সবার মতও এক নয়। তাই আমি যে কাজের কথা বলছি তা হয়তো সবার কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হবে না। কিন্তু আমার মনে হয় এগুলি বিশেষ নিন্দনীয় কাজ নয়। যেমন ধরুন আজকাল ঝি চাকর হাজা সবার সাধ্যে কুলোয় না কিন্তু এমন যদি হয় যে সপ্তাহে একদিন বা কয়েক ঘণ্টা একটী লোকের সাহায্য পেলেন, তাহলে আপনারও সুবিধে যে করবে তারও। একেবারে বসন পাল্টা বা চাল্লা বলছি না। বাচ্চার অসুখ··· মা সারাদিন গৃহকর্ম্ম করলেন, বাচ্চার পরিচর্য্যাও করলেন কিন্তু নিজের খাওয়া বা স্নান সেগুলি হলো না। কারণ বাচ্চাকে একটু দেখবার কেউ না থাকলে কি করে যান। এমন অবস্থায় যদি অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে আপনি একটী লোকের সাহায্য ঘণ্টা দুই পেলেন তাহলে কি দুপক্ষেরই সুবিধা হয় না কি?

আর একটি কাজ আছে—টাইপের কাজ। শুনে অনেকে বিরক্ত হবেন—বলবেন বাড়ীর বিধবা বৌ যাবে অফিসে কাজ করতে! না—এর জন্য অফিসে যেতে হবে না। এ কাজ ঘরে বসে সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের দ্বারাই করা যায়। চিঠিপত্র, চাকরীর আপ্লিকেশন, দোকানের খাবারের মেনু, প্রশ্নপত্র এ সব তো বাড়ীতে বসে করতে পারেন। এর জন্য বেশী খরচ করতে হবেনা। মাসে দুটী বা তিনটী টাকা আর মাস দুই তিন সময় চাই এর জন্য। বহু টাইপ শেখার স্কুল আছে। টাইপটা শিখে নিন। তারপর পাড়ার মেয়েদের যত আপ্লিকেশন, স্কুলের চিঠিপত্র সবই টাইপ করে দিতে পারেন। এমন বহু স্কুল আছে যেখানে আই কম, বেয়ে কম, স্কুলে টাইপ রাইটার নেই। সেখানে হেডমিষ্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করে নিন। তাদের প্রশ্নপত্র টাইপ করে দিতে পারেন। চিঠি পত্র তো আছেই।

আর একটা কাজ আছে যা করতে বেশী সময় বা পরিশ্রম নেই। ঠোঙ্গা তৈরী করা, ঘুড়ি তৈরী করা পাখার সুতা দিয়ে কারুকাজ করা, কাঁথা করা, টেবিলক্লথ পাপোষ এসবগুলোরী, উলের কাজ। অল্প পারিশ্রমিক নিয়ে করলে এ কাজ বহু পাওয়া যায়। এর দ্বারা আপনার অবসর সময় ভাল কাটবে···অর্থ সমস্যা মিটবে, যাদের সংসারে আছেন তাদেরও সুবিধা হবে।

———

পণপ্রথা

শ্রীঅলকা উকীল

জল জিনিষটা নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ এর কোন দাম নেই। কিন্তু সত্যি যদি এটার একান্ত অভাব হয় তাহলে যে কোন ধনবান লোক তাঁর যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে এটা যোগাড় করতে পেছপা হবেন না। মেয়েদের অবস্থা অনেকটা সে রকম। সমাজে নারী বিরল হলে তার কতটা মূল্য হবে বলা মুস্কিল, কারণ আজও সে জলের মত নিত্য প্রয়োজনীয় হলেও, সুলভ। ঐ কারণেই বিয়ের বাজারে মেয়েদের আজও পণপ্রথার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে বোধ হয় আটকায় না।

পণপ্রথা নিয়ে আলোচনা করলেই অনেকেই হয়তো বলবেন "পণপ্রথা কেউই আমরা সমর্থন করি না, এ বিষয় নিয়ে ভাববার বা আলোচনা করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই।" ঠিক কথা, কিন্তু কথায় এবং কাজে যদি সব ক্ষেত্রে একটা মিল পাওয়া যেতো। আমাদের দামাজিক জীবনে তাহলে হয়তো এ বিষয় নিয়ে গবেষণা বা চিন্তা করার কোন আবশ্যকটই হোত না।

পণপ্রথা নেই বা বলি কি করে? অনেক সময়ে দেখি মেয়ের বাপকে হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে নগদ টাকা নেহাৎ দেওয়া হ'ল, কিন্তু গহনা, কাপড়, বাড়ী সাজাবার জন্য ফার্নিচার, মোটর, রেডিও, এমন কি "আপনারই ত জামাই" বিলেতে পড়াশোনার খরচ সবই নেওয়া হয়। ছেলেকে বিয়ে দেবার সময় পাত্রপক্ষের এই নির্লজ্জ আদায় করার মনোবৃত্তিটা দেখলেই, সমাজে মেয়েদের আজো কি চোখে দেখা হয়, তার কিছুটা অনুমান করা যায় বৈকি।

যে দেশে নারীকে পুরুষের ভোগের জিনিষ মনে করে সহমরণের বিধান দেওয়া হত, সেখানে নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে বিবাহের হাটে বেচা কেনার মধ্যে কোন অন্যায় হচ্ছে বলে মনে করার বালাই থাকতে পারে না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে হোসিয়ারপুরে ডেপুটিকমিশনার (Coldstream) কোল্ডস্ট্রীম তাঁর এক বিবৃতিতে বলেছেন যে পণপ্রথা যোগাড় করার ভয়ে শত শত মেয়েদের জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করা হত। রাজপুতানার কোন কোন পরিবারে পর পর মেয়ে জন্মালে শেষের মেয়েটীর মুখে একটু গুড় এবং বুকের উপর একটু তুলো দিয়ে মাটীর কলসীতে পুরে হয় ভাসিয়ে দেওয়া, নয়ত পুতে ফেলা হত। বাংলা দেশেও বাঙ্গালী কৌলিন্যের ঠোটে বিয়ের সময় পণপ্রথা হিসেবে নগদ টাকা, গহনা, বরাভরণ, যৌতুকপত্র এমন কি বরযাত্রীদের শুদ্ধ বরযাত্রা মর্য্যাদা দিতে দিতে কন্যাপক্ষের জিভ বেরিয়ে যেতো। বজ্জাতে একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না। তার উপর মেয়ে যদি একটু কালো রং ঘেঁষা হয়, তাহলেত সোনায় সোহাগা, মেয়ের বাপকে আর নৈতিক প্রাণ রাখতে হবে না। ঐকারণে ঘরে ঘরে যে কত স্নেহলতা কতভাবে প্রাণ দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে কেউ হাওড়া ব্রীজের উপর থেকে, কেউবা ছাদের থেকে লাফিয়ে পড়ে,-কে আর তার হিসাব রাখছে? বাংলা দেশেত চলতি প্রবাদ "মেয়ের বাপ মাটী, ছেলের বাপ খুন্তি" সোজা কথায় খোঁড় আর মাটী তোল।

এই কয়েক বছর আগেকার কায়স্থ পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে দেখলুম ভাইস মিত্র মহাশয় লিখেছেন যে আমাদের সমাজে আজো মা বাপেরা মনে করেন যে মেয়ে জন্মানো আগের জন্মের পাপের ফল। ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মেয়ের বিয়েতে পণ যোগাড় করতে কত পরিবারকে ঐভাবে সর্ব্বস্বান্ত হতে হত। ঠিকমত পণপ্রথা যোগাড় করতে না পারার জন্যই কচি মেয়েকে ঘাটের মড়ার হাতে তুলে দিতে যেমন বাধতো না, সত্তীনের ঘরে মেয়েকে পাঠাতেও মা বাপের বিবেকে খোঁচা লাগতো না।

বহুদিন ধরে জগদ্দল পাথরের মত পণপ্রথা সমাজের বুকের উপর চেপে বসে মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি

খেলে আসছে সহজ স্বাভাবিকভাবে। তার জের আজও আমরা নানারকম ভাবে টের পাই বলুন কিছুই মিথ্যে বলা হবেনা। পণপ্রথা চালু নেই সমাজে শুনতে পাই, অথচ অভাবনিলা মেয়ের মত বিয়ের কথা উঠলেই বরপক্ষের হুহুঙ্কার মুখোস পরা মোলায়েম কথার মধ্যে, কেমন তার বেশ পাওয়া যায়, সেটা আর কেউ না বুঝুক, কন্যাপক্ষ বেশ বোঝেন। ছাপোষা পরিবারে যার পাঁচটী মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে তিনি বোঝেন আরো হাড়ে হাড়ে।

পাত্রপক্ষ যদি নিজের ছুটী মেয়ের বিয়ে দিতে নাজেহাল হয়ে থাকেন তাহলেত আর কথাই নেই। তাঁর মাথার তখন বেলুন্তে থাকে কি ভাবে মুখে আগুন পুরিয়ে নিজে পারেন। তাঁর যুক্তি মেয়ের বিয়ের সময় বর খাটি করেছি। ছেলের সময় বর শুধবো না কেন? কিছুদিন আগে যেমন পাল করা জামাই যোগাড় করতে বাড়ী ঘরদোর বাবা দিতে হত কন্যাপক্ষকে, আজও বিয়ের বাজারে বিলেত ফেরৎ ডিগ্রিওয়ালা জামাই করতে চাইলে প্রায় সেই রকমই হিমসিম্ খেতে হয়।

ঐ গত শ্রাবণ মাসের কথা, এতটুকুও বং ফলিয়ে বলছি না। শুধনাম পাত্রপক্ষ কিছুই চাইনা চাইনা বলে—আসলপের গয়ী কাবিচার, রেডিও, ঘিনার সেট্, সোনার সেট্, জড়োয়া সেট্, এত কিরিস্তি দিয়েছিলেন, যে কন্যাপক্ষ না চাওয়ার বহরে ভয় পেয়ে নিজেরাই নগদ দশ হাজার টাকা পণ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন, পাত্র হাত ছাড়া করা যায় না। কারণ পাত্র যে বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার, চাকার টাকা মাইনের সরকারী চাকুরে।

অবশ্য অনেক সময়ে মেয়ে একেবারে চলে যাচ্ছে মনে করে, তার বিয়ের সময় বা বাপেরা মেয়েকে একটা নিজস্ব স্ত্রীধন হিসেবে কিছু দেওয়া দরকার মনে করে আপনা হতেই বিয়ের সময় নিজেদের সাধ্যের বাইরেও যৌতুকাদি দিতে দেখা যায়। বিপদে আপদে মেয়ে যাতে অসহায় বোধ না করে ঐ মনোভাব নিয়েই তাঁরা মেয়েকে দিতে চাইতেন।

কিন্তু আজকাল নতুন পরিস্থিতিতে পাত্রপক্ষের পণপ্রথা আদায়ের চেষ্টাত দূরের কথা, কন্যাপক্ষেরও আহা আহা মেয়ের সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকে যাবে বিয়ের পর একথা ভেবে বিবাহের কালে সাধ্যের বাইরে গিয়ে মেয়েকে স্ত্রীধন হিসেবে কিছু দিতে যাওয়ারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ আজকাল সমাজে ছেলে মেয়ে উভয়েই আইনতঃ বা বাপের সম্পত্তির সমান অধিকারী।

• উহাল করে ছেলেকে সব সম্পত্তি দিয়ে যাওয়া যেমন অনুচিত, পণপ্রথা আদায়ের চেষ্টাও লজ্জাকর, আর বিয়ের সময় মেয়েকে পণ হিসাবে যৌতুকাদি দিতে যাওয়াও তেমনি হাস্যকর নয় কি?

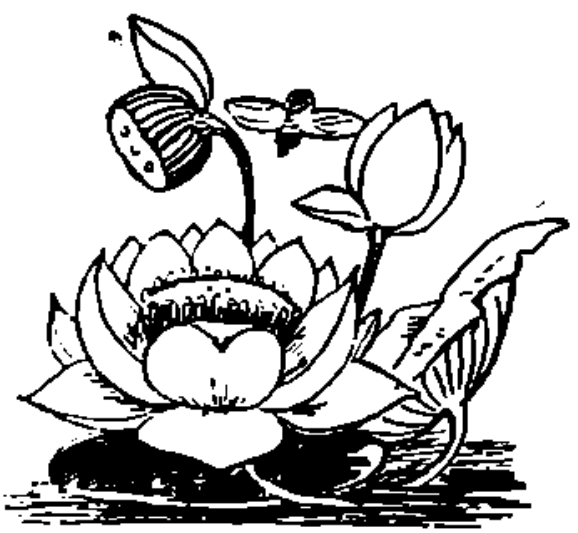

বাজী

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়

ডাক্তারবাবু! আজ আবার সেই পাগলটা এসেছে। প্রবীণ ডাক্তার বীরেশ রায় চমকে ওঠেন, এখনও আছে নাকি?

চৌকিদার বলে, আজ্ঞে না, আমরা দৌড়ে ধরতে যেতেই একেবারে গেটের বাইরে পালিয়ে গেল। আচ্ছা, এখন যাও, আর শোন, আবার যদি আসে তাহলে যার মোর কোরনা, পার যদি আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।

টেলিফোনের আওয়াজ পেয়ে সুনীলা ভাবে বাবা বুঝি বেরিয়ে গেছেন তাই ছোটে যায় নিজে টেলিফোন ধরতে, ঘরে ঢুকে বাবাকে দেখে একটু অবাক হয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে বলে, বাবা তোমায় ডাকছেন। মেয়ের হাতে রক্ষিত ফিরে পান ডাক্তার, সুনীলার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কথা বলে আবার এসে বসেন চেয়ারে।

বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সুনীলা বলে, আজ কি তোমার শরীর ভাল নেই বাবা?

না, মা। হাসপাতালে বড় কাজের চাপ পড়েছে তাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কি জানি কেন পোষন করের পাগলের কথা মেয়ের কাছে। মনটা কিন্তু ভারী হয়েই থাকে।

এই ঘটনার প্রায় মাসখানেক পরে, ডাক্তার পরিবারে সবাই যখন খেতে বসেছে বাইরে একটা কিসের গোলমালের আওয়াজ পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেন ডাক্তার এবং তাড়াতাড়ি বাংলোর বারান্দায় এসে দেখেন ছোট খাট একটা ভিড় জমে গেছে।

ওঁকে দেখে সেই চৌকিদার বলে, সেই পাগলকে আজ ধরে এনেছি। আজ প্রায় সাত দিন ধরে ঐ মড়াকাটা ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করছে, লোক জনের সাড়া পেলেই একেবারে দৌড়।

এখানেও সে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না জোরে। ডাক্তারকে দেখে, কাতর স্বরে পাগল বলে ওঠে, আমায় ছেড়ে দিতে বলো তুমি!

ডাক্তার রায় সস্নেহে বলেন, তা নাহয় বলব কিন্তু তুমি ওখানে কি করো? কি দরকার ওখানে তোমার? হা হা করে হেসে ওঠে পাগল। হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে তীর বেগে দৌড়ে চলে যায় মুখে বলে, খুঁজতে এসেছি খুঁজতে।

ডাক্তার গৃহিনী স্বামীর দেরী হচ্ছে দেখে নিঃশব্দে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বিরক্ত হয়ে বলেন, কোথাকার পাগল, বাঁচাতে দিতে পারেনা বাড়ীর লোকেরা।

অনন্যগতীর স্বরে স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করেন ডাক্তার, না, না, পারে না। মায়ের একমাত্র সন্তানকে মা কি পারে কাছছাড়া করতে, চোখের সামনেই রাখতে চায় সে সন্তান যেমনিই হোক। সবাই কেমন হতবাক্ হয়ে যায়। রাত্রের খাওয়ার আনন্দটুকু সব নষ্ট হয়ে যায়। এই সময়টি এবাড়ীর সকলের কাছে বড় লোভনীয়, কারণ সব প্রিয়জন এক হয়ে নানা গল্প গুজবের মধ্যে সারাদিনের ক্লান্তি বিনোদন করে আহারের সঙ্গে।

ডাক্তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, জান! কত বড়লোকের ছেলে ও! ঘর শুদ্ধ সবাই চেয়ে থাকে ডাক্তারের মুখের দিকে। ডাক্তার বলে যান বহু দিন আগের একটি রাতের ঘটনা।

তোমরা তখন বেনারসে বেড়াতে গেছ। আমি একা আছি। রাত তখন একটা হবে, দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠবার আগেই বেয়ারা দরজা খুলে দিতেই ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকল একটি মেয়ে কোলে ছাত্র, তাকে দেখে অবাক হয়ে যাই, ব্যাপার কি? এত রাত্রে? ছেলেটি আমার

হাত দুটো ধরে বসে, এমনি হোষ্টেলে চলুন ভয়ানক বিপদ হয়ে গেছে। যেমন ছিলাম সেই অবস্থায় একরকম দৌড়ে গেলাম ছেলেটির সঙ্গে। ওদের ঘরে গিয়ে দেখি, কলেজের সেরা ছেলে সুবোধ মাটীতে শুয়ে তাকে ঘিরে বসে আছে কয়েকটি তারই সহপাঠী। আর প্রভাত বসে একটি ছেলে কেমন যেন হতচকিত হয়ে বসে আছে একটু দূরে, তাকে একজন ধরে তার পাশেই বসে আছে। সুবোধকে পরীক্ষা করে দেখলাম কিছুক্ষণ আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে, যে ছেলেটি আমায় ডাকতে এসেছিল সেও এল সঙ্গে সঙ্গে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি বলো? অসুখ করেছিল বলে তো জানাশুনি তো আমায়। উত্তরে সে যা বলে শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শোন তোমরা।

সে বলে—সুবোধ ছাত্রটী সাহসী ছিল, তার বলে কিনিষ ওর মনেও ছিলনা কিছু! আমরা কত চেষ্টা করেছি। ওকে ভয় দেখাবার, পারিনি কিছুতেই। তাই প্রভাত একদিন সুবোধকে বলে, তুই তো খুব সাহসী, মড়াকাটা ঘরে রাত্রিবেলা গিয়ে যদি মড়ার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে আসতে পারিস তবেই বুঝব তুই সত্যিই সাহসী। সুবোধ হো হো করে হেসে নিয়ে বলে—ওঃ এই কথা ঠিক আছে, আচ্ছা বাজী রাখ। বড়লোকের ছেলে প্রভাত বলে—পাঁচশো টাকা হইল। সুবোধ বলে—ওরকম বীজম্ করতে হবে বলে দাও। আমাদের ত ভয় লেগে গেছে। করে কি, আর বলে কি, এরা? আমাদের দিকে চেয়ে সুবোধ হেসেই অস্থির বলে—এঃ তোরা একেবারে রামভীতু মুখ শুকিয়ে কেন্নি যে] প্রভাত বলে—আজই রাত্রে, কি তুই রাজী তো? নিশ্চয়, আচ্ছা ঘুরে আসি বলে বেরিয়ে গেল সুবোধ।

যথাসময়ে বেড়িয়ে ফিরে এলো সুবোধ এক ছড়া মালা হাতে করে। সবাই একসঙ্গে বাড়ি ছিল না শুধু প্রভাত। সুবোধ বলে, কই সে! বল্লাম, বেরে শুয়ে পড়েছে। সে বল্লে, জানিস ওটা এক নম্বরের ভীতু। আমি বড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখব যদি ঘুম না ভাঙে ডেকে দিস ভাই।

যথা সময়ে এলার্ম বাজল সুবোধ উঠল ফুলের মালা ও মড়াকাটা ঘরের চাবিটা নিয়ে নেমে গেল। চাবীটা জোগাড় করতে বেশ একটু অসুবিধা হয়েছিল কিছু টাকা দিয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুরা ঘরটার চার ধারে ঘুরে লুকিয়েছিল যদি সুবোধ ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে ওরা গিয়ে সাহায্য করবে। ঘরে ঢুকে আলো জালতে গিয়ে দেখে জলছে না, যাইহোক কোন রকমে আলোটা সেই পরিয়ে দিয়েছে অমনি সেই মৃতদেহটা হুহুতে জড়িয়ে ধরেছে সুবোধকে আলো দিয়ে দেখছি আমরা। উঃ বাপো বলে একটা চিৎকার করেই পড়ে গেল সুবোধ। আমরা ঘরে ঢুকে দেখি অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে আছে সুবোধ। আর তাতোদিক ভয় পেয়ে বিবর্ণমুখে চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে গেছে প্রভাত। সুবোধকে ভয় দেখাবে বলে সেই শুয়েছিল মড়ার জায়গায়। ধরাধরি করে নিয়ে এলাম সুবোধকে ঘরে, মুখে চোখে জল দিয়ে কোন ফল হোল না। তারপর গেলাম ডাকতে আপনাকে। কিন্তু আগেই যে সঙ্গীন বন্ধু ভয়ানক ভয় পেয়ে দূরে বহু দূরে চলে গেছে আমাদের কাছ থেকে বুঝতে পারিনি।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। পরদিন সেই ছেলেটি এসে বল্লে, প্রভাতকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করুন তার। আমি বল্লাম, কেন? তার আবার কি হোল? ছেলেটি বল্লে, সুবোধের সৎকার করে ফিরে এসে দেখি প্রভাতের চোখ জবাফুলের মত লাল, মাথার চুল উস্কো খুস্কো, আমার মুখের দিকে চেয়ে বলছে, সুবোধ কোথায় গেল, চল তোরা খুঁজে আনি। যত চেষ্টা করি বোঝাবার কিছুতেই বুঝবে না; সেই এক কথা, কোথায় গেল সুবোধ! ছেলেটির বার বার অনুরোধে গেলাম তার সঙ্গে।

প্রভাতকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করা গেল। ধনীর একমাত্র সন্তান প্রভাত তার হোল এই পরিনাম। বেশ থাকে মাঝে মাঝে সুবোর অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে আর আসে ঠিক ঐ মড়া কাটা ঘরের কাছেই, যেখানে হারিয়ে ফেলেছে তার প্রিয় বন্ধুকে।

সামান্য একটা বাজী রাখা নিয়ে দুটী মহামূল্য প্রাণ এমনি করে নষ্ট হয়ে গেল। সর্ব্বনাশা বাজী বলে, রুমালে চোখ মোছেন ডাক্তার রায়। শ্রোতারাও ব্যস্ত চোখের জল সামলাতে।

মা ও শিশু

শ্রীরমা দেবী

আমাদের এই বাংলা দেশে মাতৃত্বপদটি বড় মধুর। জাতটি একাক্ষর কিন্তু তাহার মাধুর্য্য বিশ্বব্যাপী। নারীর জীবনের এই যে মাতৃত্ব এর তুলি তুলনা হয়না। যুগ যুগ ধরে মানব সমাজ নারী জাতিকে মাতৃমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোরে তার অসম্মান কোরেছে। নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ এই মাতৃত্বে। স্নেহময়ী মা আর তার অবোধ শিশুর এই যে যোগাযোগ -এর অনুভূতি সর্ব্ব মঙ্গল কর। একাধারে সেবা, ধৈর্য্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা সবেরই সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত এই মাতৃমূর্ত্তি। সৃষ্টির একেবারে আদি থেকে সুরু কোরে নারীর উপরে পড়েছে এই শিশু পরিচর্য্যার ভার। অবোধ শিশু প্রথম চোখ মেলেই বুঝে নেয় মা তার সব থেকে নির্ভরযোগ্য আর তাই মার বুকেই মুখ গুঁজে সে ঘুমায় পরম নির্ভরে। শিশুর এই পরম নির্ভরতা ও বিশ্বাস যাহাতে কিছুতেই শিথিল না হয় তাহার প্রতি মায়ের সতর্ক দৃষ্টি থাকা চাই। শিশু চিত্তের মধ্যে যে মানব-শক্তি আছে তাহাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলা মায়েরই কাজ। মা যদি নিজেকে শুধু সংসারেই ডুবিয়ে রেখে শিশু মনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও অপরিমেয় সম্পদের তাগাদের কোনো খোঁজ না রাখেন, তাহলে সেই শক্তি তার ছোট মনের গহনে তলিয়ে গিয়ে বিলিয়ে যায়। শিশু জীবনের খুঁটি খুঁটি বিষয়ে জানবার আগ্রহশীল মনের প্রতিটি খুঁটির টিন প্রতি মায়েরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই। শিশুর মানসিক জীবনে একান্ত প্রয়োজন মায়ের প্রাণ ঢালা মমতা ও স্নেহ। শিশু মনের ভাবধারা, তার কল্পনা, তার মানসিক ঘাত প্রতিঘাত, অনুভূতি, বিবেক প্রভৃতি সমাক ভাবে মাকেই বুঝে চলতে হবে। শিশু মনের চাহিদা মেটানো বড় সহজ নয়। ইংরাজিতে কথা আছে, শিশুই মানুষের জনক। প্রত্যেক মানুষই একদিন শিশু থাকে, ধাপে ধাপে যেমন তার দৈহিক বিকাশ ঘটে তেমনি তার মানসিক বিকাশ ও ঘটে। শিশু ও যে একজন মন সম্পন্ন ব্যক্তি তা সে যতই অপরিণত হোক না কেন মাকে তা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে অনুকূল অবস্থা না পেলে তার সুস্থ দেহের বা মনের বিকাশে বাধা ঘটবে। জীবনে সুখ শান্তি লাভে মানসিক স্বাস্থ্যের ও কম প্রয়োজন নয় যেহেতু দেহ এবং মন নিয়েই সে হবে উত্তর জীবনে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি। শিশুর মনের বৃত্তিগুলিকে তাই স্নেহে ও যত্ন শাসনে মাকেই তোলতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ও গৃহবিপর্য্যয়ের দিনে মায়েদের নিজেদের আন্তচিন্তায় এত মগ্ন থাকতে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে শিশু পালনের দায়িত্বে খানিকটা শিথিলতা এসে যায় আর তারই ফলে অনায়াসে অবহেলার গড়ে ওঠে একটি বিকৃত রুচিসম্পন্ন মানুষ। শিশুর শিক্ষা তার খেলাধূলার ভিতর দিয়াই সুরু কাজেই সেখানে ও যতটা সম্ভব মায়ের শিশুমন নিয়ে তাহার সহিত খেলায় যোগ দেওয়া উচিত, না হলে তার মনের কোনে অজ্ঞাত অলিতে একটা বাধা থেকে যায় এবং তার ফলেই শিক্ষার ও একটা দিক রয়ে যায় অসম্পূর্ণ। সারাদিনের কর্ম্মকোলাহল পর রাত্রির, যাঁধার যখন ঘুমে আচ্ছন্ন কোরে আনে তার চোখ সে সময়টিতেও সে কামনা করে মায়ের সঙ্গ, এই ঘুমের ছায়ার মাঝে ও সে মায়ের উপস্থিতি অনুভব কোরতে চায়। এই সময় সংসারের একটানা কর্ম্মপ্রবাহ থেকে মাকে কিছুটা ছুটি রাখতেই হবে। আগেকার দিনে মা হবার সূচনা থেকেই নানা অনুষ্ঠানের বিধি ছিলো এই সন্তানের কল্যাণের জন্য। যদিও তার অনেকগুলিই আজকের দিনে কুসংস্কারের পর্য্যায়ে পড়ে, তবুও ভেবে দেখলে দেখা যাবে তার পেছনে একটা শুভ ইঙ্গিতই থাকতো। শিশুর নামকরণ প্রথা প্রায় আজকাল উঠে গেছে কিন্তু এই নামকরণের পিছনেও থাকতো শিশুর জীবনের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। নামের মর্য্যাদা ছোট মনের উপর একটা ছাপ ফেলে শিশুর মর্য্যাদা জ্ঞান বৃদ্ধি করার সহায়তা করে। শিশুকাল থেকে ছিলে ছিলে জ্ঞানে, স্নেহে, যৌথে, পরিষ্কার সন্তানকে মানুষ কোরে তোলার দায়িত্ব মায়েরই। মাকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে

সন্তানের মধ্যে মনুষ্যত্বের দীপ্তি। দেশের মহাপুরুষদের কথা যখনই ভাবা যায় তখনই তাঁদের জননীর কথা ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা নত হোয়ে আসে। শুধু আমাদের দেশে নয় সব দেশে সব কালে অন্তরালে থেকেও সমাজকে গড়ে তুলছেন মায়েরাই একি সামান্য অধিকার? প্রবল পরাক্রান্ত বীর নেপলীয়ন ও তাঁর মায়ের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা বিগলিত কণ্ঠে বিশ্বের কাছে ঘোষণা কোরে গেছেন—যে "শিশুর চেতনা যে মায়ের হাতে—
তারই কাছে জগৎটা মাথা পাতে।"

তাই বলি রত্নগর্ভা জননী হোতে গেলে প্রথমেই চাই মনের দৃঢ়তা, চাই সংযম, চাই আত্মসংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

কৃষ্ণনগরের বারোদোল

শ্রীআরতি রায়

বাংলা দেশের মেলা পার্বণের মধ্যে কৃষ্ণনগরের বারোদোল অন্যতম। এই মেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—আছে এর স্বকীয় মর্যাদা। দোল উৎসবের এক মাস পর শুক্লা একাদশী থেকে সুরু হয় এই বারোদোলের মেলা। বসন্তের শেষে—গ্রীষ্মের শুরু—আকাশের কোনে মাঝে মাঝে জমে ওঠে কৃষ্ণ কালো মেঘ—উঁকি দেয় রক্তাভাবি। কোকিলের কণ্ঠ-নিসৃত কুহু কুহু কাকলী বিলীয়মান বসন্তের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। মধুমাসের বিরাহে বেদনাসিক্ত হ'য়ে ওঠে প্রেমাতুর যুবক-যুবতীর মন-বসন্ত বিরহ তৃষ্ণা প্রভৃতি বেদনায় ভারাক্রান্ত। ঠিক এই সময় সুরু হয় বারোদোলের মেলা। বসন্তের শেষে আবার নতুন করে বসন্তকে আহ্বান জানান বিস্মৃত প্রায় অতীতের কোন্ এক নদীয়ারাজ।

বারোদোলের ইতিহাস কি—কবে নদীয়ার কোন্ মহারাজা বারোদোল উৎসবের সূচনা করেছিলেন—জানা যায় না। তবে মোটা একটা শতাব্দী যে অতিক্রান্ত হ'য়ে গেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন কিংবদন্তীও প্রচলিত নেই এই বারোদোলের পেছনে। শুক্লা একাদশী থেকে সুরু হ'য়ে একমাস ব্যাপী চলে এই বারোদোলের মেলা। দোল উৎসব হয় তিন দিন। উৎসবের তিন দিন কৃষ্ণনগর রাজ প্রাসাদ আপামর জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত। নদীয়াধিপতি প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির আছে নদীয়ার প্রান্তরে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলের বিগ্রহকে আনানো হয় রাজ বাড়ীতে। যার জায়গা থেকে বারটি বিগ্রহের সমাবেশ হয়ে বলে এই উৎসবের নাম হয়েছে বারোদোল। রাজ পরিবারের কুল বিগ্রহ বড় নারায়নের সঙ্গে এই বারটি বিগ্রহ মিলিত হয়ে বারোদোল উৎসবের সৃষ্টি। কোন্ গ্রাম থেকে কোন্ বিগ্রহ আনানো হয়—বলা শক্ত। তবে বিগ্রহ কয়টির নাম হল: বলরাম, শ্রীগোপী মোহন, লক্ষ্মীকান্ত, ছোট নারায়ণ, ব্রজনাথ, গোপীনাথ, পটের গোপাল, মদন গোপাল, নদীয়া গোপাল, কৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দ দেব।

রাজ বাড়ীর ভেতর বিরাট নাট মন্দিরে সারি করা বারটি সিংহাসনে বসেন এই বারটি বিগ্রহ। উৎসবের প্রথম দিন রাজবেশে সজ্জিত করা হয় বিগ্রহ গুলিকে, দ্বিতীয় দিন ফুলবেশ আর তৃতীয় দিনে সজ্জিত করা হয় রাখাল বেশে। অগনিত ভক্তের দল সারিবদ্ধী হয়ে দাঁড়িয়ে ভক্তি নিবেদন করতে করতে বেরিয়ে যায় অপর দিক দিয়ে। ভক্তির আতিশয্যে কেউবা কিছু ফল আর কেউবা চারটে পয়সা দিয়ে যায়। এই তো গেল বারটি বিগ্রহের আগমনে অনুষ্ঠিত দোল উৎসব। এই অকাল দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ বাড়ীর মাঠে বসে বিরাট মেলা। চলতে থাকে এক মাস ধরে। বহু দেশ বিদেশের লোক আসে এই মেলায় বেসাতী করতে। বিচিত্র পণ্য দ্রব্য সম্ভারে আর অগনিত লোক জন কোলাহলে এক মাস ব্যাপী মুখর হয়ে থাকে

রায়বাড়ীর প্রাঙ্গণ। কি চাও তুমি? কাঁচের চুড়ি? একটা সারিতে শুধু বেদেনীরা বসে আছে বিচিত্র রং-এর কাঁচের চুড়ি নিয়ে। গাঁয়ের ছোট বধূটি সলাজ ভঙ্গিতে বা-হাতটা এগিয়ে দেয় বেদেনীর দিকে: উঁ-হুঁ উঁ-হুঁ না লক্করে—তাহিলা গইলে হাথেরী ক্ষতি হইয়ে যাইবে।

বধূটি একটু সহজ হয়।

একটু এগুলে তুমি—ঘনোহারী দোকান, কত চকচকে সুন্দর জিনিষ তোমার মন হরণ করবে। পয়সা থাকে কেন—না থাকে দেখতে ক্ষতি নেই। এবার গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চরির দোকানের সামনে। উহুঁ ক্যালেণ্ডার নয়—ক্যালেণ্ডার তোমার চোখে পড়বে আর একটু এগিয়ে ডান দিকের সারিতে। এ একে বারে রীতিমত সাজানো গোছানো ছুতিও—ত্যাসেরা দিয়ে ছবি তুলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই প্রিণ্ট করে তোমার দিয়ে দেবে। জানি তুমি কৌতূহলী লোক—ছুতিওর মধ্যে একটু উঁকি দিলে দেখতে পাবে নব পরিণীত স্বামী আর স্ত্রীকে। বারদোলের মেলা দেখার জন্যেই গ্রাম থেকে এসেছে তারা—আর একত্র আলাপ এই মধুর ক্ষণটিকেই স্মরণীয় করে রাখার জন্যেই ছুতিও থেকে ছবি তুলে রাখছে। ডান দিকে ঘোর এ্যালুমিনিয়মের চকচকে বাসনের দোকান। থরে থরে সাজানো রয়েছে এ্যালুমিনিয়মের চকচকে বাসন। আমার জানা আছে তুমি সংসারী লোক—একটা ছেঁচকি নিশ্চয় একটা চায়ের কেটলী তুমি কিনবেই। এগিয়ে চলেছ তুমি এ্যালুমিনিয়মের বাসনের দোকানের সামনে দিয়ে। ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে শুধু দোকান আর দোকান। আর এমন কোন জিনিষ নেই যা মেলায় আসেনি। অবাক বিস্ময়ে তুমি শুধু দেখেই যাবে ঝলমলে আলোর মেলা—বিচিত্র রংএর পোষাকের বাহার উগ্র প্রসাধনে প্রসাধিত কত সুকুমারী তন্বী নিপুণীকে রঞ্জিত পাতলা ওষ্ঠে বাঁকে বিকে হাসি। বিলোল কটাক্ষবতীরা ঘন গ্রীবা বাঁকিয়ে আলগোছে ভেদে ভীড় ঠেলে সরে যাচ্ছে। বাসনা তপ্ত কামনা সিহরিত দৃষ্টি প্রসারিত করে চেয়ে আছে তাদের দিকে নব যৌবন সুরভিত যুবকদল।

আনমনে এসে থমকে দাঁড়ালে তুমি। আরে যাবা এ আবার কী? বাইরে না হ'লেও অন্তরঃ মনে মনে তুমি চমকাবে। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে দোকানের সামনে। জিজ্ঞাসা করে জানবে আগ্রার দোকান। সুদূর আগ্রা থেকে মেলায় এসেছে এরা। দেখতে দেখতে চলেছ তুমি, চৈত্রের গরম আর লোকের ভীড়ে ঘেমেও উঠেছ বেশ। মানুষের কলগুঞ্জন ছাপিয়ে মাইকে সংঘোষিত চীৎকারে তোমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে। এবার গিয়ে দাঁড়ালে তুমি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। দৃষ্টিগোচর হ'ল তোমার অগণিত বালক বালিকার দল তড়ো ছড়ি সুরু করেছে নাগর দোলায় চাপবার জন্যে। কেউ বা তৃপ্তি সহ দোলখাচ্ছে আর কেউ বা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে আছে দোদুল্যমান বালক বালিকার দিকে। দাঁড়িয়ে তুমি শুনছো কানে এসে তোমায় আঘাত করছে মাইকের ঘোষিত উচ্চরব: চার চার পয়সা—

: আমাদের সার্কাস এখনি সুরু হবে—

: এক আনায় বৈকুণ্ঠধাম দর্শন—

: দু' চুপয়সায় খণ্ডিত মস্তক—

: নীলাম্ব বালা দু' আনা—

: মেয়ে বিলকী পুকারে—

: শোন বন্ধু শোন—

বাবা, হাসিয়ে উঠলে তো! ভয় নেই—এগিয়ে যাও ঐ নাগরদোলা তলার দিকে সোজা মেয়েদের সংরক্ষিত ছপিয়ে মাস।

যেয়ে যাও, চৈত্রের গরমে অনেকটা আরাম পাবে।

: পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে পাওয়া গিয়েছে—সেভাজী সেবাশ্রম অফিস থেকে নিয়ে যান!

সন্ত কন্যা হারানো মায়ের কর্ণে পৌঁছানো মাইকে ঘোষিত কথা কয়টি। অপূর্ব্ব মাতৃত্বের মমত্ববোধে অমনি দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে প্রায় অবিলম্বে যেন সেবাশ্রমের অফিসে হাজির হল মা। হারানো মেয়েকে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো সে।

এখন যদি তুমি মেলা থেকে ফিরে এস তা হ'লে ঠকবে। কারণ যা দেখবার জন্যে বহু বিদেশ থেকে লোক আসে এই কৃষ্ণনগরে—তাই তোমার অদেখা থেকে যাবে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল। দেখে যাও তুমি কি নিখুঁত সৃষ্টি— কী অপূর্ব রং—শিল্পীর গঠন শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে অপরিচিত শিল্পীকেও মুগ্ধ থেকে তুমি নমস্কার জানাবেই!

বধূ

শ্রীসুধা দেবী

গৃহস্থের বধূ। এক হাতে তাহাকে সমস্ত কাজ সারিতে হয়। ভোর না হইতেই সে উঠিয়াছে। বাসি পাঠ সারিয়া উনানে আগুন দিয়া সে স্নান করিতে গিয়াছিল, স্নান সারিয়া আসিতেই দেখিল উঠানে একটি মস্ত মাছকে ঘিরিয়া বাড়ীর সকলে কলরব করিতেছে। ছোটরা মাছটির জিব আছে কি না এবং থাকিলে কতটা আছে এই লইয়া পরস্পরের সহিত বচসা শুরু করিয়াছে এবং বড়রা মাছটির ওজন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিতেছে।

বধূকে দেখিয়াই গৃহিনী বলিলেন, এই যে বৌমা, ফুটে গেল দেখি মাছটা, তারপর তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়ে দাও। আজ আর ডাল টাল রেঁধে কাজ নেই, ঐ মাছেরই পাঁচ রকম হবে এখন।

মাছটি কাটিয়া শাশুড়ীর নির্দেশ অনুযায়ী বধূ রান্না চাপাইয়া দিল। মুড়োটি তেলঝাল দিয়া কর্ত্তার জন্য রাঁধিতে হইবে, কতগুলি পেটি বাছিয়া ছোটদের জন্য ভাজা হইবে, লাগার মাছের কালিয়া ও ঝাল এবং তেলকাঁটা-গুলির সহিত শুকনোতা মিশাইয়া চচ্চড়ি।

রান্না সারিতে বেলা হইয়া গেল, তারপর সকলে এক এক করিয়া খাইয়া গেল। সকলেই আশা মিটাইয়া খেলা ছড়া করিয়া খাইল। গৃহিনীর আদরের পুষি বিড়ালটাও বাদ গেল না, সকলেই তাহার দিকে মাছের টুকরা ছুঁড়িয়া দিল সকলের শেষে গৃহিনী খাইতে আসিলেন। পাতে মাছের পরিমাণ দেখিয়া বলিলেন কতেক কি বৌমা, এত মাছ কি খেতে পারব। বেশী খাবার অভ্যাস আর নেই।

কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল সব মাছগুলিই তিনি খাইয়া ফেলিয়াছেন। শেষকালে কতগুলি ভাতের সহিত কিছু মাছ মাখিয়া বিড়ালটাকে দু দু করিয়া ডাকিলেন। বিড়ালটা অদূরেই লম্বা হইয়া ঘুমাইতেছিল, গৃহিনীর ডাকে একবার চোখ মেলিয়া চাহিল কিন্তু খাইবার জন্য কিছু মাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া পুনরায় চোখ বুজিল। গৃহিনী হাসিয়া বলিলেন, আজ পুষির ও মাছে অরুচি হয়েছে, থাক্ পরে খাবে এখন। উঁচাইয়া আসিয়া গৃহিনী বলিলেন, কই বৌমা, আমাকে দাও, জল দিয়ে তুমি এবার খেতে বোসগে, বেলা আর নেই। আর আজ যেন দুপুরে ঘুমিওনা বাছা, রান্নার আচার চাটনী রোদে দেওয়া হয়েছে, একটু নজর রেখো। আমি যাই, একটু গড়িয়ে নিইগে।

বধূর হাত হইতে পান, জল লইয়া ভাঁড়ারে ঢুকি দিয়া গৃহিনী গড়াইতে গেলেন। বধূ নিজের জন্য ভাত বাড়িতে গেল।

থালাগুলি সব এঁটো হইয়াছে, অগত্যা চচ্চড়ি রাখা কাঁসিতেই ভাত খাইতে হইবে। কাঁসিটি পরিষ্কার করিয়া ভাত বাড়িতে গিয়া বধূ দেখিল ভাত বেশী নাই, মনোমত উপকরণ পাইয়া সকলেই আজ ভাত বেশী খাইতেছে, অথচ গৃহিণী চাল বরাদ্দ মতই মাপিয়া দিয়াছেন। এত মাছের এক টুকরাও বধূর জন্য অবশিষ্ট নাই, কাঁসিতে অল্প একটু কাঁটার চচ্চড়ি শুধু পড়িয়া আছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বধূ ভাত কটি কাঁসিতে বাড়িয়া লইল, তারপর দাওয়ায় আসিয়া খাইতে বসিল।

চচ্চড়ি দিয়া কতগুলি ভাত উঠিল, বাকি ভাতগুলি হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে ভাবিল শাশুড়ী ভাঁড়ার বন্ধ করিবার আগে দুইটা কাঁচালঙ্কা লইতে ভুল হইয়া গিয়াছে। খোলা জানালার মধ্য দিয়া একবার ভাঁড়ারের মধ্যে তাকাইল, সেখানে মেঝের উপর একথামা আম বসান আছে, আলমারীতে রহিয়াছে দুধ ও মিষ্টি। ভাতের পাতে দুধ আজ কেউ খায় নাই। সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া সে উঠানের দিকে চাহিল, সারি সারি আচার চাটনীর ভাঁড়গুলি সাজান আছে। তাহার দৃষ্টিতে হতাশা ফুটিয়া উঠিল ঠোঁটের আগায় আসিল ক্ষোভপূর্ণ হাসি।

অন্যমনস্ক ভাবে একবার বিড়ালটার দিকে চাহিল পেট ভরিয়া মাছ খাইয়া পুষি আরামে ঘুমাইতেছে। গৃহিনীর পাতের গোড়ায় রাশিকৃত কাঁটা ও তাহার জন্য মাখা মাছ ভাতগুলি অনাবৃতভাবে পড়িয়া আছে।

সুধায় জ্বালায় বধূ শুধু ভাতগুলিই গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল।

অনুরূপা দেবী স্মরণে

গত ৬ই বৈশাখ শনিবার সকাল ১০টা ৪৫মিঃ সাহিত্য সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৮৮২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে রায় মুকুন্দ দেব বাহাদুরের দ্বিতীয় সন্তান অনুরূপা দেবীর জন্ম হয়। কন্যা সন্তান বলে তাঁর জন্মলগ্নে শঙ্খধ্বনি বাজেনি। সেদিনের সেই অনাদৃত মেয়েটিই পরবর্তীকালের যশস্বিনী সাহিত্যিকা সর্বজন শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী। অনুরূপা দেবী শৈশবে পিতার কাছে এবং বিদেশী শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। ১০ বৎসর বয়সে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর বিবাহের পর মজঃফরপুরে গিয়ে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ লাভ ঘটে। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'টিলাকুঠী' নামী দেবী ছদ্ম নামে। ১৩১১ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তাঁর রচনা প্রবাহ অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে। মুষ্টিমেয় যে কয়জন মহিলা লেখিকা তখন বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোড়িত করেছিলেন, অনুরূপা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।

অতীতের নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও ধারাবাহিক ভাবে বাংলা সাহিত্যকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করা যে মেয়েদের পক্ষে কত অসুবিধাজনক ছিল সে কথা আজকের মানুষ সহজে উপলব্ধি করতে পারবে না। বাংলার যশস্বিনী কন্যা শক্তিমতী লেখিকা তাই আমাদের ঘরে ঘরে চির নমস্যা। ঘরের কোনে একদিন তিনি যে কীর্তি প্রদীপ শিখাটি জ্বালিয়েছিলেন তার প্রদীপ্ত আলোক রশ্মি আমাদের চলার পথে দিশারীর কাজ করছে। যাঁর জন্মলগ্নে শাঁখ বাজেনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি সম্ভার বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আসন পেতে রেখেছে। সেই শঙ্খধ্বনি আজ যেন বিষাদে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর তিরোভাবে আজ তাই সকলকে শোক বিহ্বল করে তুলেছে। তাঁর অনবদ্য রচনা সম্ভার মা, পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি, মহানিশা, বাগদত্তা, জ্যোতিহারা, চক্র-পথহারা, উত্তরায়ন, হিমাদ্রি, সর্বাণী, বিবর্তন, ছায়ানোপক্ষা, সোনার খনি, গরীবের মেয়ে, ঘোমার তাটা, ত্রিবেণী, রামগড়, রাজাশাখা, প্রাণের পরশ, পথের সাথী, উল্কা, মধুমল্লা, চিত্রদীপ, বিদ্যারম্ভ, কুবায়িল ভট্ট, মাইচভুইয়া, মধুচক্র, সাহিত্য ও সমাজ উত্তরাখণ্ডের পত্র ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর সর্বশেষ রচনা বিচারপতি সাম্প্রতিক রচনা। জীবনের স্মৃতিলেখা নামে কিছুদিন আগে তিনি বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় তাঁর আত্ম জীবনী লিখতে সুরু করেন। কিন্তু কৃতীপুত্র অনুজ নাথের অকাল মৃত্যুতে তাঁর সে লেখা মধ্য পথে থেমে যায়।

এর পরেও তিনি বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। সাহিত্য জীবনে যশ সম্মান অজস্র ভাবে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনেও তিনি দুঃখ বেদনা অনেক পেয়েছেন। গত ১৩৩৪ সালের ভূমিকম্পে তাঁর অতি আদরের নাতনী অলকার মৃত্যু তাঁকে আঘাত দেয় শোচনীয় ভাবে অকাল পুত্র ও স্বামীর মৃত্যু শোকও তাঁকে সহ্য করতে হয়। তিনি আজ আমাদের মধ্যে আর নেই কিন্তু তাঁর অমর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের প্রাণে প্রাণে চির কালজয়ী হয়ে থাকবেন। সাহিত্য ছাড়া বিভিন্ন নারী কল্যাণ মূলক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে আমরা ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

বৈশাখের ব্রত

শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য্য

পুণ্যার্জনের লোভ চিরদিনই পুরুষের চেয়ে মেয়েদেরই বেশী। তাই বারমাসে তের পার্বণের অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হয় তাদের দ্বারা। ব্রত পুজোর ওত কচ্ছ্রসাধনা করতে প্রাচীনারা একটুও পেছ্‌পা হতেন না। ভবিষ্যতের পুণ্যের চেয়ে সাময়িক আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষাই আমার মনে হয় তাদের বেশী প্রণোদিত করতো। একান্নবর্তী পরিবারে চার জন পাঁচ জন একসঙ্গে ব্রত করতেন। দিন রাত নিরম্বু উপবাস থেকেও তাঁরা ব্রতের কাজ করতেন হাসিমুখে। আজও গ্রামে গ্রামে প্রবীণা নারীরাই গ্রাম্য সংস্কৃতি ব্রত পূজার ধারাটি বহন করে আসছেন নিষ্ঠা সহকারে।

বছরের প্রথম মাস বৈশাখে পল্লীবাসীরা স্নান খান করাটাকে খুব পুণ্য মনে করেন। তাই এ মাসে মেয়েরা অনেক রকম ব্রত পূজা করেন। তার মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া একটি বিশেষ ব্রত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্তও দেখেছি পূর্ববঙ্গে মেয়েরা প্রত্যেকেই এ ব্রতটি করতেন। যুদ্ধের পরে সমস্যার ও দেশ বিভাগে ছত্রছাড়া হ'য়ে গেছে বাঙালী সমাজ—বিপ্লবের পথে চলেছে তাদের সংস্কৃতি। তাই এসব ব্রত পূজা করবার মতো সময় ও উৎসাহ গ্রামেও বড় একটা নেই।

বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এ ব্রতটি অনুষ্ঠিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতে নারায়ণের পূজো করতে হয়। পূজোর বিশেষ উপকরণ—একটি জলপূর্ণ মাটীর কলসী, গামছা, পাখা ও একটি সৈন্ধা বিতে হয়। তা' ছাড়া অন্যান্য বিধিসম্মত নৈবেদ্য তো আছেই। পুরোহিত পূজো করবেন। পূজোশেষে পুরোহিত-দর্পণ হ'তে সংস্কৃতে ব্রত মাহাত্ম্য শোনাবেন পুরোহিত। পরে ব্রতী একজন ব্রাহ্মণকে ঐ জলপূর্ণ কলসীটি, গামছা, পাখা ও সৈন্ধা দান করবেন। তারপরে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করবেন। এমনি করে নয় বৎসর প্রতি অক্ষয় তৃতীয়াতে ব্রত করতে হবে। শেষ বৎসরেই হবে ব্রত উদ্‌যাপন।

ব্রত উদ্‌যাপনের দিন সকলেই সাধ্যানুসারে আড়ম্বর করেন। চারটি বাঁশের খুঁটি পুতে নারকেল পাতার ছাউনি দিয়ে উঠোনে একটি চালাঘর তৈরী করতে হয়—নারকেল পাতার ছাউনির উপর লাল কাপড় দিয়ে মুড়ে দিতে হয়। তাকে বলে ভাষার বলে চুয়ারি। সেই চুয়ারির মধ্যে বসেই সেদিন ব্রতী ব্রত সাঙ্গ করবে। ভোরে স্নান করে এসে ব্রতী পূজোর আয়োজন করে সেখানে ভক্তি সহকারে করজোড়ে বসে থাকবে। পুরোহিত ষোড়শোপচারে পূজো ও হোম করবেন। তারপর তেমনি ব্রত মাহাত্ম্য শোনাবেন পুরোহিত। পূজো শেষে ব্রতী ব্রাহ্মণকে যথারীতি দান করবেন এবং ব্রাহ্মণ ও এয়ো ভোজন করাবেন। এ ব্রত করলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়—এ হল শাস্ত্র বাক্য।

বৈশাখ মাসে মেয়েরা আর একটা ব্রত করে—তার নাম 'নিত্য সুখদী'। এ ব্রতটাও বিয়ের পরে প্রায় প্রত্যেক মেয়েই করতো। চৈত্র সংক্রান্তি দিন হ'তে ব্রতের শুরু বৈশাখের সংক্রান্তি দিন হয় শেষ। এমনি ভাবে চার বৎসর করে হয় ব্রত প্রতিষ্ঠা। এই একমাস প্রতিদিন ব্রতী স্নান করে এসে একটি থালায় তেল কাঁচা, হলুদ বাটা, চন্দন, কাজল, সিন্দুর, চারটে কড়ি, ফল ও মিষ্টি, এবং পান সাজিয়ে দিয়ে ভগবতীর নামে নিবেদন করাবে ব্রাহ্মণ দিয়ে। তারপর একজন সধবাকে এসব দিয়ে সাজাবে। প্রথমে মাথায় তেল দিয়ে দেবে, তারপর হলুদ বাটা হাতে বগলে মুখে দেবে দেবে—চন্দন কাজল সিন্দুর পরিয়ে হাতে কড়ি পান মিষ্টি ও ফল দেবে। তারপর ভগবতী জ্ঞানে তাকে প্রণাম করবে।

চতুর্থ বৎসর বৈশাখের সংক্রান্তি দিন। ষোড়শোপচারে ভগবতীর পূজো করতে হবে। তারপর একজন সধবাকে পরিতৃপ্তি মত ভোজন করিয়ে একটি লাল পেড়ে কাপড় তাকে পরাতে হবে। শাখা পরাবে এবং প্রতিদিনের ব্রতের মতো সেই থালার হলুদ, চন্দন, কাজল, সিন্দুর পরিয়ে হাতে ফল-মিষ্টি, কড়ি ও পান দিয়ে প্রণাম করবে।

নিত্য সুখদী ব্রত করলে নাকি নিত্যই সৌভাগ্য বাড়ে অর্থাৎ ব্রতী দিন দিন সৌভাগ্য লাভ করে। এ সব ব্রত পূজায় অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই গ্রামগুলো তখন ছিল আনন্দ মুখর। মানুষের মন ছিল সরল ও পবিত্র। দেবতার পূজার্চনা করে তুলতেন তাঁরা মানুষের সেবার মাধ্যমে।

বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথায় মেয়েদের লাভ-ক্ষতি

শ্রীরুচি সেনগুপ্ত

অন্য নানা বিষয়ে অগ্রগতি ঘটলেও এ যুগটাকে বিশেষ ভাবে নারী প্রগতির যুগ বলা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরেই মেয়েরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাবিষয়ের পরাধীনতা স্বীকার ক'রে কালযাপন করছিলেন। বর্তমানে আইনের সাহায্যে সেই সব পরাধীনতা দূর করবার অনেকগুলি দাবি তাঁরা সরকারের সম্মুখে উপস্থাপিত ক'রেছেন। তার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার বিল্‌ই প্রধান এবং সরকার তাঁদের এ দুটো দাবিই মেনে নিয়েছেন আর বিল দুটোর স্বপক্ষে আইন পাশ হ'য়ে গেছে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে পুরুষের ছেলের জন্য বহু বিবাহের পথ অবারিত ছিল। আর শত অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হ'লেও স্বামী পরিত্যাগ করার রীতি মেয়েদের ছিল না, পরান্তর গ্রহণ করা তো দূরের কথা। সে অবিচার [আর] দুর্দশা থেকে নারীজাতি আজ মুক্তিলাভ ক'রেছেন। একই মাতা পিতার সন্তান হ'য়েও পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত থাকার গ্লানিও তাঁদের অপসারিত হয়েছে। এখানে আমি শুধু বিবাহ বিচ্ছেদের কথা নিয়েই ব'লতে চাই যে এই বিল পাশ হওয়াতে তাঁদের জীবন কতটা লাভবান হবে। কিছু দিন না গেলে সে কথা নিশ্চিত ক'রে বলা কঠিন। আর এই প্রথা শুধু যে তাঁদের জীবনকে লাভবানই ক'রবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না—একথাও জোর ক'রে বলা যায়না। স্বামীস্ত্রীর প্রেম অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সংসারের নিগূঢ় প্রয়োজনে স্বামী হয়তো স্ত্রীর অনুমতি ও সম্মতি নিয়ে অন্য পত্নী গ্রহণে বাধ্য হয়। ঘরে সপত্নী এলেও প্রথমা স্ত্রী স্বামীর স্নেহে বঞ্চিতা হয় না, স্বামীর সংসারে সে পূর্বের সম্মানেই জীবন কাটিয়ে যেতে পারে। অথবা সপত্নীর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকলেও স্বামীর সান্নিধ্য থেকে স'রে যায় না। যেমন কোনো নিঃসন্তান ধনপতি, তাদের প্রচুর অর্থ আছে কিন্তু ভোগ করবার জন্য সন্তান নেই। স্বামী স্ত্রী দুজনেই সন্তানের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু তাদের সে ব্যাকুলতা বিধাতা দূর করেন না। নিজের বন্ধ্যাত্বের দোষে স্বামীকে একটি সন্তান উপহার দিতে না পেরে স্ত্রীর দুঃখের শেষ নেই। অথচ শোণিত সম্পর্ক হীন কাউকে ঘরের নিতেও তাদের মন সায় দেয় না। এ অবস্থায় স্বামীর অনিচ্ছাতেও স্ত্রী স্বেচ্ছায় আর সানন্দে স্বামীর আবার বিবাহ দিয়ে শ্বশুর কুলের নাম রক্ষা করেছে এ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বেশী না হলেও নিতান্ত বিরল নয়। এখনি ক'রেই হয়তো প্রথমা স্ত্রী সপত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে নিয়ে নিজেও সুখী হ'তে পারত। স্বামীকেও সুখী করতে পারত, জোড়া দিতে পারত একটা ভাঙা সংসারকে। এখন আর সেটা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত স্বামী আবার বিবাহ করতে পারবে না। কিন্তু এখন স্ত্রীর সে ত্যাগ স্বীকার করতে হ'লে স্বামীর পরিচয় পর্যন্ত তার জীবন থেকে মুছে ফেলতে হবে, স্বামী হবে তার সম্পূর্ণ অনাত্মীয় আর পর। যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামীর আনন্দের জন্য স্বামীকে সে পরের হাতে তুলে দিতেও উৎসাহী হ'তে পারে, কিন্তু স্বামীকে সম্পূর্ণ পর ক'রে দেবে সে কোন্ প্রাণে? স্বামীও সন্তানের জন্য, বংশরক্ষার জন্য হয়তো পুনরায় বিবাহে সম্মত হ'তে পারে, কিন্তু সেজন্য প্রিয়তমা পত্নীকে বর্জন করা তার পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। তাই যে সমস্যার সমাধান হতে পারত তা' আর হয় না।

চিররুগ্না স্ত্রীকে বর্জন করা আইনসম্মত হলেও যে স্বামীর মনে স্ত্রীর জন্য স্নেহ থাকে সে স্ত্রীকে বর্জন করতে পারে না, করতে চায়ও না। অথচ সন্তান পালন, সংসার পরিচালনা আর রুগ্না স্ত্রীর সেবা করা স্বামীর সম্ভব হয় না, কারণ বাইরে গিয়ে তাকে উপার্জনও করতে হয়।

বাধ্য হয়ে স্বামীকে আবার বিয়ে করতে হয়, আর সেই ক্ষমা অক্ষমা স্ত্রীকে স্বামীর সংসার থেকে সন্তান সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চলে যেতে হয়; কোথায় ঠাঁই মেলে কে জানে? এস্থলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েও স্বামী যদি আবার বিবাহ করতে পারে, তবে প্রথমা স্ত্রীর এমন ক'রে স্থানচ্যুতি ঘটিত না আর সপত্নীটি হৃদয়বতী হ'লে তার কাছ থেকে মমতাময় একটু সেবাও সে পেতে পারত। এস্থলে তর্কের অবকাশ নেই। কারণ সপত্নীই হোক যেই হোক্ রুগ্নের সেবা করা মানবিক ধর্ম বলেই আমরা মনে করি।

এমনি অনেক ব্যাপারেই স্ত্রী অকর্মণ্য হয়ে পড়তে পারে এবং স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে বাধ্য হতে পারে। দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য থাকলে অবিশ্যি বিচ্ছেদ হওয়াটা দুঃখজনক নয় বরং সুখের ব্যাপারই বলা যেতে পারে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রচুর মমতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে স্বামীকে হয়তো আবার বিবাহ করতে হয়। তখন আইনের সাহায্যে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বর্জন করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না। এ ব্যাপার স্বামীর পক্ষে যেমন মর্মান্তিক, স্বামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করে বেঁচে থাকা স্ত্রীর পক্ষেও তেমনি মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি?

সংহতি

শ্রীধীরেন বসু এম-এ,

তব ভ্রূকুটির বঙ্কিম বিদ্রূপ, মোর
হৃদ্ কন্দরে পশিবে না কভু জোর;
ভর্ৎসনা সেই মোর ভাল। তবু ভুল
ভাঙা, চন্দন পুষ্পিতপাত্র, দুর্ব্বাদল
সে-ও হেয় মোর কাছে, যদি সে নৈবেদ্য
ভাঙা প্রাণের পসরা ঢাকা অনবদ্য
মমতায় নিয়ত ক্রন্দনে নাহি ঘের
সাড়া, অশেষ অব্যক্ত ব্যথা বিনিময়ে।
তবে কোন প্রবাসের যাত্রা সুরু কালে,
তপ্ত মরুকণা তব, শিক্ত আঁখি তলে,
বরেছিল মুক্তার মতো, অনখে স্মৃতি
লেখা তার, আজিও আমার মনে প্রীতি
নিশিকার পরিচয় আনে অনুরাগ,
নাহি মানে যোগ কিংবা ঘুম ব্যবধান।

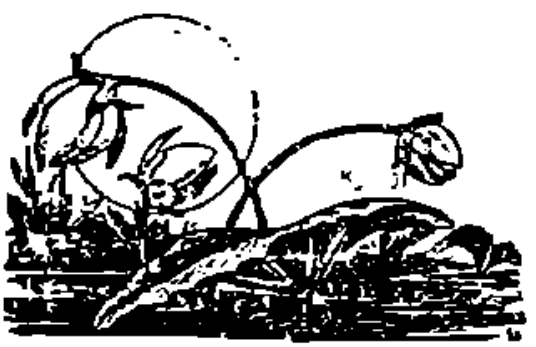

আধুনিক সাহিত্যের পটভূমিকা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ইংরাজিতে একটি কথা আছে যা সর্ব্বকালে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য সে কথাটি হচ্ছে—Art for art's Sake এটি যে কেবল মাত্র সাহিত্যের Art হিসাবে ব্যবহার করা যায় তা নয় বিভিন্ন Artএর পক্ষেই এ কথা প্রযোজ্য। তবে সাহিত্যের ব্যাপারে এ কথাটি বিশেষ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু আধুনিক যে সাহিত্য অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য সে কথা মানে নি—বিভিন্ন মতবাদের ভেতর আধুনিক সাহিত্যের ঘাড়ে 'পাকের ওপর হোয়ার আর্টের' মত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য সব সময় দেশ কাল পাত্রের ওপর নির্ভর করে অর্থাৎ যাকে আমরা বলি পটভূমিকা। বর্ত্তমানে দেশের এক বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্ত্তন শুধু রাজনৈতিক নয় সমাজ, দেশকাল পাত্রের ওপর এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সামাজিক পটভূমিকায় রূপান্তর ঘটেছে।

আধুনিক সাহিত্যে Realisimএর পক্ষ পাতিত্বকে অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে এ সাহিত্য বাঁচতে পারে না, সাহিত্যে Art কোথায়? কিন্তু Artএর বিভিন্ন দিক আছে অতএব একটিকে ধরে থাকলে অন্যগুলি দেখবার অবকাশ হয় না। তাই এ যুগের সাহিত্যে বিভিন্ন Artকে নিয়ে এক বিরাট Experiment চলেছে।

এই রকম এক বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল মাইকেলের কাব্য সাধনায়। পলাশীর যুদ্ধে শুধু রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটায়নি; মধ্যবিত্ত সমাজের এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপীয় সংস্কৃতির যে ধারা সে দিন বাংলার বুকে নেমে এসেছিল তা' রোধ করতে কেউই পারে নি। তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী ইউরোপীয় কৃষ্টি কে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করল। ইউরোপীয় সাহিত্যে তখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জয়ধ্বনি।

মাইকেলের কাব্য সাধনায় এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জয়ধ্বনি ঊদ্গীয়মান হল। সেইজন্য আমাদের সাধনা ও সৃষ্টিগুলির প্রতিবিম্ব মাইকেলের কাব্য। মাইকেলের কাব্য ধারা থেকে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পরীক্ষা শুরু আজও সেই পরীক্ষার বন্যাধারা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত।

বর্ত্তমানে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিধা বিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক বিভক্ত নয়—ছন্নছাড়া মানুষের এক বিরাট প্রশ্ন ও সেই সঙ্গে সামাজিক আলোড়ন বাংলার বুকে দেখা দিয়েছে। এই ছন্নছাড়া গৃহছাড়া মানুষেরও রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সাহিত্যের মেরুদণ্ড তৈরী হয়েছে। মাইকেলের কাব্যে যে স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক মনোভাবের শুরু হয়েছিল আধুনিক সাহিত্যে তার চরম বিকাশ। পূর্ব্বেই বলেছি যে আধুনিক সাহিত্যের এটা Experimentএর যুগ। অতএব বিভিন্ন পথ দিয়ে একে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তবে Anti Romantisim বর্ত্তমান সাহিত্যের একটা Art একথা কোন মতেই সত্য নয়। যেখা দেশ কবির দেশ অতএব সেখানে Anti Romantisimএর স্থায়িত্ব বেশীদিন নয়, কিন্তু বিপরীত ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পৃথিবীর সর্ব্বত্র নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রনেই বর্ত্তমান সভ্যতার সৃষ্টি। অতএব আধুনিক সাহিত্যকে নেহাৎ অপাংক্তেয় বলে স্পর্শ না করবার মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যা সত্যিকারের রূপ ও রূপক তা বর্ত্তমান সাহিত্যের বিষয় বস্তু। বর্ত্তমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমস্যা শুধু সাংসারিক নয় সামাজিক রাষ্ট্রিক যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা মনন চিন্তার চেয়ে ও গতিশীল। অতএব তাকে বাঁধ দিয়ে রোমান্সের তুলি চড়ান করা

তাদা জানালার পাশে বসে কয় প্রিয়ার মুখের সঙ্গে পূর্ণিমা চাঁদের তুলনা, নিতান্তই হাস্যকর।

এ যুগের সাহিত্যের সঙ্গে পথ চলতি মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাই আজকের সাহিত্য প্রতিটি মানুষের সুখ দুঃখের প্রতিবিম্ব।

এই ভালবাসাই T. S. Elliotকে Wasteland প্রণয়ন করতে প্রণোদিত করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংস-লীলার মধ্যে এ কাব্যের সৃষ্টি। এ কাব্যকে সেদিন নৈরাশ্যবাদের প্রতীক বলে দেখেন মেরে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ নৈরাশ্য সেদিন কেবল Elliotএর কাব্যেই নয় সারা পাশ্চাত্য মনোজগতে এ নৈরাশ্য নেমে এসেছিল। Elliot-এর কাব্যে তাই শেষ কথা, "শান্তি দাও, শান্তি দাও।" এ যুগের বাংলা সাহিত্যের তাই শেষ কথা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য', বর্তমান সমাজের যে ভাঙন তার ফলে যে পরিসমাপ্তি ও তার কি পরিণতি তা আজও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রয়েছে। তার ফল বিষময় কি অমৃতময় তা আজও কেউ জানে না। হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন কিছু সৃষ্টি হবে। কিন্তু ভয়প্রাণ মানুষের বেদনা আজ বাংলার চতুর্দিকে ধ্বনিত হচ্ছে তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যথাবিদ্ধ মনস্তত্ত্বের বিকাশ আধুনিক সাহিত্যের মর্ম কথা। আজকের এই সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক আলোড়ন সাহিত্যের স্থবিরত্বের মূলে আঘাত হেনেছে।

রবিন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—

"রাষ্ট্রতন্ত্রে আমরা শুধু স্বাধীন হতে চেষ্টা করব আর অন্য সব জায়গায় চোখবুজে থাকব তা কখনই হতে পারে না··· যৌবনের চাঞ্চল্যে সমস্তকে নাড়া দিয়ে সকল দিকে তরঙ্গিত মুখরিত করে তুলব—।"

আজকের সাহিত্য সামাজিক চেতনার মাধ্যমে সে পরিচয় দিতে এগিয়ে এসেছে। তত হোক এর অগ্রযাত্রা পথ।

কাঁপিতেছে রাতের তারকা

জনাব বন্দে আলী মিয়া

আমার মাধবী দিন ফুরায়ে গিয়াছে আজ
কাঁপিতেছে জীবনের শিখা
ফুরায়েছে সাধ আশা—দুইটি নয়ন হতে
মুছে গেল স্বপনের লিখা।
ঘুমের আবেশ আজ ছেড়ে গেল মোর
বাসক নিশীথ-শেষে ছিঁড়ে গেল ডোর,
কামনার দলগুলি ঝরে গেল বেদনায়
নিভে গেল প্রাণের প্রদীপ—
ফাগুন দিনের গান রয়ে গেল বহুদূর
জাগিল না বরষার দীপ।

আমার জীবনে আজ বাজিতেছে হাহাকার
কাঁপিতেছে রাতের তারকা।
মানস কুসুম হতে উড়ে গেছে প্রজাপতি
আসিবে না ভোর ভীরু চখা।
আমার আকাশে আজ নাই আলো নাই
একটি বিহঙ্গী হেথা আসিছে ঘুমাই
আমার বুকের মাঝ জমে শুধু দীর্ঘশ্বাস
বহে শুধু বৈশাখী ঝড়—
তৃষিত তরিয়া মোর ফিরে যেমন বাজে
বিষ হলো রাতের প্রহর।

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

(৯)

"তোর পরীক্ষার আর কত দেরী আছে রে কৃষ্ণা ?"

কৃষ্ণা পড়ছিল ; গুরু এসে তার সামনের একটি চেয়ারে বসলেন।

"কেন পিসিমা", কৃষ্ণা চোখ বড় করে বললে, "হঠাৎ তোমার পরীক্ষার খোঁজ পড়ল কেন ?"

"দরকার আছে, বল্‌না ?" গুরু বললেন।

মনে মনে হিসাব করে কৃষ্ণা বললে, "এখনও দেরী আছে পিসিমা। সেই পূজোর পরে।"

"আমি ভাবছি এই সামনেই আষাঢ় মাসে", গুরু একটু থেমে বললেন, "তোর বিয়েটা দিয়ে ফেলবো"।

"আমার বিয়ে ?" কৃষ্ণা যেন আকাশ থেকে পড়ল "কার সঙ্গে ঠিক করেছ পিসিমা ?"

"রঞ্জনের সঙ্গে" গুরু গম্ভীর হয়ে বললেন" "ছেলেটি বড় ভালো ; তার মামা মামীর কাছে লিখেছিলুম, তাদেরও এ বিয়েতে মত আছে। তারাও তাড়াতাড়ি কাজ করতে চায়"।

"কিন্তু পিসিমা", কৃষ্ণার মুখের থেকে হঠাৎ যেন সমস্ত আলো মিলে গেছে। সে বললে, "আমায় এখন বিয়ে দিও না। বিয়ে দিলে আমি সুখী হবো না পিসিমা।

"সে কি কথা", গুরু বিস্মিত হয়ে বললেন "হ্যাঁরে কৃষ্ণা, এসব কি বলছিস তুই ?" কৃষ্ণা কোনও কথা না বলে মুখ নীচু করে বসে রইল। গুরুর যেন বিস্ময়ের আর শেষ নেই। তিনি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মাতৃহারা একটি ছোট শিশু তাঁর কোলে বসে আধ আধ স্বরে কথা বলতে শিখছে। তিনি উঠে এসে কৃষ্ণার নত মুখখানি উঁচু করে তুলেই চমকে উঠলেন, "হ্যাঁরে তুই কাঁদছিস কেন ? তোর হয়েছে কি ? সেই এক মাসের মেয়েকে এই আঠারো বছরেরটি করে তুললুম, কিন্তু তার মনে এর মধ্যে এত যে দুঃখ কোথা থেকে এল, তাতো আমি বুঝতে পারলুম না।"

কৃষ্ণা দুই হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে, কান্না ভেজা মুখখানি তাঁর আচলের নীচে লুকিয়ে মৃদু স্বরে বললে, "পিসিমা, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারবো না।" গুরু বুঝতে পারলেন কৃষ্ণা তাঁকে ফাঁকি দিয়ে মনের কথা লুকাতে চেষ্টা করছে। সেই জন্য তার ব্যাকুলতায় বিচলিত না হয়ে তিনি বললেন, "কিন্তু কৃষ্ণা, তুই ত জানিস, তোকে আগলে আমি বেঁচে থাকবো না। আমাকে মরতে হবে।" কৃষ্ণাকে নীরব দেখে তিনি আবার বললেন, "আমি যে রঞ্জনকে কথা দিয়েছি।" সেই রকম মুখ চোখ রেখে কৃষ্ণা বললে, "তার জন্য তুমি ভেবো না, একে আমি বলে কোবে"—

আর বুঝি গুরু নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। রঞ্জনের হাসিভরা তরুণ মুখখানি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতেই, তাঁর মাতৃ হৃদয় বেদনায় কেঁদে উঠল। তিনি কৃষ্ণার হাত ধরে পাশের একটি চৌকীর উপর অবসন্ন ভাবে বসে পড়লেন। কৃষ্ণা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "পিসিমা, ও পিসিমা, আমার উপর রাগ কোর না। তুমি ছাড়া আমাকে ভালবাসবার এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।"

গুরু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "না রে তোর উপর আমি রাগ করি নি। তুই যদি এ বিয়েতে সুখীই না হোস, তবে আমি কেন এ বিয়ে দোব ? আমি ভাবছি অন্য কথা।"

তাঁর মধুর আশ্বাসে কৃষ্ণার যেন পুনর্জন্ম লাভ হোল। সে বললে, "কি কথা পিসিমা"।

গুরু আঁচল থেকে একখানি চিঠি খুলে নিয়ে কৃষ্ণার হাতে দিয়ে বললেন, "আমার ভাসুরপো অজিত লিখেছে

আমার শ্বশুরের ভিটেমাটি সমস্ত তারা বিক্রী করে দিচ্ছে এইবারে সেবারের মত দুর্গাপুজো করে; পুজোর পর দেশ ছেড়ে একেবারে চলে আসবে। আমায় ডেকেছে এই সেবারের মত নিজের ভিটের পূজা দেখতে, সেই বিধবা হবার পর থেকে আর ত যাই নি, তাই ভাবছিলুম একবার দেখে আসি।"

"বেশ ত পিসিমা, চলনা আমিও তোমার সঙ্গে যাবো" কৃষ্ণা উৎসাহের সঙ্গে বললে। তরুকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বললে, "চুপ করে রইলে যে পিসিমা? আমায় নিয়ে যাবে না?"

"আমি যাবো কি তাই এখনও ঠিক করি নি তা তোকে নেবো কি রে?" তরু বললেন। "আচ্ছা আমি যেতে চাই না; তুমি একলাই যাও" বলে কৃষ্ণা রাগ করে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল।

তরু হেসে তার মুখখানি জোর করে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "না কৃষ্ণা রাগের কথা নয়; আচ্ছা বল্ দিকি, আমি মরে গেলে. তুই কার কাছে তখন থাকবি?"

কৃষ্ণার চোখ ছল ছল করে উঠল। সে বললে, "তোমার ওই এক কথা ছাড়া আর কি কোনও কথা নেই?"

"না" তরু গম্ভীর ভাবে বললেন, "এক মাসের মেয়ে তোকে নিজে হাতে মাইয়ে খাইয়ে এত বড়টি করেছি এখন তোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার অন্য কোনও কথা, কোনও চিন্তা নেই।"

কৃষ্ণা মুহূর্ত্তের জন্য তরুর পানে চেয়ে আবার মুখ নীচু করে বললে, "তা হলে শোন পিসিমা, আমার পাশ করা হয়ে গেলে, আমি চাকরী কোরবো। তারপর সত্যিই যদি তুমি কোনও দিন আমায় একলা ফেলে পালিয়ে যাও, তখন আমি শঙ্কর ও দিদির কাছে থাকবো।"

"পারবি ত ঠিক কৃষ্ণা;" তরু স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, "হর্ষার সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবি ত?"

"ঠিক পারবো পিসিমা;" কৃষ্ণা দৃঢ়স্বরে বললে; "দিদি আমায় বড্ড ভালোবাসে; তুমি ত জানোই পিসিমা।"

তরু কিছু না বলে নীরবে কৃষ্ণার মাথাটি নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

মাথার উপর পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে, আকাশবাণীতে খবর পরিবেশন করছে, সুবৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে স্থাণুর মত বসে আছে রঞ্জয়। সে জাগ্রত কি সুপ্ত হঠাৎ দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই। সেই সময় কৃষ্ণা সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে হতভম্ব হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে গিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জয় ধড়মড় করে সোফার উপর উঠে সোজা হয়ে বসল। সামনে কৃষ্ণাকে দেখে মৃদু কণ্ঠে বসতে অনুরোধ করল। আসন গ্রহণ করে কৃষ্ণা বললে, "এরা কি বাড়ীতে নেই? দিদির না আজ দেশে যাবার কথা ছিল? তার চিঠি পেয়ে আমি ছুটে চলে এলুম।"

"কিছুক্ষণ হোল তারা চলে গেছে" রঞ্জয় বললে।

"চলে গেছে! দিদির সঙ্গে আমার দেখা হোল না?" কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর ছিঁড়ে উঠল।

"তুমি একটু বেলা থাকতে এলে না কেন?" রঞ্জয় কোমল স্বরে বললে।

"সন্ধ্যার ডাকে চিঠি পেয়েই আমি চলে এসেছি"— কৃষ্ণা বললে, "আমার কথা দিদি, কিছু বলেছিল?"

"হাঁ তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল" রঞ্জয় বললে, "শেষে গাড়ীর সময় হয়ে যায় দেখে চলে গেল। তোমার সঙ্গে দেখা হোল না বলে যাবার সময় খুব কাঁদছিল।"

"আমি যাই কোথাও, যদি দেখা হয়" কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "টাইম টেবলটা আমায় একটু বুঝিয়ে দেবে তুমি"—

রঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"এখন তুমি কোথায় যাবে? গেলে কি আর দেখতে পাবে?—এই দেখ আটটা বেজেছে; দার্জিলিং মেল ছেড়ে দিয়েছে। বৌদি দার্জিলিং মেলে গেছেন।"

তার ছলছল মুখের দিকে চেয়ে রঞ্জয়ের ভারী মায়া হোল। নিকটে গিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে একবার তার নাম ধরে ডেকে একটা সান্ত্বনার কথা বলার জন্য তার মন ব্যাকুল

হয়ে উঠল। সাত পাঁচ ভেবে ধীরে ধীরে সে কৃষ্ণার নিকটবর্তী হয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, "কৃষ্ণা বোস; চলে যাবার সময় দেখা না হলে দুঃখ হয় সত্যি কিন্তু দুঃখ করে কি করবে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, বৌদি নিবিঘ্নে বাড়ী পৌঁছে যাক্।"

কৃষ্ণা বসল। রঞ্জয় তার পাশে বসল। দুজনে পাশাপাশি বসে আছে; দুজনের হৃদয়ই গভীর চিন্তাকুল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে; বাদাম গাছের ডালে বসে বাদুর আধখাওয়া বাদাম ফেলে দিচ্ছে টুপ টাপ করে, সেদিকে কারো খেয়াল নেই। তারা নিজ নিজ চিন্তায় গভীর ভাবে মগ্ন রয়েছে। এক সময় রঞ্জয় বললে, "তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল কৃষ্ণা, এখন শুনবে কি?"

কৃষ্ণা তার দিকে তাকিয়ে বললে, "কি বল?"

রঞ্জয় নিজের কালো লম্বা চুলগুলির মধ্যে একবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললে, "দেখ, পিসিমা এবং আমার মামা মামীমার ইচ্ছা, এই আষাঢ় মাসেই আমাদের বিয়ে হয়; কিন্তু তোমার যে সামনে এম-এ, পরীক্ষা তাতে কিছু অসুবিধা হবে না?"

পলকের মধ্যে কৃষ্ণার মুখ পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল; সে কি বলতে গেল, কিন্তু শুধু ঠোঁট দুটো তার কেঁপে উঠল, কোনও কথা প্রকাশ হোল না। রঞ্জয়ের মনে তখন সন্দেহের দ্বন্দ্ব হচ্ছে। তাই সে কৃষ্ণার ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারল না। আপন আবেগে সে আবার বললে, – "আমার মনে হয় তুমি সব দিক সামলে করে নিতে পারবে, কি বলো কৃষ্ণা?"

হঠাৎ দূর থেকে বজ্র পতনের শব্দের মত কৃষ্ণার ভীষণ কণ্ঠ শোনা গেল। সে বললে, —"তুমি কিছু মনে কোরো না এ বিয়ে আমাদের হবে না।"

"হবে না?" রঞ্জয়ের কণ্ঠস্বর গভীর ভাবে কেঁপে উঠল। সে বললে, —"কেন হবে না, কৃষ্ণা?"

মনের এই বিপর্যস্ত অবস্থায়, এ আলোচনা কৃষ্ণার কাছে বড়ই ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল। তথাপি সে দায়মুক্ত হবার জন্য নিজেকে প্রাণপণে কঠিন করে বললে, --"আমার পক্ষে বাধা আছে।"

"হায় রে হৃদয়; তোমার সঞ্চয়; দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়" রঞ্জয়ের আশাসুখ হৃদয় গভীর ভাবে আর্তনাদ করে উঠল। এতদিনের এত অমূল্য সঞ্চয় এমনি ভাবে মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল? হায়, এরি নাম কি প্রেম? শুধু কল্পনার রংএ রামধনুর বিকাশ। শূন্যে যার বিস্তৃতি, আবার শূন্যেই বিলয়?

বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে আবার বললে,— "কেন কৃষ্ণা, আমি কি তোমার অযোগ্য?"

হঠাৎ কৃষ্ণার কি হোল কে জানে? সে ঝড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমার মন এখন মোটেই ভালো নেই রঞ্জয়, তাই এসব আলোচনা মোটে ভালো লাগছে না"—বলেই সে ঝড়ের মত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে তখন বর্ষণ হচ্ছিল, প্রবল ধারায়; ক্ষণে ক্ষণে গর্জন করছিল বাজ; তার মধ্যে দিয়ে একাকিনী এক নারী বেরিয়ে গেল। আর ঘরের মধ্যে বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে এক পুরুষ বসে রইল। তার চোখে তখন জ্বলছিল আহত পৌরুষের দৃপ্ত বহ্নি; নিজের অন্তরে সে প্রাণপণ ভাবে ভাইতে চেষ্টা করে গভীর আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছিল। হায়, এ সময় যদি সুধা কাছে থাকতো! ছোট বোনটীর মত একবার যদি দাদা বলে পাশে এসে বসতো? কিন্তু না, রঞ্জয়ের পাশে সেও আর আসবে না।

পরের দিন দুপুর বেলা তরু একখানি পত্র পেলেন বাহকের হাতে, তাতে রঞ্জয়ের মামা জানিয়েছেন পাত্র এই বিবাহ কোরবে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা শঙ্কর ও কৃষ্ণা শঙ্করের বাগানে একটী করবী গাছতলায় বসেছিল। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে, আকাশে চাঁদ উঠেছে দূরে কোনও বাড়ীর আড়ালের থেকে তার অনভিস্ফুট জ্যোৎস্না আবছা ভাবে এসে পড়েছে মাঠে ঘাসের উপর, হালকে রংয়ের করবী ফুল বাতাসে দোলা খেয়ে মাঝে মাঝে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে তাদের গায়ে মাথায়। কৃষ্ণা প্রায় প্রত্যহই কলেজের ফেরৎ এখানে আসে। শঙ্কর মিল থেকে ফিরলে তাকে চা খাইয়ে, নিজে খেয়ে একটু সে গল্প করে তারপর নিজের বাড়ী ফিরে যায়। সুধাই তাকে চিঠিতে অনুরোধ

জানিয়েছে এই কাজটী করার জন্যে। এক সময় শঙ্কর বললে,—"হরুর আর এখানে আসে না; কি যে তার হোল বুঝতে পারি না—তুমি কিছু জানো কৃষ্ণা?"

কৃষ্ণা বেমালুম মিথ্যা কথা বলল। "না ত, আমি কিছু জানিনা ত? কেন কি হয়েছে?"

"কি জানি কেমন যেন নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে" শঙ্কর বললে,—"আমার সঙ্গে আর বেশী মেশে না।"

"তুমি কি দোষ করলে তার কাছে?" কৃষ্ণা বললে; ব্যথিত স্বরে শঙ্কর বললে, "কি জানি, কিছু বুঝতে পারছি না"।

"থাক গে; যার যা খুশী করুক তোমার কি?" তাচ্ছিল্য ভাবে কৃষ্ণা বললে,—"আচ্ছা শঙ্কর দিদির আসতে আর কত দেরী আছে?"

"তা আরও মাস তিনেক ত নিশ্চয়?" শঙ্কর বললে, কিন্তু তুমি যে রোজ এখানে এসে সময় নষ্ট কর, তাতে তোমার কষ্ট বা কোনও অসুবিধা হয়না, কৃষ্ণা?"

"বারে কষ্ট আবার কিসের?" কৃষ্ণা হেসে বললে।

"আচ্ছা কষ্ট নাইবা হোল," শঙ্কর বললে, "তাই বলে আমার খাবার দেবার জন্যে রোজ তোমার এত দূরে আসার কোনও গ্লানি হয় কি?"

"দিদি যে আমায় চিঠিতে লিখেছে," কৃষ্ণা বললে, "তা না হলে আমি সখ করে আসি নাকি?"

"তুমি রোজ এস, তাতে আমারই লাভ," শঙ্কর বললে, "কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হয় তোমার বোধহয় এতে কষ্ট হয়।"

"না শঙ্কর," কৃষ্ণা দৃঢ়স্বরে বললে,—"আমার কষ্ট মোটে হয় না। বরং ভালো লাগে।"

"সত্যি বলছো কৃষ্ণা?" শঙ্কর বললে, "তোমার ভালো লাগে?"

"হ্যাঁ শঙ্কর আমার ভালো লাগে" কৃষ্ণা বললে; আমার বড্ড ইচ্ছে করে তোমার কিছু কাজ করে দিতে।"

"কেন তোমার এরকম অদ্ভুত ইচ্ছে করে কৃষ্ণা?" শঙ্কর বললে।

"জানি না" কৃষ্ণা বললে,—"যতক্ষণ তোমার এখানে থাকি মনটা বেশ ভালো লাগে তারপর বাড়ী গেলেই কেমন যেন অলস হয়ে যায়। কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করে না।"

"তোমায় সত্যি করে বলছি কৃষ্ণা," শঙ্কর বললে, "আমারও বেশ ভালো লাগে, তুমি যতক্ষণ কাছে থাকো।"

"আমার মনে হয় শঙ্কর" কৃষ্ণা বললে,—"আমরা ছোট বেলার বন্ধু কিনা তাই।"

"ঠিক বলেছ" শঙ্কর বললে "ছোটবেলায় আমাদের গভীর বন্ধুত্ব ছিল মনে আছে কৃষ্ণা?"

"খুব আছে," কৃষ্ণা বললে, "তুমি আমার একটা ছোট বেলায় টর্চ দিয়েছিলে মনে আছে শঙ্কর? সেটা আমার এখনও সচল অবস্থায় আছে।"

"সত্যি? পাগল আর কাকে বলে?" শঙ্কর হেসে বললে, "তোমায় সত্যি করে বলছি কৃষ্ণা, এই সব বাড়ী ঘরে আমার যেন ঠিক মন বসে না। সব সময় মনে হয় কোথা থেকে কে যেন আমায় ডাকছে, শুধু ডাকছে; ইচ্ছা করে চলে যাই ছুটে—কিন্তু কোথা থেকে যে কে ডাকে তার কোনও কূল কিনারা পাই না।"

"ওসব তোমার মনের উদ্ভট খেয়াল শঙ্কর," কৃষ্ণা বললে, "সেইজন্যই ত আমি রোজ আসি, আমি ত তোমায় জানি—দেখ শঙ্কর, ওসব মনের পাগলামীকে কখনও প্রশ্রয় দিও না।"

"বন্ধুর কথা কখনও অমান্য করা যায়।" শঙ্কর হেসে বললে "একটা গান গাও না কৃষ্ণা?"

"গান?" কৃষ্ণা অনিচ্ছা প্রকাশ করে বললে, "গান ত অনেক শুনেছ; দিদি বড্ড গান ভালো জানে, গাইতে গেলেই আমার ওর কথা মনে পড়ে যায়।"

"তার মানে ত?" শঙ্কর বললে, "তোমার দিদি নেই বলে আমি গান শুনবো না, এ তোমার কেমন ধারা লজিক?"

"তার চেয়ে শঙ্কর" কৃষ্ণা অনুনয় করে বললে, "তুমি জয়দেবের গীতিগোবিন্দ পড়ো, আমি শুনি। গীত গোবিন্দ শুনতে আমার বড় ভালো লাগে। মনে হয় আমার, এখনও যেন বৃন্দাবনে যমুনার ধারে নীল নিকুঞ্জে বসে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন; আর সেই সুর শুনে শ্রীরাধা ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসছেন যমুনার তীরে। আকাশে ঘন

ঘন মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, প্রবল বেগে বারিপাত হচ্ছে ; আর সঙ্গে সঙ্গে বইছে দুরন্ত ঝড়ের হাওয়া। গভীর অন্ধকারে পথ ঘাট আচ্ছন্ন। তার মধ্যে দিয়ে দুরু দুরু বক্ষে শ্রীরাধা চলেছেন ; অনভ্যস্ত পায়ে পথে পথে তাঁর বিঘ্ন উপস্থিত হচ্ছে ; দুরন্ত বাতাসে অঙ্গের নীলাম্বরীর আঁচল খসে পড়ছে ; তাকে সামলে নিয়ে বুকের মাঝখানে অলঙ্কারের রিনিঝিনি নিক্কণ বেজে উঠছে। ভয়ে শ্রীরাধা অধীর হয়ে উঠছেন ; এই বুঝি কোনও পথিক শুনতে পেল সেই ধ্বনি, জানতে পারল তাঁর গোপন অভিসার ; ছুটে এল বুঝি সঙ্গে সঙ্গে, গৃহের উদ্যত শাসন সম্ভার। আর বুঝি যাওয়া হোল না নীলকুঞ্জে, আর বুঝি দেখা হোল না তাঁর প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে! হায় হায়, তাহলে শ্রীরাধার পক্ষে প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব। আর শ্রীকৃষ্ণ ? যতের পর যত কেটে যাবে, বাঁশীর শেষ রাগিণী সুর বনান্তরে যখন কেঁপে কেঁপে মিলে যাবে, তখনও অভিমানিনী রাধার দেখা না পেয়ে, তাঁর মনের অবস্থা কেমন ধারা হবে ? সে কথা ভাবতেও শ্রীরাধার পদ্মচক্ষু ছল ছল করে ওঠে ; মাথার উপর দারুণ দুর্যোগ ; পায়ের নীচে, সর্বনাশা পিছল পথ, তার উপর অন্ধতে সৃষ্টি আচ্ছন্ন ; এই অবস্থায় শ্রীরাধার পথ চলা কত ক্ষণে শেষ হবে ? ওদিকে আকাশের দারুণ মেঘ গর্জনকে ছাপিয়ে কেঁদে কেঁদে ভেসে আসছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুল বাঁশীর সুর। সে সুরের মধ্যে দিয়ে একটী মাত্র শব্দ শ্রীরাধার শ্রবনের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয়কে আকুল করে তুলেছে, রাধা, রাধা, রাধা, সুর আহ্বান করছে প্রাণকে, কৃষ্ণ ডাকছে রাধাকে, কাজেই সমস্ত বিশ্ব চরাচর, শ্রীরাধাময় শ্রীকৃষ্ণময়।"

কৃষ্ণা চুপ করলে শঙ্কর মৃদু কণ্ঠে বললেন, "বাঃ কৃষ্ণা, তারী সুন্দর তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো ত।"

কুণ্ঠিত স্বরে কৃষ্ণা বললে, "না, শঙ্কর, তোমার কাছে কিছুই শিখতে পারি নি।"

"থাক আর বিনয়ে দরকার নেই" শঙ্কর বললে "চল ঘরে যাই।"

"আজ আর ঘরে যাবো না শঙ্কর" কৃষ্ণা বললে "রাত্রি হয়ে যাচ্ছে এইবার বাড়ী যাই, পিসিমা আবার ভাববেন ?"

"আচ্ছা এস" শঙ্কর বললে, আমার গাড়ীটা নিয়ে যাও।

কৃষ্ণা সম্মতি জানিয়ে বাসান থেকে বেরিয়ে এল।

শঙ্কর ভিতরে গিয়ে তার প্রিয় গীতগোবিন্দ খানা খুলে নিয়ে বসল। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠে ছন্দ মাধুর্য উদ্বেলিত হয়ে উঠল ; সে সেই মহা রসসমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হোল।

—"রতি সুখ সারে, গতমভিসারে
মদন মনোহর বেশম।
ন কুরু নিতম্বিনি, গমন বিলম্বনমনুসর
তং হৃদয়েশম।
ধীর সমীরে যমুনা তীরে,
বসতি বনে বনমালী।
নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
চল মনুতে মনুতে তনু-সঙ্গত পবন—
চলিত মপি রেণুম্।
ধীর সমীরে যমুনা তীরে
বসতি বনে বনমালী।
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব
কেলিষু লোলম্।
চল সখী কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল—
নিচোলম্
ধীর সমীরে যমুনা তীরে
বসতি বনে বনমালী"—

(ক্রমশঃ)

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

মহিলা চিত্র প্রদর্শনী :

ফেব্রুয়ারীর শেষে কলিকাতা এসপ্লানেড ইষ্টে সরকারী এক শিল্প কুটীরে কেবল মেয়েদের অঙ্কিত তেলরং ও জল-রংএর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভারতের নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় মহিলারা প্রদর্শনীর জন্য চিত্র দিয়াছিলেন। কয়েকজন বিদেশিনীর অঙ্কিত চিত্রও ছিল। স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় চিত্রের উৎকর্ষতা, অঙ্কন-পদ্ধতির সুন্দরতা, রংএর বাহারের উল্লেখ করিয়া বলেন, মেয়েরাই এ সুকুমার শিল্পদ্বারা তাহাদের সুকুমার বৃত্তি ও উপার্জনের পথ উন্মেষ করিয়া জাতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায় গভর্ণরের স্বর্ণ-পদক পান এবং তৈল চিত্রের জন্য শ্রীমতী সুমিতা দে রৌপ্যপদক পান।

শ্রীমতী বাসন্তী সেন, শ্রীমতী ইলা দেব, শ্রীমতী চিত্রা গুহ, শ্রীমতী নমিতা ঘোষাল ভারতীয় চিত্রের জন্য স্বর্ণপদক শ্রীমতী প্রমিলা ভাল্লা ও জলরঙের জন্য রৌপ্যপদক পান।

আধুনিক চিত্র অঙ্কনের জন্য প্রকাশ কাউর নরউলা স্বর্ণপদক পান।

নূতন মহিলা ডি. ফিল :

ডাঃ শ্রীমতী রমা ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ডি. ফিল উপাধি পাইলেন।

লীলা পুরস্কার :

১৯৫৮ সালের "লীলা পুরস্কার" শ্রীমতী লীলা মজুমদারকে শিশু-সাহিত্য রচনায় কৃতিত্বের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রদান করা হইয়াছে। ১৫ বৎসর যাবৎ এই পুরস্কার মহিলা লেখিকাদের জন্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর প্রদান করা হয়। পূর্ব্বে এই পুরস্কার পাইয়াছিল, হেমলতা ঠাকুর, দীতা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, আশালতা সিংহ, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, আশাপূর্ণা দেবী, চিত্রিতা গুহ।

ভারতের বাহিরে শিক্ষারত বঙ্গরমণী :

শ্রীমতী শিউলি কর, এম বি, ভারত সরকারের বৃত্তি পাইয়া এডিনবরা ও লণ্ডনে এফ. আর. সি. এস তথা গবেষণা করিতেছেন।

শ্রীমতী পূর্ণিমা ব্যানার্জী এম এস. সি. (এডুকেশন) বি-টি, এম্-এড (প্যানসেলভিয়া, ইউ. এস. এ) শিক্ষাদান কর্ম্মের বিষয় গবেষণা করিতেছেন।

অ-বাঙ্গালী মহিলার বাঙ্গলা পরীক্ষা :

২রা মার্চ নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি বোম্বাই ও কলিকাতায় আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা গ্রহণ করে। এই আদ্য পরীক্ষায় কলিকাতা কেন্দ্র হইতে শ্রীমতী শান্তা প্যাটেল বি. এ ও শ্রীমতী পল্লবী ঘোষতা বি. এ ৮৫ ও ৮৪ নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষক ছিলেন শ্রীমতী সুধা সেন ডিপ্ এডু (লণ্ডন) এবং শ্রীমতী বিজয়া সেনগুপ্ত এম-এ, বি-টি।

বোম্বাই কেন্দ্র হইতে কুমারী প্রমোদা সা মধ্য, পুষ্প গাড়ুড়িয়া ১ম বিভাগে, কুমুদিনী হরলাল নাভেরকর ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শকুন্তলা ভি. সামন্ত ও মালিনী কে পাই বোম্বাই হইতে ২য় বিভাগে এবং ইন্দ্রা সোমী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি পরীক্ষক ছিলেন। পাঠ্য-পুস্তক ছিল রবীন্দ্র-নাথের কথা ও কাহিনী এবং গল্পগুচ্ছ,বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী শরৎচন্দ্রের বিন্দুর ছেলে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তনে প্রাপ্ত মহিলা ডি. ফিল্ :

১৯৫৭ সালে আর্টসএ—পুষ্প নিয়োগী, ইন্দ্রা মিত্র, ডি ফিল্ উপাধি পাইয়াছেন।

বিজ্ঞানে—সুপ্রিয় রায়, মায়া গুহ, শোভনা ধর, উষা রক্ষিত ডি. ফিল্ উপাধিতে ভূষিত হন।

ডাঃ মিসেস্ মারগারেট মার্শেল :

মিসেস্ মারগারেট মার্শেল সম্প্রতি পি, ই এন, ক্লাবে "Emersion as a creative sceptic" লেখক বলিয়া তাহার সমালোচনা করেন। তিনি তাঁহার স্বামী বডরিক মার্শেল ভারতে প্রায় ১ বৎসর থাকিয়া ইংরাজি সাহিত্যের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন।

———

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

ত্রয়োত্রিংশ বার্ষিক উৎসব

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ রবিবার অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় সমিতির ত্রয়োত্রিংশ বার্ষিক উৎসবের ১ম দিনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার মেয়র ডাঃ শ্রীগুণা সেন প্রধান অতিথি রূপে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। "বার্ষিক সরোজ নলিনী বক্তৃতা" করেন শ্রীমতী বাসনা সেন। ব্রতচারী সঙ্গীত সহযোগে মাননীয় অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও মাল্যভূষিত করা হয়। সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীনিবাসন চন্দ্র ঘোষ উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মণিকা গুপ্তা সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠের মাধ্যমে সমিতির বহুবিধ কর্ম্মধারার সহিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাঃ শ্রীগুণা সেন তাঁহার ভাষণে বলেন, তিনি বক্তা নন, তাই মনের ভাব কথায় যথাযথ ব্যক্ত করিতে তিনি অক্ষম। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ গুরুসদয় দত্তকে স্মরণ করিয়া বক্তা বলেন, তিনি ছিলেন কর্ম্ম পাগল এবং আদর্শ প্রেমিক। পত্নীর অকাল বিয়োগ গুরুসদয় দত্তের কর্ম্মপ্রবণতাকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতি অক্ষয় করিবার মানসে ৩২ বৎসর পূর্ব্বে এক যুগসন্ধিক্ষণে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি নামীয় সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানটির বীজ বপণ করেছিলেন। সে দিনের দেশের ও সমাজের অবস্থাকে আজ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কালই ভাল ও মন্দের মান নির্দ্ধারক। দীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল যাবৎ সরোজ নলিনী সমিতি সুনামের সহিত সমাজের মঙ্গলকর কাজ করিয়া আসিতেছে। দেশ ও সমাজের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের যে কত প্রয়োজন ছিল ইহাই তার প্রমাণ। প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করিয়া ডাঃ সেন তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করেন।

বার্ষিক সরোজ নলিনী বক্তৃতায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শ্রীমতী বাসনা সেন বলেন, শিক্ষার সংজ্ঞা বড়ই ব্যাপক, এই স্থানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিগণ শিক্ষা বিষয়ে যে বাণী রাখিয়া গিয়াছেন তাহার উদ্ধৃতি করিয়া শ্রীমতী সেন বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে মানসিক বৃত্তির সম্প্রসারণ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ। প্রাচীন ভারতে স্ত্রী শিক্ষা অবহেলিত হয় নাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ঘোষা, গায়ত্রী, গার্গী, প্রভৃতি কন্যাদের নাম উল্লেখ করেন। অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় নারী সমাজের এক অন্ধকার যুগ দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দিতে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষেদের প্রচেষ্টায় সেই অন্ধকার যুগের কিছুটা অবসান ঘটে। স্বাধীন ভারত সরকার নারী পুরুষের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার সমান করিয়া দেওয়ায় নারী সমাজের আর কোন অভিযোগের কারণ থাকিতে পারে না। নিজেদেরকে তৈরী করিবার ভার নারীসমাজের উপরই ন্যস্ত, শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই ভারতীয় নারীকে চলিতে হইবে; এবং সেই আদর্শ হইতেছে—"Renunciation & Service" ত্যাগ ও সেবা। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা যায় না; ত্যাগ ও সেবা ধর্ম্মের মাধ্যমেই বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে আমাদের শিক্ষা নিতে হইবে। পশ্চিম দেশসমূহ ঘুরিয়া আসিয়াও স্বামিজী ভারতীয় গৃহ আদর্শের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে চারু ও কারু শিল্পের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। দেশ, জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের ঐতিহ্যের পরিচায়ক হইতেছে শিল্প। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ গুরুসদয় দত্ত শিল্পের অবদান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি শিক্ষার যাবাবাহিক পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী শিল্পের সংগ্রহশালা প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যের পরিচয় দিতেছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী সোমবার অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় বার্ষিক উৎসবের দ্বিতীয় দিনের "পুরস্কার বিতরণ" অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প মন্ত্রী শ্রীকৃপতি মজুমদার এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শ্রী কে, পি, বৈতান প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত এবং শ্রীমতী বৈতান পুরস্কার বিতরণ করেন। সমিতির সভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং সংক্ষেপে সমিতির কার্য্যাবলি অবগত করান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীবৈতান দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির উল্লেখ করিয়া তাহার সমাধানে নারীসমাজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভাপতি শ্রীমজুমদার বাংলা দেশের নারী জাগরণের ৪০ বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করিয়া বলেন, নারী-সমাজই প্রকৃতপক্ষে গৃহের ও দেশের চালক। মাতারূপে, ভগ্নীরূপে, জায়ারূপে বিভিন্ন পর্য্যায়ে নারীই পুরুষকে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। এই নারী সমাজ যদি সচেতন হন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জাগরূক থাকেন তাহা হইলে দেশের সমস্যা সমাধান করা অনেক সহজ হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩টায় শ্রীমতী জহুরি খান, এম্, এস্, এর সভানেত্রীত্বে "মহিলা সমিতি প্রতিনিধি সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। ২০টি মহিলা সমিতির প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সমিতির কাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ডিটিশান অব ইউথ্ কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগ প্রোজেক্টর এবং পরিচালক পাঠাইয়া এই প্রদর্শন সার্থকমণ্ডিত করেন। এই বিভাগদ্বয়কে তাঁহাদের এই সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য সরোজ নলিনী সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।

শিল্প প্রদর্শনী

বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সমিতি ভবনে এক শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয় এবং মফস্বলের ২০টি মহিলা সমিতি এই শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদান করে। ডাঙ্গাপাড়া মহিলা সমিতি উৎকৃষ্ট সেলাই কাজের জন্য এবং সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের ওঁাত বিভাগ উৎকৃষ্ট বয়নের জন্য এবং কাঁচড়াপাড়া মহিলা সমিতি সর্ব্ববিষয়ে কাজের উৎকর্ষতার জন্য পুরস্কৃত হয়।

মহিলা সমিতির বার্ষিক শিল্প পরীক্ষা

১৯৪৭ সনের বার্ষিক শিল্প পরীক্ষায় ২০টি মহিলা সমিতি হইতে জুনিয়ার কোর্সে ৯৯ ও সিনিয়ার কোর্সে ৬৯ জন পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে জুনিয়ার ৪৩ ও সিনিয়ার ১৮ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। সিনিয়ার কোর্স পরীক্ষায় ডাঙ্গাপাড়া মহিলা সমিতি হইতে শ্রীমতী আরতি কুণ্ডু প্রথম এবং কাটিহার মহিলা সমিতি হইতে শ্রীমতী বাণী ব্যানার্জী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। জুনিয়ার কোর্স পরীক্ষায় বৈহাটী রেলওয়ে সমিতি হইতে শ্রীমতী যমা পাল ও শ্রীমতী মল্লিকা পাল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

নতুন মহিলা সমিতি

সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সহিত বর্ত্তমান বৎসরে ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত মহিলা সমিতি কয়টি যুক্ত হইয়াছে:

বাইনান মহিলা সমিতি, হাওড়া।
আজাদগড় মহিলা সমিতি, যাদবপুর।
মনসাপোতা মহিলা সমিতি, শিমুরালী, নদীয়া।
লালপুর মহিলা সমিতি, চাকদহ, নদীয়া।

বঙ্গলক্ষ্মী

৩৩শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৬৫ [৩য় সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিস্মরণ

শ্রীপুষ্প দেবী

দুঃখের পরে দুঃখ যখন আসিয়া আঘাত করে,
তখন কোথায় দয়াময় হরি ডাকি যে কাতর স্বরে
কখনো দেখি কি চেয়ে!
দয়াল ঠাকুর চেয়ে মুখপানে রয়ে আঁখি ধারা বেয়ে।
বাহির দুয়ারে কপাট আমার শুনেছি কি ডাক তাঁর,
দুঃখের দিনে শুনিতে কি পাই অভয় বাণীটি তাঁর।
বন্ধ দুয়ারে হানি করাঘাত বলে সে খোলোগো দ্বার,
আরাধ্য জন প্রিয়তম ধন তবু সাধে বার বার।
নাহি অভিমান নাহি প্রতিদান অধরে মধুর হাসি,
সেই সুধাকর অপূর্ব্ব আঁখি বলে শুধু ভালোবাসি।
রোগের দিনেতে বৈদ্যের বেশে তবু সে দয়াল আসে,
শোকের মাঝেতে নিদ্রার রূপে তাঁরি সান্ত্বনা ভাসে।
নিরাশায় আসে ভরসা হইয়া সূতিকা গৃহেতে মা,
শৈশবে হয় ধাত্রী রূপিনী নাহি যাঁর তুলনা।
কৈশোরে হয় বন্ধু রূপেতে সুবল সুদাম ভাই,
যৌবনে প্রিয় প্রিয়া সঙ্গিনী হইয়া তাঁরেই পাই।
প্রৌঢ় কালেতে জননী হইয়া তনয়া রূপে সে আসে,
মৃত্যু কালেতে বিশ্রাম রূপে শান্তিময় যে হাসে।
এই জীবনের অকূল পাথারে তুমিই সবার তরী,
তবু দিবারাতি সবারে পাইয়া তোমারেই ভুলি হরি।

———

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

শ্রীরমা দে

১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর ঘার উদ্ঘাটন করা হয়। দেশের স্বাস্থ্য, অর্থ, সমাজ ব্যবস্থা, আহার বাসস্থান পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির উন্নতি কল্পে ভারত সরকার ঐ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করেন। সে পরিকল্পনার কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাই পুনরায় দেশের সব রকম সমস্যার সমাধানের জন্য, এ বছরের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর প্রবর্ত্তন করছেন। এ পরিকল্পনাটির ব্যয় বরাদ্দ স্থির করা হয় প্রায় ৪৮০০ কোটি টাকারও বেশি। প্রত্যেক রাজ্যে এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা হবে এবং দেশের উন্নতির জন্য একে চালুও করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্বোধন করেন রাজ্যের রাজ্যপাল।

এখন একটি কথা জানার আছে। এরূপ পরিকল্পনা কেন প্রবর্ত্তন করা হল তার একটি ইতিহাসও আছে। আমাদের দেশ সুজলা সুফলা। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগে পর্য্যন্ত বণিকজাতি ইংরেজ এ দেশের শাসক ছিল। তাদের শাসনের ও স্বার্থের জন্য দেশের অর্থ ভাণ্ডার শূন্য হয়। যখন ভারতে স্বাধীনতা এল তখন দেখা গেল দেশে আহার, বাসস্থান, পরিচ্ছদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, শিক্ষা বিপর্য্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। তাই দেশের জনগণের জীবনযাত্রাকে বাঁচাবার জন্য ও উন্নত করবার প্রয়োজন বোধেও ভারত সরকার বোধ করেন যে দেশে কৃষি, সেচ ব্যবস্থা, শিল্প, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, সমাজ ব্যবস্থার পুনরুত্থান হওয়া দরকার। দেশের মাটী জলে দেশের দারিদ্রে আবার দেশকে সুজলা সুফলা করে তোলা যাবে এ কথাও সরকার বোধ করেন। তাই ১৯৫১ সালে সর্ব্ব উন্নতির ঘার খোলার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত বিষয়গুলোর উন্নতি কল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি স্থির করেন এবং মোট ছ হাজার কোটি টাকার উপর ব্যয় বরাদ্দও করেন। আজ প্রথম পাঁচশালার ফলস্বরূপ দেশের জাতীয় আয় শতকরা প্রায় আঠার ভাগ বেড়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কৃষি, জল সেচ ব্যবস্থা শিল্প শিক্ষা, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। জন কল্যাণ হিসেবে হাসপাতাল নিরক্ষরের শিক্ষালয়, ক্লাব, পাঠাগার, আমোদ প্রমোদ ব্যবস্থা, শিল্প হিসেবে চিত্তরঞ্জন লোকোমটিভ, সিন্ধ্রী ফার্টিলাইজার, পেরাম্বুর কোচ ফ্যাক্টারীর ইত্যাদির সেচ ব্যবস্থা হিসেবে, দামোদর ভ্যালী করপরেশন, ইত্যাদির প্রবর্ত্তন ঘটেছে।

কিন্তু শুধু ঐ সমস্ত শিল্প, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হলেই চলবে না। দেশের লোকের মনেরও উন্নতি হওয়া দরকার। আমাদের ভারত গ্রাম সমষ্টি নিয়ে গঠিত। সেই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি হলে দেশের লোকের মনেরও প্রসার ঘটবে। তাই দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধির জন্য,মানুষে মানুষে সকল রকম বৈষম্য হ্রাস করার জন্য ও পল্লীর মাঠ ঘাট, মনের স্বাস্থ্য আমোদ আহ্লাদ ইত্যাদির উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব আরোপের জন্য এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত। আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ কৃষক। তাদেরই জীবন যাত্রার উন্নতি কল্পে এ বিরাট পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। আজ গ্রামে গ্রামে জনগণের কর্ম সংস্থানের সুব্যবস্থা করা, প্রত্যেক মানুষের সুস্থ সবল স্বাস্থ্য লাভ করা, প্রত্যেক লোকের মধ্যে আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমতা স্থাপন করা, গ্রামের পূজা-আচার অনুষ্ঠান, আমোদ আহ্লাদ, গ্রামের পথঘাট সংস্কার, পল্লী পরিষ্কার ইত্যাদির অভিযান করা, আহার বাসস্থান পরিচ্ছদের সুব্যবস্থা হওয়া এবং মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য আজ সমাজ ব্যবস্থার সুগঠন হওয়া দরকার। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী সেই সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থার ঘার উদ্ঘাটন করেছে আর দ্বিতীয় পাঁচশালা তাকে প্রসারিত, উন্নত করবে এই আশা।

পশ্চিমবঙ্গে, উপস্থিত সকল রকম উন্নতির মূলে গ্রাম

উন্নয়ন ব্যবস্থা করাই এই দ্বিতীয় পাঁচশালার মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৫০ কোটী টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি, জল সেচ ব্যবস্থা, পথঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতি-গুলো উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে কৃষি ও শ্রমোন্নয়ন, সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি, শিল্প, পরিবহন ও সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ পরিকল্পনা, সল্ট লেকের উন্নয়ন সাধন দুর্গাপুরের শিল্প কারখানা সমূহের প্রতিষ্ঠা, কাঁসাই পরিকল্পনা ইত্যাদির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন এই সব বিষয় বস্তুর উন্নতির জন্য জনগনের সহানুভূতি সহকারের সৎ প্রচেষ্টা একত্র সমবায় হিসাবে থাকা প্রয়োজন। তাই দেশের প্রত্যেক নরনারীর কিশোর কিশোরীর বালক বালিকার মধ্যে এই পরিকল্পনার মূল সূত্রটি প্রচারিত হওয়া দরকার। উন্নতি বোধ শক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতার সহানুভূতি সক্রিয় সাহায্য ও শুভেচ্ছাই এই পরিকল্পনার প্রধান পাথেয়।

পণ-প্রথা

শ্রীসতী দেবী মুখোপাধ্যায়

পণ প্রথা সমাজের বুকে দুষ্টক্ষতের মতই আবহমান-কাল ধরে বিদ্যমান। যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে বরং বেড়ে চলেছে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি এই নিষ্পীড়ন।

যাদের যথেষ্ট খরচ করবার সামর্থ আছে—তাঁরা ৩০।৪০ হাজার টাকা নগদ ১০০ ভরি সোনা সাজানো বাড়ী গাড়ী ইত্যাদি সবই দিতে পারেন। তাঁদের আছে কাজেই তাঁরা দেবেন—এতে আপত্তির কিছু নেই—কিন্তু তাঁদের এই অপর্য্যাপ্ত দেওয়াতে একশ্রেণীর লোকের মনে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিচ্ছে—এবং কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা সেই দাবী মেটাতে গিয়ে নিষ্পেষিত প্রায় হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

পাত্রের পিতার অস্বাভাবিক দাবী দাওয়ার জন্যে আজ ঘরে ঘরে বয়স্থা কুমারী কন্যার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

ভাল উপার্জনক্ষম পাত্রের যে দর—তাতে মধ্যবিত্ত সমাজ পেছিয়ে আসতে বাধ্য। যাঁরা যার যেমন করে পাত্র পক্ষের সমস্ত দাবীদাওয়া পূরণ করেন তাকে মেয়ের ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলা বলা চলে প্রকারান্তরে।

বাংলা দেশের বাইরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত পাত্রের দিকে হাত বাড়ালে তাদের সমস্ত দাবী মিটিয়ে তার ওপরে বরযাত্রীদের যাতায়াত ট্রেনভাড়া এবং যাবতীয় খরচ কন্যার পিতাকেই বহন করতে হয়। তাঁরা কৃপা করে কন্যাকে গ্রহণ করবেন এতে কন্যাপক্ষ কৃতার্থ হয়ে সমস্ত ব্যয় ভার হাসিমুখে বহন করবেন।

প্রত্যেক পিতামাতা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী গহনা ইত্যাদি কন্যাকে দিয়ে থাকেন। কিন্তু দেনা পাওনা নিয়ে বরপক্ষরা মাছের দর করার মত এমন ভাবে ধরপাকড় করে থাকেন যেন পাত্রীর পিতা কন্যাকে বঞ্চিত করায় পাত্র-পক্ষরা কন্যার হয়ে সেই সব আদায় করবার ভার নিয়েছেন।

দেনা পাওনার কথা নিয়ে অনেকে বলেন আপনি তো আর বাইরে কাউকে দিচ্ছেন না—সবই তো আপনার মেয়েরই থাকবে।

যাদের নগদ টাকা নিতে চক্ষু লজ্জায় বাধে তাঁরা অন্য-উপায়ে সেটা পুষিয়ে নেন। মেয়ের বাপের সামর্থের কথা চিন্তা না করে বরের হীরের বোতাম, হীরের আংটি, দামী কম্বলের সেট, সোনা ঘড়ি—ভাল ভাল গয়নের নমুনারী, আরো কত কি! যাদের আকাঙ্ক্ষা আরো বেশী তাঁরা এর ওপর আরো চেয়ে বসেন, এটনী ছেলের অফিস সাজিয়ে দেওয়া এটনীর গাউন তৈরী করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এ

ধরণের আরো বহু রকমের দাবী করে থাকেন। সে সব লিখতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বেড়ে যাবে বলে বিরত থাকলুম।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যেসব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা পাত্রের পিতার দাবী মেটাতে গিয়ে যেসব মেয়েদের হয়ে ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা করেন সমাজের এই কুপ্রথা দূর করে দেবার জন্যে তাঁরাই ভিন্নরূপ ধারণ করেন নিজের ছেলের বিয়ে দেবার সময়। নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার সময় তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল সে সব ভুলে সেই খরচটা ছেলের বিয়ে উসুল করতে চান। কন্যার পিতার অবস্থার কথা কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না।

সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের রুচি আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছুর পরিবর্ত্তন ঘটলেও এই ব্যাপারের দৃষ্টিভংগীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি। যাঁরা নিজেকে শিক্ষিত উদার পরিমার্জ্জিত বলে গর্ব্ব অনুভব করেন তাঁরা যখন নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে চাপ দেন, তখন কি তাঁদের সভ্য সমাজ ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়?

আমরা জ্ঞান হওয়া অবধি সমাজের এই কুপ্রথা দূর করবার কথা শুনে আসছি। বড় বড় সভাতে সকলে এ বিষয়ে বহু নিন্দা করে হয়তো ঘরে ফিরে পুত্রের বিবাহে লম্বা দর্শ করতে বসেন স্ত্রীর সংগে। কাজেই পরবর্ত্তী যুগেও এই প্রথা দূর হবে কিনা বলা শক্ত। যেদিন আইনের সাহায্যে পণপ্রথা সমাজ থেকে দূর হবে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় রইলুম।

অপযশ

শ্রীঅন্নপূর্ণা রায়

(ছোট গল্প)

হাঁ বৌদি তোমার ভাঁড়ার ঘরটা এমন তছনছ করে গেল কে? বলেন দাক্ষায়নী দেবী ভাজের উদ্দেশ্যে। গঙ্গাস্নান সেরে বাটীতে পা দিলেন। ভাজ বড় হলেও চির দিনই ছোট ননদের রসনাকে ভয় করে এসেছেন। বৃহৎ পরিবার। মেয়ে ছেলে বৌ নাতি নাতনী নিয়ে ঘর করা! কে যে কি করে না করে সব সময় বলেও না! বয়স হয়েছে বাত-এ পাদুটীকে বেশ খানিক জবদ করেছে। শীতের সময়ে রোদটুকু উপলব্ধি করা তার আর হলনা। তিনি একটু ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। কি হল ভাই বসু এত চিৎকার করছিস কেনরে?

না করে উপায় কি? একটু গোচ করে রাখার যো আছে যত নষ্টের মূল হল তোমার ছোট বৌটি বাপু।

সে কি করলো আহা ছেলে মানুষ। সবে বাপের বাড়ী থেকে ঘর করতে এসেছে। দুর্ণামটীর মুখের উপর বেশ চড়া সুরে বলে যেন দাক্ষায়নী, আহা কিছু জানে না! 'ন্যাকামো'!

ছোট বয়সে কখন যে তার বিয়ে হয় আর কবে যে বিধাতা পুরুষ তার হাতের নোয়াগাছটী কেড়ে নেন্ সেও বহু দিনের স্মৃতির পাতায় মাত্র এক টুকরো রেখা টানা আছে অনেকের মনে। আবার অনেকের নেই। অনেকের কথা বার দিয়ে তাঁর নিজেরই বোধহয় মনে নাও থাকতে পারে। বয়স ১১।১২ মাত্র। সেই থেকে দাক্ষায়নী ছোট বৌদির কাছেই থাকেন তাঁর অতটা দাপট সহ্য আর কেহ করবার মতন ছিলোনা সংসারে। দুর্ণামতী সংসার করেছেন ঐনাম মাত্র, চির দিন অসুস্থতা নিয়ে ব্যস্ত আর কাতর। আজ এটা কাল সেটা পরশু আর একটী নানান্ ধানা রোগ। বিধাতা তাকে ভাগ্যবতী করেছেন অবশ্য কিন্তু সুস্থ দেহটা দিতে কার্পণ্য করেছেন

সেই ওজনে! দুর্গাবতী দেবী একটু ভয়ে ভয়ে বলেন, আহা চুপ করনা কানে গেলে দুঃখ পাবে।

দুর্গাবতীর আর ছোটে বসাটা হলনা উঠে এলেন এবং ছোট ননদএর হাত ধরে বলেন, মধু, তোর ছোট বৌদির কথার ত অবাধ্য হোসনি ভাই? আজ আর চেঁচাস্ নে চুপ কর। একাদশী করে কাল থেকে আছিস্ মুখে জল দে আগে।

সেই সঙ্গে সঙ্গেই হাকারণী বল্লেন, কেন বৌকে মন্দ বলার যো নেই ওরে বাবা ভুলে যাই! তিনি প্রবীরের বৌ আর তোমার পুত্রবধূ। ভাজা, চোরা, কেলা, তছনছ করা, তাঁরই সাজে! সুন্দরী, লেখাপড়া জানা, বড় ঘরের মেয়ে যে! আমরা কে কোথাকার বিধবা পিস্-শাশুড়ী শ্রাদ্ধ কেন কর্ব্বে। বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণের ধারা চোখে নেবে এল। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে নির্ব্বিকার ভাবে বেরাল ছানার গলায় রিবণ বাঁধতে ব্যস্ত। বেড়ালটীও বাঁধতে চায় না শ্যামলীও ছাড়বে না। বেরালটী কোলে নিয়েই ছুটে আসে, মামণি কি হল? পিসীমণি কাঁদছেন কেন? মা কি করব এখন? পিসীমণির মাথায় অভিকলম দেব নাকি? শ্যামলাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নির্ম্মাণ করে বিধাতা পুরুষ স্বাঠান কিন্তু রংএর বেলা সে গৌরাঙ্গী নয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। সরলা বালিকা স্বভাব। শাশুড়ী শ্বশুরের অতিরিক্ত প্রিয়পাত্রি সে। দাক্ষায়ণীর সর্ব্বদা ভয় হয় যে তার অধিকার টুকু এবার গেল। কিন্তু কেন জানা যায় না যে ঐ শ্রেণীর মানুষগুলি নরম কচি মেয়ে যারা আসে, নতুন আশা আনন্দ নিয়ে কত রঙীন কল্পনা নিয়ে স্বপ্ন করা জীবনে অনেক কিছু পাবার আশায় ও দেবার আশায়—কিন্তু? সবটা কি তারা পায় এ জীবনে? সব আশা কি পূর্ণ হয় এ সংসারে? তাদের কতটুকু মর্য্যাদা দেয়! এ জগতে হায় কত প্রাণ নিরাশায় অকালে ঝরে যায়, কে তার খবর রাখে।

তাই মধু ঐ কান্নাকাটী গুলো এবার ছেড়েদে, আমি বাপু আর পারিনা।

তা পার্ব্বে কেন? যত ঐ বৌর ন্যাকামিগুলো ভাল লাগবে। পোড়ারমুখী আমার, না হলে কি মা মরে। মাগো কোথায় গেলে গো মা, কত সাধনের মেয়ে তোমার কি দুর্গতি ভোগ করছে সেটা দেখ মা। কি কহিস্ রে মধু চুপ কর চুপ কর। উত্তর উত্তর বেড়ে চলে। বাদুন ঠাকুরাণী কি সব কাজকর্ম ছেড়ে তামাসা দেখতে চলে আসে শ্যামলী ধীর পদে আসে ও বলে পিসীমা আমি সব করব আপনি চুপ করুন।

থাক বাছা থাক আর অত বরষে কাজ নেই। যা রয় সয় তাই ভাল। যদি বামণীকে সোজা ভেব না। পেটের মধ্যে কার কি আছে সবই জানা আছে তার, হাঁ ভাল চাও ত চুপ করে চলে যাও। দুর্গাবতী কথা কন না।

ভেবে দেখেন যে. চিৎকার ও কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করবে দাক্ষায়ণী কিন্তু তিনি তা পার্ব্বেন না। আজ সকালটা কেটে গেল নানা অশান্তি ও ঝামেলার মাঝ দিয়ে সেটাই দুঃখ তাঁর।

নিরীহ নিরপরাধ মেয়েটী ব্যথা পেল বিনা কারণে অথচ তিনি প্রবীরের মা হয়ে কোন উপায় করতে পারেন না। একমাত্র যিনি এ জগতের মালিক তিনি উপায় করবেন এর বেশী তিনি চিন্তাতে আনতে পারেন না।.....

অফিস্ এর সময় কটা দিন বাদএর কথা এটা। শ্যামলী মাছ ধুতে গিয়ে প্রবীরের গামছায় জল লাগে, সেও এই যা, কি কেলেঙ্কারী কাণ্ডটা না করলে। শ্যামলী অত শত বোঝে না, হাঁ করে থাকে। সে নিজে' সারাদিন রাত্রির মাঝে একটা এমন কাজও কি করে না যে তার প্রশংসা করবে? ঈশ্বর কি তার ভাগ্যে যশ বলতে কিছুই লেখেন নি! আমার বরাত হায়! দিদিরা গিন্নি বান্নি তারা ত বেশ গোচ বাগরা করেই ঘর করে প্রশংসাও হবেই আর একি তার ভাগ্য! প্রবীর তো ছুতোর নাতায় দোষই দেখাতে চেষ্টা করে এদিকে সে লোকের কাছে বড় ভাল! অথচ স্ত্রীর কাছে? দোষই খালি চোখে পড়ে প্রবীরের, যাগগে আর ভাবা যায় না।

কটাবছর তার বিয়ে হয়েছে এর মধ্যে মাত্র মা ছাড়া তার কেউ প্রশংসা করেননি কোন কাজটা ভাল করলেও মন্দ বলা হয়। শ্যামলী কালো তার না আছে রূপ না আছে গুণ, শুনে শুনে তার নিজের উপর ও একটা ধিক্কার ধরে যায়। মানুষ কি শুধু মন্দ হয়। ভাল কি হয় না? সংসারে একমাত্র শাশুড়ী ভাল বাসেন আদর করে বলেন

মা যেন জগদ্ধাত্রি রূপ মুখ চোখ খুশী খুশগঠন। যদি রংটা আর একটু ফর্সা হত সর্বাঙ্গ সুন্দরী।

দাক্ষায়ণীকে দেখে মনের আবেগে বলে ফেলেন যে মেয় ভাই শুধু বৌমা আমার যেন সরস্বতী। দাক্ষায়ণী দেবী গালে হাত দেন অবাক হয়ে বলেন, ওমা তোমার যে এমন ভীমরতি হলো বৌদি তাতে জানি না! বলে একটু হাসির সঙ্গে বলেন, ওমা তোমাদের দেশে বুঝি, সরস্বতী অমন কালো হয়! শ্যামলীর কচিমনে একটা বুড়টির গাম্ভীর্য্য এসে গেছে আগের সে হাসি খুশীভাবটা আর নেই। বিশেষতঃ কটা মাস আগে তার একটি পুত্র-সন্তান অল্পায় আঁতুড়েই কদিন পরে সেই শিশুর মৃত্যু হয়। তাতেও দাক্ষায়ণী দেবী দোষ দেন শ্যামলীর। বলেন ঐ ঝিঙিপনা মেয়ে ছেলেটাকে খেয়েছে। অভাগার আদি অন্ত নাই। দোষ যে কি তাও সে নিজেই জানে না। অপরাধ সে অতি সরল। সংসারের কুটিলতায় সে প্রতি পালিত হয়নি মফঃস্বল সহর নিতার সহিত এখানে ওখানে প্রকৃতির লীলার সঙ্গে খেলা ধুলাতে মাটির সঙ্গে মিশে মানুষ হয়েছে, আছে সেই বুনোভাব, না জানে আড়ম্বর, না জানে সাজ সজ্জার আয়োজন, বোঝে না তার প্রয়োজনই বা কি। প্রবীর ত দিনরাতই বলে মা যে কি বৌ করে দিলেন বাপটা জীবন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে।

ঐ সকল কথাগুলোতে শ্যামলীর অন্তরে ওঠে বেদনার আলোড়ন, তবু সে হাসি মুখেই তা সহ্য করে চলে, দিনের পর দিন। যদিও অন্তরের বেদনা চোখের জলে মুক্তার বিন্দুর মত বার হয়ে আসে কেহ তার খোঁজ রাখে কি? রাখে না। এ জগতে কজন সরলা বধূ জীবনে পায় প্রতিষ্ঠা! নিজের মনে মনে তরকারির ডালাটা নাড়াচাড়া করে গোছ করে সাজিয়ে তোলে, আর আলোচনা করে কটা বছরের।

মা একে নিয়ে আর পারা গেল না। বলি সেন্টা রাখলে কোথায়?

অফিস্ যাবার সময় সবাই একটু মেখে শুনে দেয় এর তাও নেই। কোন শুনই নেই শরীরে! এটা পাই না ওটা পাই না কি যে করি মা; তুমি কোথায় গেল তোমার আদুরে বৌর কাণ্ড দেখে যাও। কিছু ত বলার যো নেই আদরে আদরে মাথাটা খেয়েছ যে!

শ্যামলী কাঠ হয়ে শোনে, কত কটু কথা এরা বলতে পারে তাকে। ঝি, চাকরাণী, ধোবানী, সিলীমা, ধাত্রেয়া! নেহাৎ একটা তুচ্ছ মানুষ! আচ্ছা হলাম না হয় তুচ্ছ কিন্তু মানুষ কি নই! সারাদিন হিলার্ড সময়ও বসে কাটাতে পারে না শ্যামলী কি তার এত অপরাধ? তার সঙ্গীনা মনে হয় যে একটু সুখ্যাতি প্রবীর করুক কিন্তু তাত ৪.৫ বছরের মধ্যেও একফোঁটা এক টুকরা ছিটে ফোঁটাও কানে এল না।

মা এবার আদরের সুরে ডাকেন, কি যে আমার ডাকা যা। কি পেলি কোথায় আমার পুজো সারা হল যে যে।

এত বড় বৃহৎ বাটীতে একমাত্র শাশুড়ী মা ছাড়া আর এমন করে আর কে ডাকতে পারেন। যাই মা বাস্ত হয়ে ছোটে শ্যামলী তোরেই পা ফেলে; একটা গেলাস্ না ঘটী পায়ে লাগে ছিটকে যায়, একটু শব্দ না হয় এমন নয়। দাক্ষায়ণী দেবী খেতে বসেছিলেন উঁকি দেন রান্নাঘর থেকে বলেন কি হল, কি হল, পড়ে গেলে নাকি বৌদির আদুরে বৌ! দুর্গাবতী এবার একটু যেন বিরক্ত পূর্ণ মুখে বলেন, আচ্ছা বধূ বয়স ত হল চল্লিশ পঞ্চাশ যদি কচি বৌটার পেছনে লেগে থাকে বাড়ী সুদ্ধ লোক তাহলে সে কি করতে পারে। ছোট বৌমা কালই বাবার কাছে চলে যাক্। আমি অসুস্থ মানুষ। ছোট বড় যে যেখানে আছে যেচারার দোষ ধরে ত যায় কোথায় বলত? দোষ ত আমি দেখিনা, আর সবাই এতজন ওর অপদস্থ করে? ওর অপরাধটা কি শুনি?

শাশুমূর্ত্তি দেবীর মত রূপ শাশুড়ীর শ্যামলী তাঁকে দেখে কেঁদে ফেলে। কোলে এসে মুখ লুকায়। বলে, মা তাই যাও আমায় বাবার কাছে পাঠিয়ে।

মা মরা, মেয়েটিকে নিজের ছোট মেয়েটির মতনই প্রতিপালিত করেছেন এনে পর্য্যন্ত। আজ তাঁর বড় কষ্ট হয় যে তাঁর গর্ভের সন্তান প্রবীর সেও কটু কথা বলতে কসুর করে না। বৌকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, মা দুঃখ করো না।

সংসারে মানুষের ভাগ্যে যশ না থাকলে, ঐ রকমই হয়। সে যদি হাজার ভাল কাজ করে তবু তার দোষ

ছাড়া আর কেউ শুন দেখবে না যা এসব শাস্ত্রের বচন বহু যুগ বহু দিন বহু বৎসর এই নিয়ম হয়ে আসছে মা। যে লোক ভাল কাজ করে না অথচ তার সুখ্যাতি হয়। আবার যে মানুষ সারাটা জীবনই পরের বহুবিধ কাজে নানা উপকারে লিপ্ত থাকে সে মানুষও পায় না সুখ্যাতি। তাহলেই আর দুঃখ থাকে না। ওঁর ঠাকুরদেবতার, কথা শুনতে সে বড় ভালবাসে শান্তিও পায় মনে, যে ইা যদি ভাগ্যে না থাকলে সত্য যদি পাওয়া যায় না তাহার বদলে পাওয়া যায় অপযশের আবর্জনা।!

যা ফেলে দেন

শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য এম-এ,

ছোট বেলায় পিসীমার কাছে গল্প শুনেছি, তিনি বিয়ের পর প্রথম যখন শ্বশুরবাড়ী বাস করতে গেলেন, তখন বহু লোক আসতেন নূতন বৌকে দেখতে আর আলাপ করতে তাদের কথা পিসীমা প্রায়ই বলতেন কত কথা তাদের আর তাদের সামনে পাথরের থালায় জলখাবার সাজিয়ে দিতে হতো পিসীমাকে…সামনে বসে হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে হোত…আর বলতে হোত… ওটুকু খেয়ে নিন। কতটুকুই বা দিয়েছি। একদিন এসেছেন পিসীমার তাদের বাপের বাড়ীর লোক কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী আর বনেদী ঘর। তাদের বিলাস আর ঐশ্বর্য্যের কথা সমস্ত কলিকাতার লোক জানে। পিসীমা খুব যত্ন করে যাবার সাজালেন রূপোর থালায় অনেক সাধাসাধনার পর একটা করে মিষ্টি নিলেন। তাদের মধ্যে একজন সন্দেশ ভেঙে ভিতরের অংশটুকু খেয়ে বাকী অংশটুকু ফেলে রাখলেন। ওটুকু খেয়ে ফেল শুনে বললেন—"আমার ছোট বেলা থেকে অভ্যেস সন্দেশের ভিতরটুকু খাওয়া।" পিসীমা কথাটা মনে রাখলেন। পুরে তাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গেছেন। পরিবেশক থালায় অনেকগুলি মিষ্টি দিয়ে গেলেন। পিসীমা তার মধ্য থেকে একটা চিনিবুট তুলে নিলেন। তারপর মিষ্টিটা ভেঙে ভিতরের ক্ষীরটুকু মুখে দিলেন। বড় বৌ বললেন "ওটুকু আর খেলনা ভাই খেয়ে নাও," পিসীমা অল্প হেসে বললেন,— "আমার বরাবরের অভ্যেস চিনিবুটের খোলাটা ফেলে দেওয়া। খোলাশুদ্ধ মিষ্টি আমি পারিনা।"

এগুলো এখন গল্প কথা খোসা ফেলা দূরের কথা রসটুকুও এখন ফেলা চলে না। কিন্তু গল্প কথা হলেও এগুলো একদিন সত্যি ছিল আর ঠিক এ ধরণের না হলেও অপচয় আমাদের সংসারে লেগেই আছে। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই কিছু না কিছু অপচয় রোজই হচ্ছে। রাত্রের রান্না ভাত দুটী বেঁচেছে, ও আর কে খাবে? ফেলে দাও। শেষকালে দুটী ভাতের জন্য বাড়ীশুদ্ধ লোক কলেরায় মরবে। না—না রাত্রের তরকারী—বেশী হয়েছে একখানা রুটীর সঙ্গে ভিখারীকে দিয়ে দাও। ইস্ মুড়িটা মিইয়ে গেছে—চেলে যে ভাইবিনে। এ ধরণের কথা রোজই শোনা যায়। এছাড়া বাসী বাটনা, তরকারীর খোসা ভাতের ফেন এ সব তো আছেই। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই এ ধরণের অপচয় বন্ধ করা যায় কিছুটা মনযোগ দিলে নিজেরাই বন্ধ করতে পারেন। সব সময় মনোযোগ দিলেও হয় না। কারণ কী দিয়ে কী হয় জানা না থাকলে অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হয়না —সে কথাই আজ বলব।

প্রথমে ধরুন ভাতের ফেন…আপনারা ফেলে দেন। ওটুকু না ফেললেও চলে সে কথাও জানেন। আন্দাজ মত জল দিয়ে ভাত চড়ালে ফেনটা ভাতের গায়ে গায়ে মরে যায়। আর যদি সে আন্দাজ করতে না পারেন তাহলে ফেনটা বার করে নিন। তারপর ছেঁকে নিয়ে একটু নুন লেবু দিয়ে অল্প গরম খাবারে খেয়ে দেখেছেন

কী? বরফ তো বাড়ীতে আসছে। কলসীর জলে বা কুজোতে না দিয়ে একটা গামলায় রেখে তাতে ঐ কেনের পাত্রটা কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে খেয়ে দেখুন তো কেমন লাগে? রাত্রের ভাত একমুঠো আছে। টাটকা ভাতের সঙ্গে মেশাতে ভয় হচ্ছে। নাই বা মেশালেন। দেখুন তো বাজারের মুড়িতে পেঁয়াজ আদা লঙ্কা আছে কিনা। থাকে তো কুচিয়ে নিয়ে কড়ায় সামান্য ঘি বা তেল বসান। ঐ পেঁয়াজ আদা লঙ্কা কুচি ভেজে নিয়ে তাতে ভাতটা ছেড়ে সামান্য ভাজা ভাজা করে নিন। একটু নুন দিন। বাড়ীতে পাতা দই থাকলে দিতে পারেন। একটু চিনি দিন তাতে। কৌটা খুলে দেখুন তো গরম মশলা আছে কিনা। গরম মশলার এলাচ নেই। তাতে কি হয়েছে, যা আছে তাই গুঁড়িয়ে নিয়ে ভাতের উপর ছড়িয়ে দিন। এতে একটু ডুমো করে আলু ও নারকেল কুচি ভেজে দিতে পারেন তো কথাই নেই। বিকালে চায়ের সঙ্গে অতিথী সৎকারও চলতে পারে। আচ্ছা শুনুন—ঐ যে পেঁয়াজ কুচোলেন ওর খোসাগুলো ফেলবেন না। একটা টিনের মধ্যে জমান। কী হবে? কেন—কাপড়ে রং করবেন বলেছিলেন না? বেগুনে জলে খোসাগুলো খুব করে সেদ্ধ করে জলটা ছেঁকে নিন। (শাড়ী পাঁইচ্ছার হয় যেন) কাপড় ঐ জলে মেখে কুটিয়ে নিন দেখবেন কেমন সুন্দর পেঁয়াজী রং হয়। আলুর খোসাটাও ফেলবেন না। না এনে চিনে তোলার দরকার নেই। এমনি একটু ভেজে বা লঙ্কা সরষে দিয়ে তরকারী করে নিন। রোজ রোজ ঘোড়, শালগম, ভেণ্ডী আর কুমড়ার ঘ্যাঁট খেয়ে ছেলেদের অরুচি হয়ে গেছে। বেশ তো আসুন এক কাজ করা যাক। তরকারীগুলো সেদ্ধ করে নিন। এমন ভাবে জল দিন যাতে বাড়তী জল না থাকে। এবার ঔগুলো চটকে একটু পেঁয়াজ আদা বাটা লঙ্কা বাটা সামান্য হলুদ আর চিনি আন্দাজ মত নুন মিশিয়ে দিন। কড়ায় তেল দিয়ে এগুলো চপের পুরের মত ভেজে নিন। একটু দই গরম মশলা দিতে পারেন। এবার নামিয়ে চপের মত পাকিয়ে বিস্কুটগুড়ো অভাবে মুড়িগুড়ো মাখিয়ে নিন। ডিম থাকলে ভাল, না থাকলে ব্যাসন গুলে নিন। চপগুলো তাতে ডুবিয়ে তেলে ভেজে নিন। ছেলেদের অরুচি সেরে যাবে।

শীতকাল এসে গেল কপি মূলো কড়াইশুটি কমলালেবু কত কী উঠেছে, কুটনো কুটে গিন্নীদের ভারী আরাম। কিন্তু ও কি করছেন। খোসা ডাটা পাতা সব ফেলে দিচ্ছেন। মূলোশাক কপিশাক ফেলবেন না। কড়াইশুটির খোসাটাও রাখুন একটু সরষে দিয়ে ছেঁচকী করে দেখুন তো! ওদিকে খুব লেবু খেয়ে খোসাটা ফেলে দিল। ওটা তুলে রাখুন। রোদে শুকিয়ে কুচি কুচি করে পানে দিন। শুকিয়ে তুলে রাখুন, পায়েসে পোলাউতে দিন। বেটে মুখে মাখুন···তাহলে আর পয়সা খরচ করে ক্রীম কিনতে হবে না। কপি খেয়ে অকচি অথচ এক আনার সুন্দর কপি, না কিনলেও ঘর কেমন করে কিনলেও কেউ খেতে চায় না। এক কাজ করুন, সময় হাতে বসে কপিগুলো মিহি করে কুচিয়ে নিন তারপর রোদে শুকিয়ে নিন। শুকিয়ে মচমচে হলে তুলে রাখুন, মাঝে মাঝে রোদে দেবেন। তারপর বর্ষাকাল এলে তখন রেঁধে খেতে দেবেন। তরকারীর একঘেয়েমী থেকে নূতনত্বের স্বাদ পেয়ে বাড়ীর লোক খুব খুশী হবে। রাঁধবার সময়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে কপিটা জলে ভিজিয়ে দেবেন। তারপর জল বদলে নূতন জল দিয়ে কপিটা সেদ্ধ করে নিয়ে তখন রাঁধবেন। কড়াইশুটী পেকে গেছে। তরকারীতে আর ভাল লাগছে না। সেদ্ধও হয় না। এক কাজ করুন। দুপুরে উনুনে পাকা কড়াইশুটি খোসা ছাড়িয়ে বসিয়ে রাখুন। বিকেলে নূনমরিচ দিয়ে খেতে দিন। ঘুগনীর মত লাগবে, ছেলেও ভাল লাগবে খরচও কমবে। এসব তো গেল রান্না আর খাওয়ার কথা। এছাড়া মানুষের আর একটা দিক ও তো আছে ঘর সাজাবার নেশা মানুষের চিরকাল, এতে পয়সাও কম যায় না। দেখুন তো আপনার যা ফেলে দেন, তা দিয়ে ঘর সাজানো যায় কি না? জানলার পর্দা যাদের ঢাকা বেড কভার পাপোষ টেবিলক্লথ এসব তো প্রতি ঘরে দরকার। কিন্তু ছিট কেনবার পয়সাটাতো কম লাগে না, পুরনো কাপড় দিয়ে করা যায় বটে কিন্তু তাতে পরিশ্রম সার। কদিন আর টিকবে। সাড়ীর পাড় ফেলে দেন তো, নয়তো বাসনওলা পাড়শুদ্ধ কাপড় নিয়ে গেল। এক কাজ করুন, পাড়গুলো জলে বা হাতে ছুড়ে নিন। একটু মাজাঘষাই করে ফুটবেন। এবার ঐ পাড় যোড়া দিয়ে জানলার পর্দা বাক্স ঢাকা বেড কভার আসন করুন।

নারকেল দড়িটুকু পড়ে আছে। একটা পাপোষ করে নিন, কী করে করবেন? আচ্ছা একটা ফাঁস দিন দড়িতে। সেই ফাঁসটার মধ্য দিয়ে দড়ি নিয়ে গিয়ে আর একটা ফাঁস দিন। এভাবে চেন চেন করে বুনে যান। পাপোষ হবে। কাগজের ফুল তো আছেই। প্যাকিংএর রঙিন কাগজ ফেলবেন না। কমলালেবুর বিচিগুলো ধুয়ে তুলে রাখুন তো। লাল নীল সবজে হলদে রঙে বিচিগুলো রঙীন করে নিন। বাবলার ডাল চেনেন তো? পেলে নিয়ে নিন, তারপর ঐ রঙীন বিচিগুলো তালে সুন্দর ভাবে গেঁথে দিন তারপর দেওয়ালে টাঙান, একগাড় নিজস্ব ফ্লাওয়ারের কাজ হবে। ফুলোটা ফুটো হয়ে গেছে, তা গেলেই বা? ফেলবেন না। রসগোল্লার ভাড়টা রাখুন। প্রথমে ভাল করে চুণ বা খড়ি মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। তারপর তুলি আর রঙ দিয়ে কিছু আলপনা কেটে নিন। এবার টেবিল বা ফুলদানীতে একটু ফুল অভাবে পাতা সাজিয়ে রাখুন তো দেখবেন দামী ফুলদানীর কাজ দেবে। কলসী ভাড়ী তো টবের কাজ দেয় জানেন? ফুটো বালতীটাই বা বাদ দেবেন কেন?

দেখলেন তো ফেলে দেওয়া জিনিষ আমাদের কত কাজ দেয়। এ ছাড়া আরও বহু জিনিষ আছে। নিজেরাই পারবেন সেগুলো কাজে লাগাতে, না পারলে বলবেন, আমি তো রইলাম। তবে এক কাপ চা—সেটা অসঙ্কোচ ভাববেন না যেন তখন।

পিক্‌নিক্

শ্রীগৌর দত্ত

সার্বজনীন পূজো কাজে উদ্‌যোক্তার অন্ত এবারে বেশ কিছু বেশী। রঘুনাথ বাবুর বৈঠকখানায় পূজোর পাণ্ডারা সমবেত হয়েছেন। আলোচনার বিষয়—একটা বিজয়া সম্মেলন করতে হবে। নবীন প্রবীণ সকলে মিলে এক দিনের জন্যে একটু আনন্দ করবে। আনন্দের প্রধান উপকরণ—ভূরি ভোজন।

মধু গাঙুলি পূজো উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ছেলেদের পীড়াপীড়িতে তিনি বরানগরের বাগান বাড়ীটা এক দিনের জন্যে ছেড়ে দিতে আপত্তি করলেন না, পাড়ার স্কুলের পণ্ডিত মশায় পার্বনাথ চক্রবর্তী স্কুলের গাড়ীটাও ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। বালিগঞ্জ থেকে বরানগর অনেক দূর হবে না।

পিক্‌নিকের "মেন্যুর" কথা উঠল। পণ্ডিত মশায় কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। তিনি নবীন দলের পুরোহিত। মৃদু মধুর বললেন,—আমাদের এই পিক্‌নিক্ পার্টি একটা ঐতিহাসিক পার্টি, এর আগে বিজয়া উপলক্ষে কখনও এ রকম পার্টি হয় নি। মামুলি মেনু করে আমরা এর সম্মান নষ্ট করতে চাই না, আমার মতে এমন একটা কিছু হোক—যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যোগেন্দ্র সেন চোখ টিপে ইসারা করলেন। তিনি পণ্ডিতকে বললেন,—সে তুমিই বল, ভাত মাংস ও সেবার বাড়িতেই হয়।

পণ্ডিত প্রস্তাব করলেন,—আমার মতে মুরগ মুসল্লম, বিরিয়ানী পোলাও কেমন হয়—একেবারে বাদশাহী খানা?

সোল্লাসে সকলে সমর্থন করলেন, যোগেন্দ্রর গলা সকলের উপরে চেপে গিয়ে।

পার্বনাথ বাবু দু হাত তুলে সকলকে থামিয়ে বললেন,—মুরগ মুসল্লম, বিরিয়ানী পোলাও না হয় হল, কিন্তু রাঁধবে কে তুমি? আমাদের মধ্যে কে জানে?

পণ্ডিত বললেন,—কেউ নাই বা জানল। আমরা সাহেবী হোটেলের মুসলমান বাবুর্চি আনব, তাদের রান্না তাদের দিয়ে করানই ভাল, কি বল যোগেন?

যোগেন্দ্র ঘাড় দুলিয়ে সহাস্যে সমর্থন জানিয়ে বললেন,—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, তা না হলে বাদশাহী হবে কি করে।

সকলে এ প্রস্তাবে মত দিতে পারলেন না। সভার থেকে কয়েকজন প্রবীন আপত্তি করলেন। পার্থনাথ বাবু পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আপত্তিকারীদের সমর্থন করলেন, বললেন,—এ হতে পারে না, আমরা হিন্দু ঘরের লোক—মুসলমানের ছোঁয়া খেতে পারব না।

শশাঙ্ক সুর তাঁর কথায় অসুরের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন,—তা হলে রাঁধবে কে শুনি? মোগলাই রান্না কি কোন হিন্দুকে দিয়ে সম্ভব?

পার্থনাথ বাবু বললেন,—কেন, আমাদের রঘুনাথ কি পারে না?

শশাঙ্ক সহজভাবে বললেন,—উনি মোগলাই রান্নার কি বোঝেন মশায়? শেষে হয় ত খিচুড়ি বানিয়ে বসবেন। পয়সা, পরিশ্রম, রসনা—সব মাটি হয়ে যাবে।

পার্থনাথ বাবু বেঁকে বসলেন,—রেগে বললেন,—বেশ, তোমাদের যা ইচ্ছে তোমরা কর, আমাকে বাদ দাও। একদিনের খাওয়ার বদলে জাত আমি দিতে পারব না।

শশাঙ্কর গলার সুর নরম হয়ে এল, কোমল ভাবে বলল,—দেখুন চক্রবর্ত্তী মশায়, আপনার মুরগীতে আপত্তি নেই—যত আপত্তি মুসলমানে, বিড়িয়ানী পোলাও কি করে রাঁধতে হয়, জানেন আপনার রঘুনাথ বাবু? ঐ ত বসে রয়েছেন—বলুক না।

রঘুনাথ মল্লিক মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন,—কেউ যদি দেখিয়ে দেয়—আমি রেঁধে দিতে পারব,—এটুকু ভরসা আমি দিতে পারি।

শশাঙ্ক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন,—থাক্ থাক্—হয়েছে, মস্ত বড় রাঁধিয়ে আমাদের, একজন দেখিয়ে দেবেন—উনি রেঁধে দেবেন, এটুকু আমরাও পারি।

রঘুনাথ বাবু নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন, চড়া সুরে বললেন,—দেখুন রান্না আমাকে শেখাবেন না, পাঁচ জনের পাটিতে রেঁধে খাইয়ে এসেছি—কেউ অখ্যাতি করে নি, আজ কি না, এই চাঁংড়াদের কাছে রান্না শিখতে হবে। নিয়ে আসুন আপনার সাহেবী হোটেলের বাবুর্চি, তার বিড়িয়ানী পোলাও মুরগ মুসল্লম,—আমার সাধা খিচাত, লাউ চিংড়ি, দেখা যাক্, কার কত দূর দৌড়।

সভার মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল, বিশেষ করে নবীনদের পক্ষ থেকে হাসির তুফান উঠল,—খাসুন, খাসুন, লাউ চিংড়ি মশায়—অনেক হয়েছে—।

রঘুনাথ বাবু ক্ষেপে পড়লেন, সরোষে কম্পিত গলায় বললেন,—চলুন পার্থনাথ বাবু, এই চাংড়াদের সঙ্গে থাকলে আত্মসম্মান রাখা যাবে না।—এই বলে পার্থনাথ বাবুর হাত ধরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার উপক্রম করলেন।

পিকনিক্ সিকে ওঠার উপক্রম হল। মধু বাবু বিতণ্ডার মধ্যে ছিলেন না। এক কোনে বসে এই অপ্রীতিকর আবহাওয়া নিরীক্ষণ করছিলেন, এ অবস্থায় দুজনকে নিরস্ত করলেন তাঁর স্বভাব সুলভ মিষ্ট কথায়; বললেন,—দেখুন, সকলে যখন চাইছে একটা দিনের জন্যে আমোদ করতে—আমাদের কি উচিৎ নয় বড় স্বার্থের খাতিরে নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থ বলি দেওয়া?

মধুবাবুকে সমর্থন জানিয়ে শশাঙ্ক বললেন,—বিশেষ করে আজকের এই প্রগতির দিনে জাতের প্রশ্ন অচল, উৎসব আমোদ যেখানে সেখানে জাতিভেদ চলতেই পারে না।

মধুবাবু ঈষৎ হেসে ঘাড় নাড়লেন। সভা কক্ষ "হিয়ার হিয়ার" ধ্বনিতে মুখরিত হয়েউঠল। সকলের পীড়া পীড়িতে পার্থনাথ বাবু অবশেষে সম্মত হলেন—এক দিনের জন্যে জাত খোয়াতে, রঘুনাথ বাবুও দ্বিমত করলেন না। বিড়িয়ানী পোলাও, মুরগ মসল্লমের নাম অনেকের শোনা আছে;—রসনায় সে বস্তুর কেমন স্বাদ—জানা নেই। পেটে খেয়ে পিঠের স্বাদ হজম না করতে পারার মত অর্ব্বাচীন যে মল্লিক মশায় নন, তা প্রমান করতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তবে মুখে বললেন,—মুসলমান বাবুর্চি যেন সৎ গোত্রের হয়।

মধু সাহুদির বাগান বাড়ী। আজ সকাল থেকেই সরগরম। তাদের আস্তা, হারমোনিয়ামের সাথে গাওয়া, তবলার চাঁটি ও নাকি সুরের বেসুরো গানের কলি মিশিয়ে ইতি মধ্যে একটা নতুন আবেষ্টনের সৃষ্টি করেছে। খালিগলের ছন্দোবদ্ধ দৈনন্দিন আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে একদিনের জন্যে বরানগরে প্রাচীন পরিবেশে এসে এঁরা নিজেদের সত্ত' হারিয়ে ফেললেন। ছোট বড় নির্বিশেষে এক আসরে বসে কিছু সার্বজনীন আলোচনার সুযোগ পেয়ে মত্ত হয়ে

উঠলেন। সিগারেটের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে ঘুরে আল স্থষ্টি করে পরস্পরের মুখের সুস্থ রক্ষা করে চলল। এখনও অনেকের উপস্থিত হওয়া বাকী আছে।

শশাঙ্ক বাবু বাবুর্চির ব্যবস্থা করেছেন। রান্না ভোর রাত্র থেকে শুরু হয়ে গেছে' দুটো হাড়ি পাশপাশি দুটো উনুনে ভোজের উপকরণ প্রস্তুত করে চলছে, সকাল আটটার মধ্যে বাবুর্চিকে রান্না শেষ করতে হবে। কোন এক সাহেব বাড়ীতে নাকি তার রান্নার কাজ আছে।

শশাঙ্ক, যোগেন্দ্র, পার্শ্বনাথ ও মধুবাবু তাস নিয়ে বসেছেন। শশাঙ্ক পার্শ্বনাথের বিপক্ষে,—যোগেন্দ্র তাঁর জুটি, রঘুনাথ বাবু এখনও এসে পৌছান নি।

টেক্কার পিঠ নিয়ে শশাঙ্ক কটাক্ষ করে বললেন,—কি মশায় নাকে কিছু পাচ্ছেন?

পার্শ্বনাথ বাবু স্মিত হাস্যে বললেন,—তার আর পাব না। বেশ পাচ্ছি, হিমুখ আজ এখানেই দিয়ে যেতে হল দেখছি!

যোগেন্দ্র বললেন,—যাই বলুন—অদ্ভুত রান্না হচ্ছে। ঢাকাটা খুলে একবার দেখে হিমুখ, যেমন রং, তেমনি গন্ধ।

শশাঙ্ক বুকে হাত ঠুকে উৎফুল্ল হয়ে বললেন,—আরে ওকে কি যাকে বাবুর্চি পেয়েছেন? বৃটিশ আমলে লাট ভবনে খানা তৈরি করত। শুনেছি,—ওয়াজেল সাহেব না কি তার রান্না খেয়ে একখানা ইয়া বড় সার্টিফিকেট আর একটা সোনার মেডেল দিয়ে গিয়েছেন। এ সব জিনিষ কি আপনার রঘুনাথকে দিয়ে হত?

পার্শ্বনাথ বাবু হেসে বললেন,—তা রঘু কি করে পারবে বল, ও হল সাহেব বাড়ীর বাবুর্চি—আর রঘু হল সবের ঘরের রাঁধিয়ে।

শশাঙ্ক বাবু বললেন,—তবে? আপনি ত আমাদের ওপর খড়্গ হস্ত হয়ে উঠেছিলেন। মুসলমানের রান্না! মুসলমানের রান্না!! এখন?

পার্শ্বনাথ বাবু বললেন,—ভয় ত আমার মুসলমানে নয় যে ভাই,—ভয় হল তোমাদের বৌদিকে, যা বিচার—তা যদি জানতে!

সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন, যোগেন্দ্র বললেন,—তাই বলুন, আমি ত ভেবে কূল কিনারা, পাই না, যখন হলে কি কেউ জাত রাখতে পারে! যত বয়স বাড়ে, তত লোভ বাড়ে, লোভে পড়লে কি বিচার চলে!

অল্প কথায় মানুষ মধুবাবু হাসতে লাগলেন মৃদু মৃদু।

শশাঙ্ক বললেন,—তা হলে আমরা কিছু বৌদির জন্যে রেঁধে দেব। আপনি কেবল ঘরে বসে শুয়ে পড়বেন—খেতে বলতে হবে না। সকালে দেখবেন—উবে গেছে। এ হল সাহেবী বাবুর্চি, এদের রান্নার গন্ধই আলাদা।

পার্শ্বনাথ বাবু মৃদু হেসে হাত থেকে শেষ তাসখানা ফেলে দিয়ে বললেন,—নাও হে,—অনেক হয়েছে,—তোমাদের পিট তোল।

তাসগুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে নিতে শশাঙ্ক বললেন,—জিতের পিট ত তুলবোই। এখন একটু চেষ্টা হবে না কি?

যোগেন্দ্র লাফিয়ে উঠলেন;—বলুলেন, নিশ্চই নিশ্চয়ই।

বাবুর্চির ডাক পড়ল, এক প্লেট সদ্য পোলাও—একটা আস্ত মুরগীর আধা রোষ্ট তার চক্রের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে বাবুর্চি প্রস্থান করল।

শশাঙ্ক একখানা ঠ্যাং ছিঁড়ে নিয়ে—খানিকটা মুখে পুরে দিয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল—তোফা, তোফা হয়েছে যোগেন্দ্র।

যোগেন্দ্র খানিকটা পোলাও মুখে ফেলে দিয়ে বললেন, বাবুর্চি না হলে কি রান্না! খাসা—ভাই খাসা।

পার্শ্বনাথ বাবু সলজ্জ ভাবে মুরগির অপর ঠ্যাংটি নিয়ে দাঁতে কামড় দিলেন।

মধুবাবু অনেকক্ষণ পরে কথা কইলেন, হেসে পার্শ্বনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন লাগছে?

ঈষৎ হেসে পার্শ্বনাথ বাবু উত্তর করলেন,—মন্দ নয়—বেড়ে হয়েছে। রঘুনাথটা এলেই হয়—দশটা যে বাজে প্রায়।

সহসা বাগানের মধ্যে রঘুনাথের হুঙ্কার শোনা গেল;—তোমার আক্কেলটা কি রকম হে? তুমি এখানে? ওদিকে মজুরেরা সিমেন্ট বালির তাগার মেখে বসে আছে। রাজ-মিস্ত্রীর দেখা নেই! আমাকে কাল বলে এলেই ত পারতে—আমি ঘরে বসি বলেনের কাজ আজ না হয় বন্ধ রাখতুম।

তোমার জন্যে আমি হাঁ করে বসে আছি—সেই সকাল আট-টা থেকে তোমার পাত্তাই নেই।

রঘুনাথ বাবুর অযোধ গর্জ্জন শুনে সকলে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। বাবুর্চ্চি মুখ নিচু করে মাথা চুলকোতে লাগল। তার মুখে একটাও কথা নেই—রঘুনাথ বাবুর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

পশাঙ্ককে সামনে পেয়ে রঘুনাথ বাবু আর এক তরফা বাবুর্চ্চির প্রতি বাক্য বান বর্ষণ করে দিল,—আমি ও দিকে বাড়ীতে ঠায় বসে আছি,—কখন রাজমিস্ত্রী আসবে,—তাকে কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে বের হব;—তা না—ওকে এখানে বাবুর্চ্চি সাজিয়ে দ্রৌপদী করা হয়েছে! রান্না যে কেমন হবে—বোঝাই যাচ্ছে!

পার্থনাথ বাবু হতচকিত হয়ে গেলেন, বোধ করাইত নেত্রে বললেন,—অ্যাঁ! কি বলছ হে রঘু! আরে রাম রাম। এ বাবুর্চ্চি নয় মিস্ত্রী? ভাগিস, সোলাও মুখে দেই নি! ওহে মিস্ত্রী, তুমি এই ভাবে আমাদের জাত মারবার চক্রান্ত করেছিলে? কি সর্ব্বনাশ! আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম তো হে! বাক্ ভগবান রক্ষে করেছেন। উঃ;—আমি আর তোমাদের মধ্যে নেই যোগেন্দ্র আমি চললুম।

যোগেন্দ্রও বেঁকে বসলেন। গেলে পশাঙ্ককে বললেন,—এই তোমার সাহেব বাড়ীর বাবুর্চ্চি! কোথাকার এক অখাদ্য রাজমিস্ত্রী ধরে এনেছ! অতঃপর যোগেন্দ্র হুড় হুড় করে গিয়ে হাঁড়ির ঢাকা ছুটো খুলে দিলেন। পরে সরোষে বললেন,—এই কি রান্না হয়েছে! না আছে রং—না আছে গন্ধ! একেবারে যমের অখাদ্য। চলুন পার্থনাথ বাবু, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

রঘুনাথ বাবু আড় চোখে পশাঙ্কের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। পরে, পার্থনাথ বাবু ও যোগেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বাগান বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন একটু তাড়াতাড়ি এস বাবুর্চ্চি। এক গাড়ি থালি বাইরে চালা পড়ে আছে।

পশাঙ্ক বাবু হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র

শ্রীউমাপতি চট্টোপাধ্যায়, বি, এ।

"বঙ্কিমচন্দ্রের ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে কোনও মূলগত পার্থক্য নাই যাহা আছে তাহা শিল্পবোধেই সীমাবদ্ধ।"

উপরের উক্তিটি শুনিলেই মনে হয় একথা কেমন করিয়া সত্য হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র নীতির কড়া বিচারক পৃথিবীর মালিন্য মুক্ত আদর্শের শতদলেই তিনি সাহিত্য সরস্বতীর অর্ঘ্য রচনা করিয়াছিলেন; আর শরৎচন্দ্র পৃথিবীর সকল ধূলাকাদা হাতে তুলিয়া লইয়াছেন ফুলের সহিত। দুইকেই একই স্বর্গের বাসী বলিয়া অভিহিত করা যাইবে কেমন করিয়া।

শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন "জীবনের সত্যকে যিনি যত বড় করিই হন লঙ্ঘন করতে পারেন না ● ● জীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী তাকে একটা কুৎসিত কদাকারে প্রকাশ করতে হবে, এতে কবি প্রাণের মহত্ত্ব বা কবি কল্পনার সৌরব কোথায়?" সামাজিক অনুশাসনে শিল্পী হস্ত নিয়ন্ত্রিত হইবার আশঙ্কায় বলিয়াছেন—"আমাদের সমাজে যে নিদারুণ অবিচার অহরহ ঘটছে তারই পুনরাবৃত্তি যদি সাহিত্যেও দেখি তবে মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্য যাচাই সম্বন্ধে হতাশ হতে হয়।" কিন্তু সেই শরৎচন্দ্রের হস্তে যখন পড়িয়াছে রমা ও রমেশের মিলনের ভার তখন তিনি পারেন নাই সামাজিক অনুশাসন হইতে তাঁহার মানস সন্তানগণকে মুক্তি দিতে। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন "আমাদের সংস্কার ও আচার বিচারের উপর,আমি একেবারে বজ্র হস্ত বিদ্রুপে যখন

যুক্তি দিই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই দিই কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখেছি যখনই আমার মনের কোণে সেই অনন্তরাতেষ্টিতটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখনই আমি দুর্বল হয়ে পড়ি।" শরৎচন্দ্রের বঙ্কিম সাহিত্যের প্রতি যে বিদ্রোহ তাহা কালের বিদ্রোহেরই অনুরণন তাহা মন প্রাণ দিয়া বলিলেও তাহার মধ্যে তাঁহার নিগূঢ় হৃদয়ের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না বলিয়া তাহার বলিষ্ঠ ছাপ তাঁহার সাহিত্যে প্রতিভাত হয় নাই। যে শরৎচন্দ্র রোহিণীর মৃত্যু দণ্ডে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন তাঁহার রাজলক্ষ্মী পারে নাই গার্হস্থ্য জীবনকে গ্রহণ করিতে, কিরণময়ীর শেষ জীবন কাটিয়াছে তীব্র অন্তর্দাহের বহ্নিতে পাগল হইয়া—সুরেশ ও অচলার জীবন হইয়াছে তাঁর স্বতন্ত্র বাঁচিবার অনুপযুক্ত। তাঁহার নায়ক নায়িকার মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রোহের কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু অভয়া ছাড়া কেহ সুখী হইতে পারে নাই—কমল ছাড়া কেহ সহ্য করিতে পারে নাই। নতুন যার ক্ষেত্রে তীব্র বেদনার কোনও স্পষ্ট বিবৃতি না থাকিলেও তাহার জীবনে সুখ ছিল না শেষের দিকে তো তাহাই মনে হয়। কিরণময়ী সমাজকে বিদ্রূপ করিয়াছে বাক্যের প্রতি ছত্রে কিন্তু তাহার কৃতকর্ম্মের বহ্নি তাহাকে শাস্তি দিয়াছে। তবে তাহা বাহির হইতে আসে নাই আসিয়াছে অন্তরের অন্তস্থল হইতে—এমন কি তাহাকে মৃত্যুর বর্ম্মায় সাজিয়া গিয়া শরৎচন্দ্র সে শাস্তিকে সমাজ নিরপেক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার কিরণময়ীও শান্তি পাইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিনীরই মত তবে প্রকাশ কৌশল আরও সূক্ষ্ম—আরও গভীর—আরও তীব্র। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত উভয়ের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের প্রেমে সমাজস্বীকৃতি না থাকায় শান্তি পায় নাই। প্রতাপ শৈবলিনীর মত তাদের বালাপ্রেম চির অভিশপ্ত।

শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মনের ধ্বনি একই। কালের বিভিন্নতায় সুর বিচিত্র। বর্ত্তমান জগতে সমাজ অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তথা যে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে তাহারই প্রভায় শরৎ সাহিত্যে পার্থক্যের রঙ প্রতিফলিত হইয়াছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনও ইহার জন্য কিছুটা দায়ী। কবি জগতে বসিয়াই শিল্প সৃষ্টি করেন জগতেই তাঁর মূল জগতের রসেই তাঁর মন প্রাণ সঞ্জীবিত তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের অন্তরীন সুরে একই ধ্বনির যোজনা ধ্বনিত হয়। মানব জীবনের চিরন্তন সত্য ও সাময়িক জীবনের বন্ধনময় পরমাণু সত্যের সৌন্দর্য্যময় মিলনের যে সার্থকতা তাহাই শিল্পরসের আনন্দ। এ সত্য সকল শিল্পিই মানেন যে প্রেমের আধার সমাজ নহে নরনারীর অন্তর। শরৎচন্দ্রও মানিয়াছেন, মানিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কালের পরিবর্ত্তনের জন্য শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকা তাহার অলঙ্কার ও ঘটনার জাঁকজমক ছাড়িয়া প্রাত্যহিক জীবনের খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে পূর্ণ সমরক্ষেত্রের ছড়াছড়ি নাই পতিপ্রাণদরীকে বৃত্তের ছলনায় হত্যাকরার রোমাঞ্চকর পরিবেশ নাই জাকাত-দলের রাণী হওয়ার উৎকণ্ঠা নাই। কিন্তু প্রফুল্ল শৈবলিনী রোহিনীর মনের ধারাই স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে প্রকাশ পাইয়াছে শরৎ সাহিত্যে। উন্মাদিনী কিরণময়ীর মধ্যে কি দেখিতে পাইনা শৈবলিনীর ছায়া। প্রফুল্লর ছায়া কি আভাষিত হয়না অচলার মধ্যে যে দেবীগিরীর মাহাত্ম্য ছাড়িয়া সার্থকতা খোঁজে জীবনের প্রাত্যহিকতায়? একই মানসগতি প্রকাশিত হইয়াছে বিভিন্নরূপে। বঙ্কিমের কল্পনা ও আদর্শের গাঢ় রং প্রাত্যহিকতার স্পর্শে কিছুটা হাল্কা রূপে দেখি শরৎ সাহিত্যে শৈবলিনী প্রতাপের বাল্যপ্রেমের যে অভিশাপ তাহাই নামিয়া আসিয়াছে দেবদাস-পার্ব্বতী রমা, রমেশ রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের জীবনে।

একথা ঠিক শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নীতির মানদণ্ড কিছুটা কোমল করা হইয়াছে। বিশেষতঃ নারীর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সতীত্বকেই একমাত্র নারী জীবনের মাপকাঠি করিয়াছেন শরৎচন্দ্র তাহা বলেন নাই বলিয়াছেন "পরিপূর্ণ নারীত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়" যদিও সতীত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে সুরেশের মুখ হইতে মৃণালের সম্বন্ধে উক্তির মধ্যে অন্নদাদিদির সম্বন্ধে বর্ণনার মধ্যে। কিন্তু পৃথিবীতে যাহা সত্য তাহাকে অস্বীকার করিতে চাহেন নাই অন্যায়ের জন্য প্রকৃতির তথা আপন স্বভাবের মধ্য হইতে তাহার নায়ক নায়িকা পাইয়াছে তবু করিয়া মারিতে তাহার প্রাণ চাহে নাই। ভালকে ভাল

বলিয়াছেন মনকেও দেখাইয়াছেন তাহারই সহিত। বঙ্কিম সাহিত্যে কামনার উর্দ্ধে সকল সার্থিং ক্রটী বিচ্যুতি মুক্ত প্রেমকেই স্বীকার করা হইয়াছে। আর শরৎ সাহিত্যে বঙ্কিম স্বীকৃত প্রেম ও স্বপ্নাবরণ সরস্বপ্রাণতার প্রেম দেখান হইয়াছে তাঁহার মতে দুইই সত্য বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর মানদণ্ডে বিচার করিয়া সজোরে মতামত দিয়াছেন আর শরৎচন্দ্র ভালমন্দ বিচারের ভার পাঠকের উপর দিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এই তফাৎটুকুই পার্থক্য। নহিলে পাঠকের মনে কোভ জাগিত না রোহিনীর প্রতি কঠোরতায় জাগিত না বেদনা সৌরঙ্গিনীর জীবনের ব্যর্থতায়।

"প্রথম বর্ষণ"

শ্রীরমা দেবী

হে কৃষ্ণ মেঘ কোথা হোতে তুমি নেমে এলে আজ রূপে ?
মানিনীর মান ভাঙাবার তরে এলে বুঝি চুপে চুপে ?
তপ্ত ধরণী যেন রাধারাণী বিরহ দহনে দহিয়া,
ছায়া সুনিবিড় কৃষ্ণ নিশীথে রোদন এনেছে বহিয়া।
গুরু গুরু রব আহ্বানের বুঝি তাই কাঁপে রাধারাণী !
বিজলীর লেখা জটীলা কুটীলা করে কি যে কানাকানি ?
স্তব্ধ নিকুঞ্জ কদম্ব বন কেয়া মাতামাতি করে,
তোমা হেরি যেন পুলকে উছল খুসী উছলিয়া পড়ে।
বিরহিনী রাধা তব পথ চাহি কাটায়েছে বহু দিন,
বিরহের তাপে ক্ষিণতনু তনু হোয়ে গেছে তাই ক্ষীণ।
মানিনী ভেবেছে বুঝি তার প্রিয় প্রিয়ারে ভুলিয়া গেছে,
পুরাণো দিনের দুখিনীর কথা আর নাহি মনে আছে।
অভিমানে তাই অধির পরাণ কাঁপিছে আঁধার মাঝে,
বন মর্ম্মরে গুন গুন স্বরে বুঝি সে বারতা বাজে।
অতীতে রাধার আকুল পরাণ যেমন বাঁশীর সুরে,
অভিসার লাগি উতলা চরণে যেতো যমুনার তীরে।
পুরবী হাওয়ার বাঁশী শুনে আজো চলে তাই আনমনে,
কাল ব্রজবালা হেলিয়া দুলিয়া লুটায় নীরব চরণে।
শুষ্ক অতল দিঘী কালোজল কুলিয়া কুলিয়া উঠিছে,
যেন গো মানিনী অভিমান ভরে গুমরি মরিছে।
সেই মানিনীর দুঃখ নিশ্বাস সকল উদাস চাওয়া,
ঘিরে ঘুরীর পরিমল সাথে বয়ে আনে পুব হাওয়া।
ছায়া ঘন আঁখি দিগ্ দিগন্ত যেন তব রূপ হেরিছে
কাল ভারে নত যেন সে আঁখিতে কাজলের রেখা এঁকেছে।
সে অভিমানিনী সেই বিরহিনী আজো যেন আকুলিয়া
ঘুম নীপবনে ঘুমাইয়া যেমে আছে ওগো বাঁশুরিয়া।
না বলা বাণীর ঘন যামিনীতে প্রাণের বেদনা লয়ে
নিভৃত মনের গোপন অশ্রু নীরবে বেড়ায় বয়ে।
বিরহ বিধুর হিয়ার বেদনা অধীর ব্যাকুল বাধে
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে রয়েছে বনের ছায়ে।
বরষার মেঘে ভরা বেদনাতে উঠেছে বেজে
এসেছে মানিনী ঘুমী পারিজাত ঘুমকোলতায় সেজে।
তব চরণের ধ্বনি শুনে যে নাহি মানে কোনো বাধা
অভিসারিকার বেশে পড়ে তাই শ্যামময়ী শ্রীরাধা।

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

(১০)

অনেক দিন শঙ্করের বাড়ীতে রঞ্জনের যাওয়া হয়নি। প্রায় সেই সূর্যার দেশে যাওয়ার পর থেকেই। এই নিয়ে প্রত্যহ ক্যান্টীনে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে, শঙ্কর তাকে অনুযোগ করে। বলে, সূর্যাই তোমার সব, আমি কেউ নই; ইত্যাদি। রঞ্জন তার মামা মামীর মিথ্যা কাজের অজুহাত দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করে রাখে; কিন্তু মনকে শান্ত করতে পারে না। প্রত্যহ কর্মাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের ছাদে ছাদে যখন অপরাহ্ণের ছায়া মেদুর হয়ে আসে; কার্ণিশের আড়ালে, কপোত কপোতীর কূজন গভীর হয়ে ওঠে; তখন একটী পরিচ্ছিন্ন, গৃহের প্রিয় পরিবেশের মধ্যে নিজের দিনান্তের ক্লান্তিকে মুক্তি দেবার জন্য তার হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে মানচক্ষে দেখতে পায়, শঙ্করের দুটী কর্ম ক্লান্ত চোখ তার আগমন প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে। প্রত্যহের অভ্যাস বশতঃ সে হয়ত কোকো তরা একটী পেয়ালা রঞ্জনের জন্য পাশে সরিয়ে রেখেছে; সঙ্গে খাবারের রেকাবীও; কত মধুর আলাপন তার ওষ্ঠের আগায় এসে শুদ্ধ নীরবতায় ব্যাহত হয়ে ফিরে যায়; তার সুন্দর চোখ দুটী ধীরে ধীরে ক্লান্ত প্রতীক্ষায় বিষণ্ণ হয়ে আকাশের অসীম ঔদার্যের মধ্যে হারিয়ে যায়, তথাপি রঞ্জন সেই প্রত্যাশিত মধুর অবসর গুলিকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে অলসের মত গৃহে বসে থাকে; না হয় কোনও সিনেমা থিয়েটারে গিয়ে বসে থাকে।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে, তার কল্পনার রঙে রাঙানো অতি প্রিয় কৃষ্ণার কাছে থেকে অতি নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্তির পর থেকেই সে শঙ্করের গৃহে যাওয়া ত্যাগ করেছে। কেননা, কৃষ্ণার কঠিন উপেক্ষা, নিষ্ঠুর প্রত্যাখানকে সে বড় ভয় করে। সে জানে শঙ্করের গৃহে কৃষ্ণার অবাধ গতিবিধি। সে শঙ্করের আত্মীয়, আর রঞ্জন বন্ধু; কাজেই শঙ্করের গৃহে তার আধিপত্য বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আবার যদি সেই কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তাকে? আবার যদি লোক চক্ষুর সামনে তার বঞ্চিত প্রেম ধূলায় লুণ্ঠিত হয় তাহলে? সে অপমান রঞ্জন সহ্য করতে পারে না। তার পৌরুষে ভীষণ আঘাত হানে! বলা যায় না, তাকে শঙ্করের গৃহে দেখে কৃষ্ণা হয়ত ভাবতে পারে যে রঞ্জন তারই জন্য, সেখানে যায়? শঙ্করের মধ্যস্থতায় সে হয়ত কামনা করে কৃষ্ণার মনোরঞ্জনের। আর সেইজন্য সে যদি আবার তাকে অপমান করার জন্য উদ্যত হয়? তখন? সেইজন্য শঙ্করের শত সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করে, নিজের অন্তরকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বশ করে ও শঙ্করের গৃহে যাওয়া একরকম ত্যাগ করেছে।

সেদিন কাজের থেকে ফিরে এসে সূর্যার একখানা চিঠি পেয়ে তার শঙ্করের বাড়ী যাবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশপরিবর্তন করে, চা খেয়ে বিশ্রাম করে সেই বেরোতে যাচ্ছে; অমনি এক বন্ধু এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে গল্প করে তাকে বিদায় দিয়ে পুনরায় বেরোতে তার প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। শঙ্করের বাড়ী গিয়ে যখন পৌঁছলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ভিতরে প্রবেশ করে ও বসার ঘরে গিয়ে দেখল, সেখানে কেউ নেই। তখন সোজা সে, অন্তঃপুরে গিয়ে একেবারে ঘিতলে উঠে গেল। কিন্তু সেখানেও কাউকে দেখা গেল না। চিন্তিত হয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নামছে; এমন সময় দেখা হোল, ভৃত্য মদনের সঙ্গে। সে বললে, "বাবু বাগানে। সেখানে আপনার চা দিয়ে আসছি বাবু"। রঞ্জন বললে, "আমি চা খেয়ে এসেছি মদন, আজ আর খাবো না"—শঙ্কর একলা এই অন্ধকারে বাগানে কি করছে? সঙ্গে কেউ আছে

কি? তার সঙ্গে গল্প করছে? নানা কথা ভাবতে ভাবতে, বজ্রা সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বারান্দা পার হয়ে, বাগানে প্রবেশ পথের প্রস্ফুটিত মাধবী বিতানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার অনুধাবনকে সজাগ রূপ দিয়ে একটী পরিচিত নারী কণ্ঠ, তাকে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ করে দিল। যে আগ্রহ নিয়ে সে ছুটে শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল; পলকের মধ্যে মনের সেই অবস্থা কোথায় মিলিয়ে গেল। তখনি ছুটে সেখান থেকে পলায়ন করার জন্য তার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল কি জানি কিসের আকর্ষণে সেই মধুভরা করা মালতী ফুল, বিছানো, ভিজে মাটী তার পাদুখানি জোর করে আঁকড়ে ধরে রইল যে তার ইচ্ছা সত্ত্বেও পাদুটী কিছুতে নড়াতে পারল না। পল পল করে সময় কেটে যাচ্ছে, সে পাথর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল দুটী পরিচিত কণ্ঠের মধুর আলাপন। তারপর কখন যে এক সময়, টলতে টলতে পথে বেরিয়ে এসেছে, সে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে, সটান, বিছানায় শুয়ে পড়ে চেতনা হোল যে, তার মনে গুরুতর ভাবে একটা আঘাত লেগেছে। সে শুনতে পেল, তার ঘরের দেওয়ালের আড়ালে কারা যেন, কাঁনাকানি, করছে; হায় বজ্রা, এই কঠিন পৃথিবীতে এত শীঘ্র-কাতর হৃদয় নিয়ে আহত প্রাণে কি বাস করা সম্ভব? কখনও না। কখনও না। তার মনের পটে স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল, সুধার অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখখানি; তার স্বামীর একাকীত্বের কথা ভেবে, বিদায় কালে তার সে কি আকুলতা! স্বামীর মনের মত হবার জন্য কি একান্ত তপস্যা! হায় এ পৃথিবীতে অন্তরের দুর্লভ বস্তুর কোনও মূল্য নেই। কাণের পাশে তার শুধু অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগল, একটী মধুর কণ্ঠের গীতগোবিন্দ কাব্যের সুললিত ব্যাখ্যা। মনে হতে লাগল তার কানের মধ্যে কে যেন জলন্ত গলিত সীসা ঢেলে দিচ্ছে; দুই হাতে সে কান চেপে ধরল, কিন্তু কিসের কি; কানের মধ্যে সেই কাব্য গুঞ্জন; মনের মধ্যে একটী অন্ধকারের দুঃখ; তার রাত্রির বিশ্রামকে সন্ধ্যার মত লুটে নিল। একটী সবল যুবক শয্যায় শুয়ে, দুটী নারীর কথা চিন্তা করে আকুল অন্তরাগে ছটফট করতে লাগল।

(১১)

সুধার একটী মেয়ে হয়েছে। সুধারই মত অপূর্ব সুন্দর হয়েছে—মেয়েটী; ঠিক যেন একমুঠো ঘুঁই ফুল। চৌধুরী বাড়ীতে বহুদিন পরে এই জন্মোৎসব, কিন্তু কারো মুখে একবিন্দু হাসি নেই। কারণ প্রসবের পরই সুধা কঠিন রোগাক্রান্ত হয়েছে। চিকিৎসার কোনও ত্রুটী হচ্ছেনা; শুশ্রূষার জন্য সহর থেকে নাম করা ধাত্রী আনা হয়েছে, তথাপি কিছুতে কোনও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। শঙ্করের বৃদ্ধা জননীর মনে কোনও শান্তি নেই। জপ আহ্নিক, আচার নিয়ম সমস্ত ভুলে তিনি সদাসর্বদা পুত্রবধূর শয্যাপার্শ্বে বসে থাকেন। কাতর নয়নে তার রোগ পাণ্ডুর মুখের পানে চেয়ে চেয়ে নিজ ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে তার আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা জানান। নবজাত শিশুটীর পানে চেয়ে তাঁর দুইচোখে জল ভরে আসে। বিরাট বাড়ীখানিতে সর্বদা একটা শোকের ছায়া থম থম করে।

"তার"—পেয়ে কোলকাতা থেকে শঙ্কর চলে এসেছে। সুধার অবস্থা দেখে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। ডাক্তার বললেন প্রসূতির দেহে অস্ত্রোপচার ঠিক হয়নি। সন্তানকে বাঁচার জন্য তারা রোগীর প্রতি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেনি। এদিকে সন্তানটীও মরণাপন্ন। অথচ যে চিকিৎসক সুধাকে প্রসব করিয়েছেন এদেশে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। কার হাতে কখন যে কি হয় কিছুই বলা যায় না। সকলের পরামর্শে সে চিকিৎসককে মনে আবার নতুন একজনকে ডাকা হয়েছে, কিন্তু এঁর হাতেই বা রোগী সুস্থ হচ্ছে কই? সুধাকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য শঙ্কর তাঁর পরামর্শ চাইলে, তিনি বললেন, "আর কয়েকদিন না গেলে তিনি মত দিতে পারবেন না। নিজের উপর দারুণ আক্রোশে শঙ্করের প্রাণ তিক্ত হয়ে উঠল। সে কেন সুধাকে পাঠিয়েছিল, এই পল্লীগ্রামে?—সব দোষ তারই? তার নিজেকে ঘোর অপরাধী বলে মনে হয় সুধার কাছে। সুধার শিয়রে সে মাথা নীচু করে বসে থাকে। চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। সুধা সকল সময় কেমন যেন আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে।

সেদিন হঠাৎ এক সময় ঘোর কাটলে, শিয়রে শঙ্করকে দেখে, তার বিবর্ণ মুখে মধুর সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে বললে, "তুমি এসেছ ?"

"আমি ত আজ তিনদিন হোল এসেছি সূর্যা।"

—"ওঃ", সূর্যা চোখ নীচু করে বললে, "তোমার মেয়েকে দেখেছ ? আমার কাছে তাকে আসতে দেয় না ; আমার এত দেখতে ইচ্ছে করে, কি বলবো" ?

শঙ্কর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "তোমারই মেয়ে ত সূর্যা, তুমি ত ওকে সারাদিন কোলে করে রাখবে। এখন একটু ভালো হয়ে ওঠো"—সূর্যার চোখ দুটি জলভারে টলটল করে উঠল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

শঙ্কর নীচু হয়ে নিজের ধুতির কোন দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, "ছিঃ সূর্যা কাঁদছো কেন ? লক্ষ্মীটি কেঁদোনা ; এরকম সময় সকলেরই অমন একটু আধটু শরীর খারাপ হয়। তার জন্য এমন মন খারাপ করে কি ?"

সূর্যা কোনও কথা না বলে শঙ্করের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নীমিলীত চোখে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর একটি নবজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শোনা যেতেই সে চকিত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসল। তার পেলব বাহু দুটি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে কাতর কণ্ঠে শঙ্করকে বললে, "ওগো, তুমি একবার যাও ; আমার মেয়েকে একবার আমার কোলে এনে দাও ? আমি একটু কোলে নিই ; ও আমার কোলে আসার জন্যই কাঁদছে" ; শঙ্করের স্থান ত্যাগ করার কোনও লক্ষণ না দেখে, সে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, "ওগো, তুমি যাও না ; কি নিষ্ঠুর তুমি"—

তার চিৎকারে আরুই হয়ে, যে যেখানে ছিল ছুটে সেই ঘরে এসে উপস্থিত হোল। শঙ্কর বিচলিত হয়ে তাকে শুইয়ে দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে, "মা ও মা, একবার এদিকে এস"—

বৃদ্ধা বোধ হয় ঘিতলে তাঁর পূজার ঘরে ছিলেন। পুত্রের আহ্বানে কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে সূর্যার অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন। ছিন্নমূল বৃক্ষতরীর মত সে তখন শয্যায় এলিয়ে পড়েছিল ; দূরের থেকে দেখে তাকে মৃত বলে সন্দেহ হয়। মাকে দেখে, শঙ্কর আশ্বস্ত হয়ে বললে, "মা, ওর মেয়েকে একবার কোলে নিতে চাইছে ; তুমি এখানে বোস একটু আমি নিয়ে আসি তাকে"—

যাক যদু তাহলে জীবিতা আছে। একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি পুত্রের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন। তার মানে সূর্যার সন্তানটি এখন মৃতপ্রায় ; তাকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং এ অবস্থায় তাকে রোগিণীর নিকটে নিয়ে আসা কি উচিৎ হবে ? শঙ্কর জানে সমস্তই ; এবং আর একটি সত্যও সে উপলব্ধি করেছে যে, সূর্যাও শীঘ্রই তার কন্যার সহযাত্রিণী হবে। তাই সে সূর্যার পানে একবার দৃষ্টিপাত করে পুনরায় জননীকে বললে, "তুমি আনতে বল মা, এখন আর ভালো মন্দ ভাবনা করার সময় নেই"—

"—তুই বোস বাবা, আমি নিয়ে আসছি তাকে" বলে বৃদ্ধা জননী কক্ষান্তরে গমন করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মৃতপ্রায় শিশুকে বক্ষে নিয়ে ফিরে এসে বধূর সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে ধীরে ধীরে ডাকলেন, "বউমা, বউমা, এই দেখ, আমার মাণিককে নিয়ে এসেছি, দেখ ওঠো"—

সূর্যা যেন গভীর তন্দ্রার মধ্যে থেকে জেগে উঠল। দুই চোখে তার ফুটে উঠল আকুল আগ্রহ ; দুর্বলতায় মুখ উঠতে না পেরে, হাত দুটী প্রসারিত করে বললে, "কই মা, আমার কোলে দিন ; দেখি একটু কেমন হয়েছে" ?

শঙ্কর সন্তর্পণে তাকে শয্যায় তুলে বসিয়ে দিল ; বৃদ্ধা নত হলেন, তাঁর হাত কাঁপতে লাগল থর থর করে ; এক জননী আর এক জননীর কোলে তার সন্তান অর্পণ করলেন। চোখের জলে তাঁর শীর্ণ বক্ষ প্লাবিত হতে লাগল। কন্যা কোলে নিয়ে সূর্যার সে কি আনন্দ ? যার যার নত হয়ে তার মুখ চুম্বন করেও আশ মেটে না ; অথচ এদিকে শিশু যে নড়ে না ; কাঁদেনা সেদিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। এক সময় ক্লান্ত হয়ে সে শঙ্করকে বললে, "তুমি একটু কোলে নাওনা গো ? আমি দেখি"—শঙ্কর হাত বাড়িয়ে নিস্পন্দ শিশুটীকে তার কোল থেকে তুলে নিল। তারপর তাকে বুকে চেপে ধরে, ধীরে ধীরে সে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। তার বৃদ্ধা জননী ধীরে ধীরে

এসে বধূর শিয়রে বসলেন। সূর্যার ব্যাকুল বিবর্ণ চক্ষু দুটি ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে কি. মহার্ঘ বস্তু যেন অনুসন্ধান করতে লাগল।

আষাঢ়স্যার রাত্রি ঘোর অন্ধকারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। মুমূর্ষু সূর্যার ঘরে আত্মীয় পরিজন সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছে। বৃদ্ধা শাশুড়ী বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। তারমধ্যে অতন্দ্র দুটি আঁখি মেলে স্থির হয়ে বসে আছে শঙ্কর। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও, আকাশের ললাটখানি তারায় তিলকে ভরা ছিল। তার পূর্বপ্রান্তে জল জল করে জ্বলছিল, শুকতারা; বাহিরের বাগান থেকে আতসী আর শিউলী ফুলের গন্ধ ভরা বাতাস, ঘরে প্রবেশ করে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছিল, যে ভোর হতে আর দেরী নেই। শঙ্করদের খিড়কীর দরজার দুপাশে দুটি প্রাচীন আমগাছ ছিল। একটির ফল ছিল বসুনে; অপরটির কাঁচামিঠে। দুটিতেই ফল ফলতো প্রচুর। এবং শাখা, প্রশাখা, ঘনপত্র রাত্রি ও পরগাছার বিস্তারে, গাছদুটির উপরিভাগ একত্রিত হয়ে, রচনা করেছিল একটি কৃত্রিম পাহাড়ের। সেই গাছ দুটির আশ্রয়ে নির্ভয়ে বাস করতো অসংখ্য পক্ষীকুল। নিস্তব্ধ রজনীতে তাদের ডানা ঝাপটার শব্দে এবং কর্কশ কণ্ঠের প্রহর ঘোষণায়, সমস্ত পল্লী সচকিত হয়ে উঠতো। খিড়কীর অদূরে দীঘির পাড়ে ছিল ঘন আগাছার জঙ্গল। সেই জঙ্গলে সুখে বাস করতো একজোড়া হুতুম প্যাঁচা। রাত্রি অন্ধকার হলেই হুতুম বিকট স্বরে ডেকে উঠতো "হুম, হুম," (হঠাৎ শুনলে মনে হবে, অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে কোনও মানুষ কথা বলছে।) সঙ্গে সঙ্গে হুতুমী জবাব দেয় "হুম হুম, হুম"—হঠাৎ সে স্বর শুনলে, আতঙ্কে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেদিনও সেই অমরন্তার ভীষণ রাত্রে, দীঘির পাড়ের জঙ্গলে, বিকট স্বরে প্যাঁচা ডাকছিল, এমন সময় আমগাছের মধ্যে থেকে বাজ পাখীর দল, কর্কশ স্বরে রজনীর শেষ প্রহর ঘোষণা করে উঠতেই, চমকে সূর্যা জেগে উঠল। ঘরের মধ্যে মৃদু শিখার প্রদীপ জ্বলছিল। জেগে উঠেই, সেই মৃদু দীপালোকে, ঘরের চতুর্দিকে চেয়ে সে তাকে খুঁজতে লাগল। শিয়রদেশ থেকে সরে এসে তার পাশে বসে শঙ্কর বললে, সূর্যা, কাকে খুঁজছ?

শঙ্করের মুখখানি ভালো করে নিরীক্ষণ করে সূর্যার চোখ দুটি গভীর আশ্বাসে শান্ত হয়ে এল। সে বললে, "তোমাকেই ত খুঁজছি, সেই কতক্ষণ থেকে; কোথায় ছিলে গো তুমি"? "আমি ত সারাক্ষণ তোমার কাছেই রয়েছি সূর্যা"?—পরম স্নেহে নত হয়ে শঙ্কর বললে, "তুমি বোধহয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে?"

"তাই বোধহয়; সূর্যা বললে," দেখছিলুম আমরা একটা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছি; এত উঁচু যে মাটীর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। তার পেয়ে আমি তোমাকে খুঁজছি, কত ডাকছি, কিন্তু তুমি আর আসছনা"? একটু থেমে সে আবার বললে, "পাহাড়টা কিন্তু ভারী সুন্দর"—

অনেকদিন পরে তাকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে দেখে শঙ্করের মনে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আশার সঞ্চার হোল। সে ভাবল, এবারে হয়তো সূর্যার কাঁড়া কাটলো। দূরে বহুদূরে, স্থির হয়ে আসা পূর্বাশার পানে চেয়ে, সে আসন্ন নবপ্রভাতের সূর্যকে মনে মনে প্রণাম করল। তারপর গভীর মমতায়, সূর্যার ললাটে একটি চুম্বন দিয়ে বললে, "তুমি ভালো হয়ে ওঠো সূর্যা; আমরা দুজনে ওই রকম সুন্দর পাহাড়ে বেড়াতে যাবো, কেমন?"

সূর্যা কপট অভিমান করে বললে, "আচ্ছা, আমার মেয়েকে না নিলে, আমি যেন যাচ্ছি তোমার সঙ্গে"—

শঙ্করের বুকের মধ্যে টন টন করে উঠল। সে মনে মনে শিউরে উঠে ভাবল, হায় সূর্যা, তোমার যে বঞ্চনা করেছি আমরা তার জন্য ভগবান যেন আমাদের ক্ষমা করেন। তুমি ভালো হয়ে ওঠো, সে মৃত মাংসপিণ্ড ব্রহ্মপুত্রের দুরন্ত স্রোতে ভেসে যাক, তাতে আমাদের কোনও দুঃখ নেই। চিন্ত সংযত করে সে বললে, "সে কি কথা সূর্যা? তুমি যাবে, আর তোমার মেয়ে যাবেনা, এ কেমন কথা? একি আমি বলতে পারি?"

সূর্যা খুশী হয়ে বললে, "সে আমি জানি"—তারপর এক সময় কণ্ঠস্বর খুব চেপে অতি কাতর স্বরে প্রশ্ন করলে, "হ্যাঁ, গো, আমি ভালো হবো ত ঠিক"?

"হ্যাঁ সূর্যা," আমি বলছি, "তুমি ভালো হবে. আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো" শঙ্কর তাকে আদর করে বললে। সূর্যা আবার সেই রকম স্বরে বললে, "দেখ আমি যদি মরে যাই, তবে তুমি কঙ্কাকে বিয়ে

কোর। ও বড় ভালো মেয়ে, বুঝেছ"? এই কথা শুনে শঙ্করের মনের অবস্থা যাই হোক; মুখে সে রাগ প্রকাশ করে বললে, "এসব কথা বললে কিন্তু আমি তোমার আর কোনও কথা শুনবোনা সুধা"—

"না তুমি রাগ কোর না;" সুধা কোমল স্বরে বললে, অসুখে আমার মাথার ঠিক নেই তাই বলেছিলুম। তুমি আমার কাছে এস্ আমি একটু ঘুমোই। আরও কাছে, এস; হ্যাঁ এই হয়েছে"—সুধা পরম আশ্বাসের সঙ্গে শঙ্করের কোলের মধ্যে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল। ধীরে ধীরে ভোরের মায়ামের মত নরম সুন্দর আলোয় সমস্ত পৃথিবী জেগে উঠল; শঙ্করদের বাগানের গাছে গাছে পাখীরা গান গেয়ে উঠল। বনে বনে ফুল ফোটাবার নেশায় আকুল হয়ে উঠল ভোরের বাতাস। আশৈশবের পরিচিত এই সুন্দর সকাল বেলাটি; শঙ্করের চোখে আজ যেন নতুন রূপে দেখা দিল। কি জানি তার কেমন যেন মনে হোল, এই নবোদ্ভিত প্রভাতটি ওর জন্য নতুন কিছু দ্রব্য বোধহয় নিয়ে এসেছে। সে মুগ্ধ হয়ে, সোনালী আর লালের আভা মাখা সাদা আকাশের দিকে চেয়ে রইল; তারপর মনে মনে প্রণাম করল, আকাশের মত অন্তহীন, রূপহীন, ভগবানের উদ্দেশে। যাঁর নির্দেশে প্রত্যহ প্রভাতে চোখ মেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সুন্দর আলোভরা পৃথিবীকে। ধীরে ধীরে নত হয়ে দৃষ্টিপাত করল, তার ক্রোড়ে শায়িতা সুধার পানে। সুধা ঘুমোচ্ছে; অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার রোগজীর্ণ সুন্দর মুখখানি ভারী প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। একখানি হাত দিয়ে শঙ্করের একটি হাঁটু সে সজোরে আঁকড়ে ধরেছিল: তন্দ্রার ঘোরে বন্ধন শিথিল হলেও; সে হাত স্থানচ্যুত হয়নি। বহুদিন পর সে প্রিয়তমকে একান্ত নিকটে পেয়ে পরম তৃপ্তিতে ঘুমোচ্ছে। শঙ্করের ভারী ইচ্ছে করতে লাগল, তাকে ডেকে এই সুন্দর ভোর বেলাটি একটু দেখায়? তার এই পুনর্জন্মের প্রত্যূষে আলোকের আশীর্বাদে তাকে অভিষিক্ত করে দেয়। পরক্ষণেই সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে ভাবলে, "আহা থাক, ঘুমোচ্ছে একটু ঘুমোক। এই দীর্ঘ দিন রোগ যন্ত্রণার মধ্যে এমন গভীরভাবে ও একদিনও ঘুমায়নি?" শঙ্কর মনে মনে আশ্বস্ত হোল, যাক, সুধা তাহলে এ যাত্রা থেকে রক্ষা পেল, তার ফাঁড়া কাটল। তাহলে সে মরে যাবে না—যে অমঙ্গল চিন্তা তাকে এতদিন ভিলে ভিলে দগ্ধ করছিল আজ ভোরে সেই নিষ্ঠুর চিন্তা তার মনকে যেন ভার মুক্ত করে দিল। ঘরের মধ্যে তখন সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন। শঙ্কর গভীর স্নেহে সুধার মর্বাঙ্গে একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে, নিজের পাশের তাকিয়ার উপর হাত রেখে তাইতে মস্তক রক্ষা করে গভীর ক্লান্তিতে দেহটি সামান্য একটু নত করে চক্ষু মুদ্রিত করল।

একসময় তুমুল কোলাহলে তার তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। ধড়মড় করে ওঠে বসে, ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতেই সে সবিস্ময়ে দেখল, সকলে উচ্চস্বরে রোদন করছে। আরও দেখল সুধাকে তার কোল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সে মুদ্রিত নয়নে শুয়ে আছে। তবে কি সুধা মারা গেল? কখন? কোন্ সময়ে? তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে, সেই সুযোগে?—এমন সময় শঙ্করের বৃদ্ধা জননী আর্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, "ওরে খোকা, আমার কি হোল রে? আমার ঘরের লক্ষ্মী কোথায় গেল; ওরে মা কে তুই কোথায় গেলিরে?" তাঁর আর্ত বিলাপে, শঙ্করের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। সে স্বাণুর মত বসে শুধু অদ্ভুত ভাবে চেয়ে রইল সুধার পানে। সুধা তবে সত্যই চলে গেল! না না এ হতে পারে না। সে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করতে যায় কিন্তু কিছুতে হাত ওঠে না। তথাপি মন মানে না। সে আকুল হয়ে শঙ্করকে নানারূপে তাড়না করে, কিন্তু শঙ্করের নড়বার শক্তি যেন হারিয়ে গেছে।

সেই পরিচিত গৃহ, পরিচিত আসবাব পত্র, পরিচিত দ্রব্য সম্ভার, তথাপি একজন পরিচিত জনের অভাবে সে গৃহ আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সেই শ্মশানে সন্ন্যাসীর মত ঘুরে বেড়ায় শঙ্কর; তার চোখের সামনে সব সময় ভেসে বেড়ায় সুধার সেই সুষমাময়ী মূর্তিখানি, কানের পাশে অহরহ বাজতে থাকে তার প্রিয় কথাগুলি; তার শত শত আব্দার, অভিমান; অন্যায় অহঙ্কার; সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি নিজের দুর্ব্যবহারের কথাগুলি মনে পড়ে তার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। হায়, শঙ্কর যদি জানতো, সেই রাত্রিশেষের আলাপনই, তার শেষ আলাপ, তবে শঙ্কর

তাকে জাগিয়ে রেখে সে রাত্রি আরো দুটো কথা বলে নিতো, আর একবার সাধ মিটিয়ে দেখে নিতো, তার জীবন্ত মুখখানি, কিন্তু হায়, সে কিছুই জানতে পারল না। ঘুমোবার ভান করে সে তার কাছে চির-বিদায় নিয়ে চলে গেল। শঙ্কর এখন শত সহস্র চেষ্টা করলেও তাকে আর দেখতে পাবে না; তার সঙ্গে একটি কথাও কইতে পারবে না। যে ছিল, একান্ত নিকট, সে আজ কতদূর? মৃত্যুর কি রহস্য? একটি জন্মের জন্য দুটী মৃত্যুর প্রয়োজন হোল? সৃষ্টি রক্ষার একি অদ্ভুত নিয়ম? শঙ্কর উন্মাদের মত শূন্য কক্ষে ঘুরে বেড়ায়; কখনও তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে অবিরল ধারার অশ্রু; আবার কখনও তার চোখে ফুটে ওঠে অটল কাঠিন্য। পুত্রের মুখের পানে চেয়ে জননীর বুক হাহাকার করে ওঠে। তিনি কি বলে সান্ত্বনা দেবেন তাকে ভেবে পাননা—শুধু নীরবে কাতর চোখে তার মুখের পানে চেয়ে থাকেন। শঙ্কর সে দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

ঝাড়-পাট মিটে গেলে, শঙ্কর বললে, "মা, আমার ত এবার কোলকাতায় যেতে হবে, সেখানে কাজ কর্ম সব পড়ে রয়েছে, বেশী একলা পেরে উঠছে না হয়ত।"

বৃদ্ধা নীরবে পুত্রের মুখের পানে চেয়ে রইলেন কোনও কথা বলতে পারলেন না।

শঙ্কর বললে, "মা, এবারে তুমিও আমার সঙ্গে চল; কি বল যাবে?"

বৃদ্ধা ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ বাবা যাবো?" "সত্যি যাবে মা?" শঙ্করের যেন বিশ্বাস হয়না। তিনি তেমনি ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন "হ্যাঁ বাবা যাবো"—

কিন্তু তোমার ঠাকুরের পুজো, সন্ধ্যাবেলায় তুলসী-তলায় প্রদীপ দেওয়া সে সব কে করবে?" বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে শঙ্কর বললে। বৃদ্ধা নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, সে সব আমি বিসর্জন দিয়েছি; যার জন্য যত্ন করে রেখেছিলুম সেই যখন চলে গেল তখন আমার মিথ্যা পণ্ডশ্রম করে লাভ কি?"

"মা", শঙ্কর গভীর ভাবে চমকে উঠে ডাকলে, "মাগো ঠাকুরের তুমি কি করলে?"

"ব্রহ্মপুত্রের জলে বিসর্জন দিয়েছি বাবা," বৃদ্ধা তেমনি উদাস কণ্ঠে বললেন, "জানত আমি কোনও অন্যায় কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না। তা সত্ত্বেও ঠাকুর যদি আমায় এত বড় দুঃখ দিতে পারেন, তবে আমিই বা তাকে দুঃখ দেবনা কেন?"

"আমার যাদের শ্মশান যাত্রার দিন, তাকেও নিজ হাতে বিসর্জন দিয়েছি ব্রহ্মপুত্রের জলে। (ক্রমশঃ)

আসমুদ্র বেলা

শ্রীবীরেন বসু এম্-এ,

প্রান্তহীন দিগন্তের দূর অন্তরালে
সীমাহীন সমুদ্রের দিক্‌চক্রবালে
টানি' দিয়া ধীরে রক্তিম আলোক রেখা,
সমাপিল দিনান্তের শেষ অন্তলেখা
বিদায় সমুদ্ধ রবি, নিল মানি শিরে
সাবলীল জলধির নীলাম্বর নীরে
প্রবোধের নিত্য বিসর্জন। শিখাহীন
আলোরশ্মি পরিক্রমা পারে হ'ল লীন
সিঁদুর ছটায় বিধবি ললাট পরে।
ধীর বক্ষস্থল ছুড়ে মৃদু গতিভরে
কতিপয় পালতোলা, পণ্যভারবন্ত
বাণিজ্য তরণী তটপানে অভ্যাগত।

পরপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ডিঙি, লঘু দাঁড় ফেলি
তরঙ্গ লহরী সনে করে বুঝি কেলি।

"আশা আছে মনের গহনে"

শ্রীনন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়

"যৈ ত পিয়াসল সহমিলি জাগিরে"…

"মনসিজ! মনসিজ!! ফিরে এসেছ তুমি? কোথায় তুমি? একবার চোখের সামনে এসো—একবার কথা কও! তুমি কি তোমার মালশ্রীর আহ্বান শুনতে পাচ্ছো না?"

শ্বেতশুভ্র সরোবরে নিশ্চল হয়ে গেলো একটি শ্বেতপদ্ম। বাতাসে দোলাতে পারছে না তার একটী পাপড়িকে। মালশ্রী শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। যখন 'মালকোষ' অন্তরায় চলেছে—

……বহুত দিন না পাছে নয়ারল নয়া চন—

"আঃ। কে আছো, থামিয়ে দাও এ সুর, থামিয়ে দাও এ গান! না—না, আমি শুনতে চাই না—না-না—"

একটা আর্ত্ত চীৎকার শুনে মনোরঞ্জনাদেবী ছুটে এলেন। একি! নার্স? আয়া? তোমরা কোথায় গিয়ে আড্ডা জমালে? একবার এদিকে এসো। রোগী অজ্ঞান হয়ে রয়েছে আর তোমাদের কোন পাত্তা নেই? এরই নাম কি কর্ত্তব্য? তোমাদের মাসে মাসে মাইনেটা দেওয়া হচ্ছে—কিসের জন্যে?"

"আজ্ঞে দিদিমণি ত বল্লেন তাকে একটু একলা থাকতে দিতে, তাই আমরা…"

"থামো। রোগী মানুষ সে, রোগে ভুগে ভুগে তার কি মাথার ঠিক আছে? সে বল্লো বলেই তোমরা চলে গেলে; বেশ সামনে না থাকো কাছাকাছি থাকলেই ত পারতে তা নয়……যত সব বাজে ওজর্ব"

"আজ্ঞে, আমরা কাছেই ছিলুম, চীৎকার শুনে ছুটে আসছি আর আপনিও ডাকলেন।

"আচ্ছা! খুব হয়েছে। কাছাকাছি থাকলে ছুটে আসার যে প্রয়োজন হয় না—আশা করি একজন শিক্ষিতা নার্সকে বুঝিয়ে বলতে হবে না? যাক্ এখন এসব বাজে কথা। তুমি এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকো, আমি ওষুধ বদ্লে একটা আনছি।"

"শ্রী? শুনছো?"

"উ—হুঁ!"

"শুনছো না ত সাড়া দিচ্ছে। কি করে?"

"কই সাড়া দিলাম? শুধু ত উঁহুঁ বলেছি।"

"ওটা বুঝি সাড়া দেওয়া হলো না? শুনতে না পেলে 'উঁহুঁ' ও বলা যায় না, তা বুঝি তোমার জানা নেই?"

"আচ্ছা বেশ! জানা নেই ত নেই। কেবলই কথায় খুঁত ধরা।"

"রাগ যদি হয় তবে না হয় বিদায়ই নিই, কি বলো?"

"দেখো মনু, খুব খারাপ এখন যদি চলে যাও।"

"তবে আমায় কথার জবাব দাও—বলো তুমি"…

"আমি কানে কানে বলবো।"

"বেশ তাই হোক দেবী।"

অনেকটা এগিয়ে এলো মনসিজ, মালশ্রীর কাছে মাথাটা নীচু করলো কথাটা শোনার জন্যে। কিন্তু মালশ্রী কিছুই বলছে না যে—

"কই বলো? আমি এইভাবে মাথা নিচু করে বসে থাকবো নাকি?"

"হ্যাঁ ত! আবার দেবী বলছে কেন? আমি কিছুতেই জবাব দেবো না। না—না-না এই তিন সত্যি' করলাম।"

"আচ্ছা আর বলবো না-নানা, আমি ও তিন সত্যি করলাম, এখন খুশী ত? আচ্ছা, শ্রী, তোমাদের সমাজের সভ্যরা এই কথাটা শুনলে কি বলবে জানো?"

"কি শুনি?"

"নাক কুঁচ্‌কিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে বলবে 'হাউ ডার্টি।'

"আচ্ছা বেশ আমাকে আর চাঙ্গা করতে হবে না। আমি চললাম।"

"কিন্তু এই স্থানটি অতি পরিচিত হলেও আমি হলপ্ করে বলতে পারি, তুমি যদি সারাদিন, সারা রাত চলো তবুও বাড়ি পৌঁছতে পারবে না। ভাইভাইকে ত আমার ভরসায় বিদেয় করেছ, এখন আমাকে ফেলে যাবে কোথায়?"

"দেখো, বিপাকে ফেলে মজা দেখতে সকলেই পারে কিন্তু মনুর তা করা উচিত নয়। সে শুধু গান শুনিয়ে খুশী করতে পারে কোন কাজে কাজ করা তার সাজে না।"

খুশীতে, চঞ্চল মনসিজ আরও অস্থির হলো—

"আর গান শুনতে বুঝি পারে না? সেটা ত আর কাজে কাজ নয়?

"গান শোনা খুবই ভাল কাজ, তবে সে বিষয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন খুব আস্তে, 'হিন্দোল' সুরু করো। গুরুজী বলেন 'হিন্দোল' বসন্তেরই, অতএব....."

"বেশ তোমারই জয় হোক, আমার কিন্তু অভাব চাই।"

"পাবে! গান শেষ হলে সেটা হবে পুরস্কার।"

এ সকল কথা, গান, গল্প প্রায় তিন বছর আগে থেমে গেছে। তারই ফলে মালশ্রী আজ সকল শ্রী হারাতে বসেছে।

(৩)

মালশ্রীর স্বাভাবিকতা প্রায় ফিরে এসেছে—

"মনু?"

"কেন মণি, খুব কষ্ট হচ্ছে না?" মনোরমা দেবীর কণ্ঠে আকুল উদ্বেগ ঝরে পড়লো।

"তুমি? আমি ভেবেছিলাম মনু বুঝি ফিরে এলো।"

"সে ত দিল্লীতে, তাত তুমি জানো মা মণি। এখানে কি করে আসবে অতদূর থেকে?"

"তুমি আমায় ছেলেমানুষের মত ভোলাতে চেওনা মা, বাবা ১৫ দিনে জার্মাণী থেকে এসে গেলো আর দু'বছর ন'মাসেও মনু দিল্লী থেকে ফিরতে পারলো না। আমার মনে হয় তুমি কি যেন লুকিয়ে রাখছ আমার কাছে। বোধহয় মনু আমায় ভুলে গেছে তাই তুমি আমায় কিছু বলতে চাও না। বেশ না বলো আমিও কিন্তু আর কারুর সঙ্গে কথা বলবো না, কিছুই করবো না।"

অভিমানে আর বেদনায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো তার। মনোরমাদেবী প্রাণপণে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মায়ের হাতে কি যাদু আছে জানিনা—অল্পক্ষণেই ছোট মেয়েটির মতই মায়ের আদরে, ঘুমিয়ে গেলো মালশ্রী।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মনোরমাদেবীর মনে পড়লো অনেক কথা.....

এক আষাঢ় সন্ধ্যায়, একটি মাত্র স্নেহের পুতুলিকে, মনোরমার হাতে তুলে দিলেন তাঁর আবাল্য-সখী, রাণী মহুয়ী। অশ্রুসজল চোখে মিনতি জানিয়েছিলেন মনোরমাকে তাই, বিষয় সম্পত্তি ত তোকে দেখতে হবেই কিন্তু সবচেয়ে শক্ত কাজের ভার তোকে দিয়ে যাচ্ছি। আমার মনসিজকে গড়ে তোলার ভার সে শুধু তোরই। আজ রাজা বাহাদুর জীবিত থাকলেও আমি এই ব্যবস্থাই করে যেতাম। তুই ছাড়া আর ত কারুর কাছে ওকে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। আজ পরম নিশ্চিন্ত মনে ভাই বিদায় নিচ্ছি এই পৃথিবী থেকে.....

মনসিজ! সাক্ষাৎ মনসিজই বটে। মালশ্রী তখন কোথায়? এই মনসিজই ছিলো তার বুক জুড়ে—এখনও আছে। মনু আর মণি একই সাথে মিশিয়ে আছে তাঁর অন্তরের অন্তপুরে—ঘরে বাইরে, সর্বত্র মনু আর মণি! মণি আর মনু!

পাঁচ বছরের ছোট বড় ওরা দু'জনে। শৈশবের প্রীতি ভালোবাসা—যৌবনে সুন্দর রূপ পেয়েছে—প্রেমে! মনোরমাদেবী নিজের হাতে গড়া পুতুল দু'টোর রকম দেখে আনন্দে অধীর কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। একদিন বোঝেন এখন ওদের বাঁধার সময় আসছে। খুশীতে উছলে আয়োজনে মন দিলেন কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে নয় মানুষ কি করবে? কোথা হতে কাল বৈশাখীর ঝড় ছুটে এসে সবকিছু ওলট্ পালট্ করে দিলো...

মা মণি আমি আজই বেনারস যাবো।"

"আজ গেলে মণি যাবে কেমন করে?"

অবাক বিস্ময়ে 'বেয়াদবী মনুর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেন।

"মালিকে ও সঙ্গে নেবো না, আমি একলাই যাবো।"

মনে মনে থমকে যান মনোরমা। "যদি যাবে না?" ওকে না নিয়ে যে একপা নড়তে চায়না তার আজ হলো কি? এ কিসের পূর্ব্বাভাস? তাই একদিন কেমন জানি খাপছাড়া ভাব দেখছি "সঙ্গীত সম্মেলন" থেকে ফেরার পরই। আবার কি খেয়াল চাপলো মাথায় কে জানে? জিজ্ঞেস করলেন "বেশ মালি না হয় নাই গেলো কিন্তু তুই হঠাৎ বেনারসই বা যাচ্ছিস কেন? আর কবেই বা ফিরবি তাও ত জানতে দিচ্ছিস না। কি ব্যাপার সব খুলে বল!"

"গান শিখতে যাচ্ছি মা। কিন্তু মালিকে বলো না—তাহলে যেতে দেবে না। সঙ্গীত এ সিদ্ধিলাভ করতে চাই আত্মবিলোপকারী সাধনা! নইলে ও সুরেই রয়ে গেলো। তুমি তাই চাও মা তোমার মনুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকুক? না, আমি জানি তা তুমি চাও না। অনুমতি দাও আজই রওনা হয়ে যাই? তুমি ত অনেক গুণীর কাছেই শেখার সুযোগ দিয়েছে—এটাও দাও? কবে ফিরবো ভেবে অস্থির হয়োনা, আমি কি আর ছোট আছি? লক্ষ্মী মা আমার অবুঝ হয়ো না।"

বাধা দিতে পারেন নি তিনি। তার উদাস প্রকৃতিকে, রোধ করতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তা তার ছিলো না। তাছাড়া তার প্রতিরোধ বোধ হয় সম্ভবও ছিলো না, কারণ 'যৌবন জল-তরঙ্গ রুধিবে কে রে?' যাইহোক তাঁর সেই সেদিনের অক্ষমতাই একটি মাত্র মেয়ের অসুখের কারণ। মালশ্রী বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে পাটনায় গিয়েছিলো, সেবার সুযোগ বুঝে মনসিজ চলে গেলো বেনারস, তারপর দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটনা এলাহাবাদ প্রভৃতি নানাস্থানে ঘেড়াতে লাগলো গানের মোহে। দিনের পর দিন সুরের পিপাসা বেড়েই চললো। আজ এখানে কাল সেখানে। গান ছাড়া আজ তার কিছুই মনে নেই। গান শুধু গান! জীবনে মরণে সে যেন সংগীতেরই পূজারী—আজীবন যেন তাকেই সে ভালোবেসেছে, চেয়েছে আপন করে, কারুর সে নয় কেউ তার নয়। কোথায় মালশ্রী, কোথায় মনোরমা কিছু তার মনে আসে না।

মালশ্রী আজও বোঝেনি কেন এমন করে চলে গেলো মনসিজ—তার আশা আবার সে ফিরে আসবে, আবার দেখা হবে তাদের!

কিন্তু মনোরমা জানেন মনসিজ আর ফিরবে না, উদ্দাম জলস্রোত যদি একবার বেড়া ভেঙ্গে ফেলতে পারে তবে আবার কি সে ফিরে যায় তার উৎপত্তি স্থলে, না সে তাই করতে পারে? দু'হাতে টাকা খরচ করে চলেন, পাছে তাঁর মনু বিদেশে কষ্ট পায়। তিনি জানেন মনু এখন যাত্রাকে, তবু মালশ্রীকে বলেন সে দিল্লীতে আছে। তিনিই যে তাকে বুঝিয়েছেন তাঁরই প্রয়োজনে মনুকে দিল্লীতে যেতে হয়েছে এবং থাকতেও হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনটা বলতে পারেন না। কারণ কি আর বলার আছে? কিন্তু আর কতদিন—কতদিন এই মিথ্যা প্রবোধ দেবেন মেয়েকে? একদিন ত সবই জানতে পারবে। তবুও বলতে পারে না সত্যি কথা। সব জেনে শুনেও যে তাঁর মন মানে না—

"মাগো, মা যদি? দেখ না চেয়ে এসেছে?"

এমন করেই তাকে দিয়ে চরতে সে একদিন সামনে এসে দাঁড়াবে।

বিজেতা

(গল্প)

শ্রীঅরুণ সরকার

গেট দিয়ে মটরটা ঢুকে গাড়ী বারান্দার নীচে এসে থামল। তরুলতা গাড়ী থেকে নেমে দুইং রুমের দিকে এগিয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়েই থেমে গেল। তরুলতার মনে হল ঘরের মধ্যে কে যেন বসে আছে। সবে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। বাইরের আলো জ্বলেছে। অথচ ঘরের আলো এখনও জ্বলেনি। তরুলতা মনে মনে চাকুর চাকরদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠে! আলোটাও জ্বালতে পারে না!

বিরক্ত হয়েই বলে উঠে—কে?

"আমি, রমেশ"। রমেশ দাঁড়িয়ে জবাব দেয় নাম শুনে তরুলতা চমকে উঠলে। পাশের বাড়ীর মুহুরীর ছেলে। শুনেছি এম, এ, পড়ে। সাধারণ গৃহস্থ। কিন্তু ওদের সঙ্গে বাবা সমানে বিবাদ করে চলেছেন।

রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল।

—তরুলতা বিরক্ত মুখে বলে উঠলে—'এখানে কি দরকার'।

'আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছি'। রমেশ বল্লে!

'কি কথা'!

—'আজ সকালে আপনাদের মালি আমার ছোট ভাইকে মেরেছে। তারপর থেকে এখনও পর্য্যন্ত সে জ্বরে আছড়। অপরাধ, সে কয়েকটি গোলাপ ফুল তুলেছিল।"

—"কিন্তু সেটাও ত অপরাধ"। তরুলতা জবাব দেয়। তা ছাড়া ও কথা আমায় না বলে বাবাকেই বলা উচিত ছিল। তরুলতা পুনরায় বলে উঠে।

রমেশ নিমেষ মাত্র তরুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে মেয়েটার মুখে এক কোঁটাও কোমলতার ভাব নেই। করুণাময়ী বল্‌তে কি এদেরই বুঝায়?

—আপনার বাবার দেখা পাইনি বলেই আপনাকে জানিয়ে গেলাম।

—"একটা আট বছরের ছেলের পক্ষে কি এটা বেশী অপরাধ"—রমেশ প্রতিবাদ করলে ধীরে ধীরে। বড়লোকের তলেজে পড়া মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে বেন ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে তার।

—"অপরাধ" এইটুকুই যথেষ্ট। কম কি বেশী তা জানার দরকার নেই, বলে হট্ হট্ করতে করতে চলে যায় তরুলতা।

তরুলতার চলে যাওয়ার পথের দিকে এক নজর তাকিয়ে আস্তে আস্তে গেটের পথে এগিয়ে যায় রমেশ।

তরুলতা সন্ধ্যে থেকে পড়ার টেবিলে সে বৃথাই বসে কাটিয়েছে। খাওয়ার যখন তাক পড়ল দেখল এক পাতাও তার পড়া হয়নি। খাওয়ার পাঠ চুকিয়ে বাইরে বারান্দায় বসে তারা তরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। "আপনাদের মালি আমার ছোট ভাইকে মেরেছে। অপরাধ কয়েকটা গোলাপ ফুল তুলেছিল। এখনও সে জ্বরে আছড়।" এ কথাগুলো মনে পড়তেই তরুলতা শিউরে উঠল! ফুল তোলার অপরাধ যার কেন। বকুনি দিলেই কি হতো না। মূলো চুরির ফাঁসী। বাবার কেন যে ঐ পরিবারের ওপর এত হিংসে তা বুঝি না। ওদের এতটুক অপরাধ বাবার কাছে তা শতগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। শুনেছি রমেশের বাবা কমলেশবাবু কোন উকিলের মহুরী। জমি কিনে বাড়ী করেছেন, বাবার কি খেয়াল হল, তার কিছু জমি নাকি ওরা বেদখল করে নিয়েছে। মামলা করলেন কমলেশবাবুর নামে। কমলেশ বাবু ভাল মানুষ। কি করবেন, মিটমাটের চেষ্টা করলেন। বাবা গররাজী। শেষে তিনিও পাল্টা মামলা করলেন যে তার জমি জোর করে নেবার চেষ্টা করছেন বিলাসবাবু।

মামলা চলল। বাবাই ও হেরে গেলেন। ঢং ঢং করে ঘড়িতে বারটা বাজার পরে তরুলতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

কলেজে যাওয়ার পথে হঠাৎ গাড়ীটা থামাতে বলে তরুলতা। গাড়ী থেমে যায়। তরুলতা নেমে পড়ে, কলেজ স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে যায়। ফুটের পুরানো বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে রমেশ যেন কি বই কিনছে। হাতে ঠোঙায় কিছু ফল। তরুলতা এগিয়ে যায়। রমেশের পোষাক বলতে সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী। পায়ে বিদ্যাসাগর চটি। রমেশ একটা বই ধর করে কিনে নিয়ে এগিয়ে আসতেই তরুলতার সামনে পড়ে গেল। রমেশ থেমে যায়। তরুলতা ক্ষণিকের জন্যে চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে রমেশ চলতে আরম্ভ করেছে। দু'একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে তরুলতা বলে উঠল শুনুন। রমেশকে কোন উত্তর না দিতে দেখে তরুলতা আগে খানিকটা এগিয়ে যায় তারপর আবার ডাকলে—

—রমেশবাবু!

—রমেশ থেমে যায়। তাকিয়ে দেখে তারই পাশে তরুলতা দাঁড়িয়ে। মুখখানা তার থমথমে। রমেশ বললে—একি আপনি!

—হ্যাঁ, ভাইটি কেমন আছে?

রমেশ বিস্ময়াভিভূত হয়ে তরুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নেয়।

সংক্ষেপে বলে উঠে, ধন্যবাদ। তারপর দ্বিরুক্তি না করে চলে যায় রমেশ।

মনে হ'ল তরুলতার মুখের উপর কে যেন এক পোঁচ কালি ঢেলে দিল।

তরুলতা কোন রকমে টলতে টলতে একটা রিক্সার চড়ে বাড়ী চলে যায়। কলেজে যেতে পারল না।

ঘরে খিল দিয়ে তরুলতা বই ফেলে দিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে। এভাবে অপমান তাকে আর অবধি কেউ করেনি। কেন? কি সে করেছিল রমেশের। তার ভাইয়ের খোঁজ নেওয়া কি অপরাধ!

রমেশ কি সেদিনের অপরাধের শোধ নিল! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে তরুলতা। অনেকক্ষণ পর সে নিজেকে সামলে নিলে। না, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

তরুলতার বাবা বিলাসবাবু বিটারার করেছেন। বড় মুলু স্বভাবের লোক। সরকারী অফিসেই তার বদনাম ছিল এ বিষয়ে।

তিনিই মালিকে দিয়ে ফুল তোলার লাঠা দিয়েছিলেন। মামলায় হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা আজও আছে।

তিনি শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন।

তরুলতা ঘরে ঢুকে বাবার বিছানার পাশে বসে পড়ে। বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

তরুলতা বলে, জান বাবা! পাশের বাড়ীর ছোট ছেলেটাকে মালি খুব মেরেছে ফুল তুলেছে বলে।

—কার ছেলেরে মা? বিলাসবাবু জানতে চান।

—ঐ যে কমলেশবাবু না কে?

—ও তা ঠিকই করেছে। অপরের ফুল তোলার জন্যে ত আর গাছ করিনি।

—হ্যাঁ বাবা ঠিকই করেছে।

—তা হলে মালিকে একটু ডেকে আদর করতে হয়, কি বলিস মা। বিলাসবাবু মেয়ের সমর্থন চান।

—হ্যাঁ বাবা, ডেকে একটু আদর করে দিও।

বিলাসবাবু হা হা করে সশব্দে হেসে উঠেন।

কয়েকদিন পর। ক্লাসে তরুলতার নামে একটা স্লিপ এল। কমনরুমে কে একজন তাকে ডাকছেন।

তরুলতা এসে অবাক। একি রমেশ বসে আছে!

রমেশ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—

—এটা কোন রেস্ট লতাতা?

তরুলতা আরো ঘাবড়ে গেল। সে কিছুই বুঝল না। রমেশের চুলগুলো এলোমেলো। মুখে চিন্তার ছায়া।

কি হয়েছে তরুলতা জানতে চাইল।

—কি হয়নি তাই বলুন! আমাদের আর কতভাবে অপমান করবেন।

আপনি অধীর না হয়ে বলুন না কি হয়েছে? তরুলতা একটু কঠিন স্বরেই প্রশ্ন করে।

আপনাদের মালী কোথায় মারামারী করেছে; আমার

বাবার নামে শমন জারী হয়েছে। তাঁকে কোর্টে হাজির হতে হবে, নইলে তাকে বডি ওয়ারেণ্ট করা হবে।

—তরুলতা চমকে উঠল। কমলেশবাবু মালীকে মারবে? একি সম্ভব? না না, তা কখন হয়। 'কিন্তু'—

না, তরুলতা নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেয়।

দেখুন আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন। এটা বাড়ী নয় কলেজ। আর আমি এখানে পড়ছি। কে কোথায় মারামারী করলে বা ছেলে গেল তা আমার জানবার দরকার কি।

তরুলতার তীব্র উক্তিতে রমেশ জ্বলতে লাগল। জবাব দিতে গিয়ে দেখে তরুলতা নেই।

কমলেশবাবু অকারণে কোর্টে পঞ্চাশ টাকা ফাইন দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। কেবল ভগবানের কাছে এর বিচার প্রার্থনা করলেন।

বাড়ীতে এসে বিলাসবাবু বললেন, দেখলি ত মা কেমন করে কমলেশকে কাঠগোড়ায় তুলেছিলাম। সম্পত্তি ছিল ভাল। শুনে পঞ্চাশটি টাকা দিতে হল ফাইন। আমার সঙ্গে চালাকী, বলে শব্দ করে হেসে উঠেন।

তরুলতা ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে যায় দু'হাতে কান দুটো চেপে ধরে।

রাস্তায়-কমলেশবাবুকে দেখলে বিলাসবাবু সরে যান। কমলেশবাবু বিলাসবাবুকে দেখলে এগিয়ে যান তাঁর দিকে।

সেদিনও দুপুরে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটে পুরানো বই কিনে ওপর পারে বৃষ্টি পড়তেই তরুলতা ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল। মনে মনে যাকে খোঁজ করছিল সেই ত ঐ দোকানে দাঁড়িয়ে।

বাবু অভিনন্দনটা জানান উচিত। আমার তরফের ত্রুটি নেয়ে রাখা ভাল। কি ভাগ্যিস কাগজটা দেখেছিলাম। ইংরাজীতে কার্ড ক্লাস কার্ড হয়েছে।

রমেশ বই কিনে রাস্তায় নামতেই কানে এল, এই গেল, গেল, গেল শব্দ।

রমেশ চোখের নিমেষে রাস্তার মাঝে পড়ে মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতেই নিজে চাকার তলায় পড়ে গেল। সশব্দে বাসখানা থেমে গেল।

মেডিকেল কলেজ থেকে ফোন এল বিলাসবাবুর কাছে। হাসপাতালে ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে তিন নম্বর বেডে রোগী রয়েছে।

বিলাসবাবু ছুটল ট্যাক্সি করে। কার কি হল! তরু ত এখনও কলেজ থেকে বাড়ী ফেরেনি।

নার্স দাঁড়িয়ে আছে রমেশের কাছে। রমেশ অচৈতন্য হয়ে শুয়ে। মাথায় মুখে ব্যাণ্ডেজ জড়ান। তরুলতা মাথার কাছে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। কমলেশবাবু যেন পাথর হয়ে গেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের পাশে।

নার্স দু'জনকে ডেকে এনে বললে, তরুলতাদেবীকে বাঁচাতে গিয়ে উনি মটর চাপা পড়েছেন। তরুলতার কোথাও লাগেনি। তবে আজকের রাত না কাটলে বোঝা যাবে না। রমেশবাবুর মাথায় আঘাত লেগেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে কমলেশবাবু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, রমেশ আমার আর বাঁচবে না মামা!

নিশ্চয়ই বাঁচবে, ভাই। দেখছ না তরুমা নিজে সেবা করার ভার নিয়েছে। বিলাসবাবু গলার চাদর দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে নেন। তারপর বলে উঠলেন, চল বাড়ী যাই! বলে মটরে দু'জনে পাশাপাশি বসলেন।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা মিউজিয়মের ট্রাষ্ট বোর্ডের মহিলা সভানেত্রী

কলিকাতা মিউজিয়াম ভারতের সর্বপ্রাচীন ও প্রধান একটী বিশিষ্ট সংগ্রহশালা। ইহার প্রতিষ্ঠা শতবর্ষ পূর্বে হইয়াছিল। এই শতাধিক বর্ষের মধ্যে ইহার ট্রাষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট জ্ঞানী ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ দেশী-বিদেশী ব্যক্তি হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে মাননীয়া লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় ট্রাষ্ট বোর্ডের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গলার নারী সমাজের ইহা পরম গৌরব। তাহার নেতৃত্বে আশা করি সুকুমার ও নারীদের হস্ত শিল্প সংগ্রহ পুষ্ট ও গৌরবান্বিত হইবে।

মুক্তন মহিলা ডি, ফিল

অধ্যাপিকা শ্রীমতী দিল্লী ত্রিপাঠী সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, ফিল উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

মহিলা অভিনেত্রীর সরকারী বৃত্তি

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার, বাংলার সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ধারক শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে ভারত সরকার মাসিক ১৫০৲ দেড় শত টাকা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বাংলার কথ্য সাহিত্য সৃষ্টি কার প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়ের পত্নী, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির চির সহায়ক। রবীন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর আই, সি, এস, মহাশয়ের কন্যা। তাঁহাকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ভারত সরকার বাঙ্গলার ও ঠাকুর বাটীর শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য সৃষ্টির আদর করিলেন।

ইংলণ্ডে ফুটবল লীগের মহিলা সম্পাদিকা

লণ্ডনে ক্রীষ্টাল প্যালেস ক্লাবের ফুটবল লীগ এসোসিয়েসনের সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইলেন মিস্ মারগ্যারেট ঘণ্টেণ্ড। বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। তিনিই ফুটবল লীগের প্রথম মহিলা সম্পাদিকা।

ইংলণ্ডে নেতাজী কন্যা

পরম পূজ্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যারূপে খ্যাত শ্রীমতী এমিলি ও অনিতা বসু ইংলণ্ডে কয়েক দিন ভ্রমণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। অনীতা বসু বাঙ্গলা পড়িবার ও ভারতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দ বাজার পত্রিকা অফিসে গিয়া নেতাজী ও মহাত্মাজীর ছবির দিকে সশ্রদ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ তাকান এবং—ভক্তিতে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠে।

কাঠে তৈরী মূর্ত্তির মহিলা শিল্পী

সম্প্রতি কলিকাতার আর্ট ষ্টুডিও হাউসে শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায় কাঠের মূর্ত্তি শিল্পের একক একটি প্রদর্শনী করেন। ইহাতে ১৮টী মাত্র প্রধান-প্রধান মূর্ত্তি দেখিলে শিল্প সাধনায় বলিষ্ঠতা ও অকপট আন্তরিকতা উপলব্ধি হয়। তাঁহার উদ্যম জয়যুক্ত হউক।

পরলোকে ক্ষীরোদা সুন্দরী

৯৬ বৎসর বয়সে বিখ্যাত ইলেক্ট্রিক কোম্পানী 'ফিলিপস্-এর প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডাইরেক্টর শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায় মহাশয়ের মাতা ক্ষীরোদা সুন্দরী দেবী পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ভগবৎ বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, সমাজ সেবার স্পৃহা অনুকরণীয়।

বিশ্বসুন্দরী

কলম্বিয়ার নারী নাহিনা জোয়ালারগো ১৯৫৮ সালের বিশ্বনারী সৌন্দর্য্য প্রতিযোগীতায় ৩৭টী দেশের নারীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বিবেচিত হইয়া "বিশ্ব সুন্দরী" খ্যাতি পাইয়াছেন। ১৯৫৭ সালে—গ্রেচেন হেগুার 'বিশ্ব সুন্দরী' সম্মান পাইয়াছিলেন।

বঙ্গের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্রী

কুমারী স্বপ্না গুহ—গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আই. এ, পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি শিলংএর লেডী কেরী কলেজের ছাত্রী। তাহার পিতা চক্ষুরোগ চিকিৎসক ডাঃ জি, এস, গুহ। কুমারী মিনতি চক্রবর্ত্তী সাগর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত, দর্শন ও ইংরাজি ভাষা লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বি, এ, পাশ করিয়াছেন। ১৯৫৬ সালে আই-এ পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী দীপালী মল্লিক পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে ১ম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বি-এ, পাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী

বর্ত্তমান বর্ষে (১৯৫৮ সালে) বি-এ পরীক্ষায় কেতকী কুশারী ইংরাজীতে ১ম শ্রেণী, মীনাক্ষী ঘোষাল সংস্কৃত ১ম লেডী ব্রেবর্ণ, মল্লিকা ঘোষ – সংস্কৃত ২য় লেডী ব্রেবর্ণ, মীণা সরকার – বাঙ্গলা ২য় আশুতোষ, মঞ্জুশ্রী রায় – দর্শন ১ম লেডী ব্রেবর্ণ, বি-এস-সি পরীক্ষাতে গৌরী দাস – অঙ্ক ৫ম স্থানীয়, অনীতা আঢ্য—১১শ আশুতোষ।

আই-এ, পরীক্ষা :—

৬ষ্ঠ স্থান – শুক্লা মজুমদার লেডী ব্রেবর্ণ, ৭ম শান্তি বাগচী (বেথুন), ৮ম রাজু গুহ (ডায়োসিসান), ১০ম লীনা ভট্টাচার্য্য (হুগলী) অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আই-এস-সি পরীক্ষায়

স্বপ্না রায় চৌধুরী ডায়োসিসান হইতে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

সংযুক্ত বিশ্ব গ্রামিণ মহিলা সঙ্ঘ

(Associated country women of the world)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ১৯০০ সালে ডিনেমার আন্তর্জাতিক মহিলা পরিষদ স্থাপিত হয়। ১৯০১ সালে ১৭টি দেশের একদল মহিলা সুইডেন এবং ইংলণ্ডে মিলিত হন। তাঁহারা ৩০টি পল্লী অঞ্চলের মহিলা সঙ্ঘের প্রতিনিধি। প্রত্যেকটি মহিলা সঙ্ঘের সহিত যোগাযোগ স্থাপনার্থে লণ্ডনে একটি কার্য্যালয় স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত তাঁহারা গ্রহণ করেন। এই আন্তর্জাতিক মহিলা সঙ্ঘকে Associated country women of the world নামে অভিহিত করা হয়। এই সঙ্ঘ বর্ত্তমানে ১০১টি দেশের মহিলা সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বিশ্বের ৪৪ লক্ষ মহিলার প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। বিশ্বের মহিলাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা, বন্ধুত্ব স্থাপন এবং জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি বিধান করা এই বিশ্ব গ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুঃসময়ে দুঃস্থ ও আর্ত্তদের সাহায্য করাও এই বিশ্ব মহিলা সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধ লোকদের জন্য কলোনী স্থাপন, মেডিক্যাল শিক্ষা, মাতৃ ও শিশুসদন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি কার্য্যও এই বিশ্ব মহিলা সঙ্ঘ করিয়া আসিতেছে।

ভারতের তিনটি মহিলা প্রতিষ্ঠান এই আন্তর্জাতিক মহিলা সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে –

১। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি।

২। ভারতীয় গ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘ।

৩। আসাম মহিলা সমিতি।

১৯৫৭ সালে কলম্বোতে বিশ্ব মহিলা সঙ্ঘের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত হইতে ৪জন প্রতিনিধি ঐ কলম্বো সম্মেলনে যোগদান করেন—ডাঃ কৃষ্ণাবাই নিম্বকার, ২। শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথন, ৩। পাণ্ডিত্যালার [illegible]

মহারাণী এবং ৪। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রতিনিধি শ্রীমতী আরতি দত্ত।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া মহিলা সম্মেলন

১৯৫৭ সালে কলম্বো সম্মেলনে ১৯৫৮ সালে ভারতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রতিনিধি শ্রীমতী আরতি দত্ত কলিকাতায় উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে উক্ত সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়া স্থিরীকৃত হয়।

প্রস্তাবিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া মহিলা সম্মেলন সাফল্য-মণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

বিশ্ব গ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে উক্তরূপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতে এই প্রথম।

পাকিস্থান, ফিলিপাইন, সিলোন, বার্মা, ব্রহ্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২০ জন এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে ৬২ জন মহিলা প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ভারতের বাহির হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মিসেস এ, এম্, বেরী (প্রেসিডেন্ট সংযুক্ত বিশ্ব গ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘ) এবং মিসেস ডি, বেল (এশিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট) উল্লেখযোগ্য।

১৬ই জুলাই বুধবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সম্মেলনের উদ্বোধন এবং ডাঃ শ্রীমতী সুশীলা নায়ার সভানেত্রীত্ব করেন।

গ্রামীণ অলঙ্করণ রীতিতে চিত্রিত ডালা, কুলা, আল্পনা ইত্যাদি দিয়া সম্মেলন কক্ষ সুসজ্জিত এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানান। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রত্যেক দেশই গ্রাম-কল্যাণ, বিশেষ গ্রামীণ মহিলার কল্যাণ সাধনকেই অগ্রাধিকার দিয়াছে। ভারতবর্ষেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ভারতবর্ষ গ্রামকেন্দ্রিক, অধিকাংশ লোকের বাস গ্রামে, তাই গ্রামের উন্নতি ব্যতীত দেশের সমৃদ্ধি অসম্ভব।

উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু ভারতের নারী-জাগরণের ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশের গৌরবময় ভূমিকা ও পরলোকগতা সরোজনলিনী দত্তের অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বাঙ্গলা দেশে এইরূপ সম্মেলন আহ্বান করা উপযুক্তই হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বিশ্বের মহিলাদের সমস্যা প্রায় এক। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশসমূহের নানাক্ষেত্রে সাদৃশ্য হেতু ঐ সকল দেশের সমস্যা আরও নিকটতর। এই সম্মেলনের মাধ্যমে সমাজ সেবিকারা উপকৃত হইতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

সভানেত্রীর ভাষণে ডাঃ শ্রীমতী সুশীলা নায়ার বলেন, সমাজ বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও শিশুদের উপর নারীর প্রভাব অপরিসীম। সকল পুরুষকেই কোন না কোন নারীর প্রভাব বা কর্তৃত্বাধীনে আসিতে হয়। মাতা, কন্যা, ভগিনী বা স্ত্রীরূপে নারী জাতিকেই সমাজের সেবা করিতে হয়। গান্ধীজি তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। তিনি আরও বলেন যে, তবে পৃথকভাবে নারী জাতির কল্যাণের কথা চিন্তা না করিয়া সমগ্র সমাজে কল্যাণের দৃষ্টি দিলে নারী সমাজ আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।

নারীজাতি বিশেষতঃ গ্রামের নারীজাতির মধ্যে নিজ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে চেতনা সঞ্চারিত করার প্রয়োজনীয়তা বিবৃতি করিয়া শ্রীমতী নায়ার বলেন যে, গ্রামাঞ্চলের পরিবারে ক্ষুদ্র সঞ্চয় আন্দোলন, অধিক শস্য ফলাও আন্দোলন, সুলভ খাদ্য গ্রহণের চেতনা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধকল্পে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গ্রামের মহিলাদেরই অগ্রণী হইতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রভৃতির শুভেচ্ছাবাণী সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্যতমা সম্পাদিকা শ্রীমতী আরতি দত্ত পাঠ করেন।

বিশ্ব গ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী এ, এম্, বেরী গ্রামীণ মহিলা সমাজের উন্নতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ডাঃ শ্রীমতী হুলরেণু স্বয়ং সমাগত প্রতিনিধি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাত্রি আট ঘটিকায় লেক ক্লাবে প্রতিনিধিদের রিসেপশন কমিটি কর্তৃক নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল ৯-৩০ মিঃ হইতে ১১টা পর্য্যন্ত পূর্ব অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব দেশের নারী সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ দেন এবং অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন দলগত ভাবে মিলিত হইয়া প্রতিনিধিগণ ভাব বিনিময় করেন।

অপরাহ্ণ ৪। ঘটিকায় সকল প্রতিনিধি ও ডেলিগেটদের রাজভবনে রাজ্যপাল অভ্যর্থনা জানান ও জলযোগে আপ্যায়িত করেন। সন্ধ্যা ৬। ঘটিকায় রাজভবনস্থ মার্বেল হলে "পথের পাঁচালী" ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা উপস্থিত সকলকে আনন্দ দান করা হয়।

১৮ই জুলাই ৯।টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন দলে মিলিত হইয়া পারস্পরিক আলোচনা করেন এবং ১। হইতে ৪টা পর্য্যন্ত তাঁহারা বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানান এবং জলযোগে আপ্যায়িত করেন। অপরাহ্ণ ৫। ঘটিকায় সমিতি ভবনে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন নারী সমাজের সমস্যাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

শিল্প প্রদর্শনী

দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া মহিলা সম্মেলন উপলক্ষে সরোজ নলিনী সমিতি ভবনে গ্রাম্য হস্তশিল্প দ্রব্যের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন প্রকারের শিল্প দ্রব্য পাঠান।

১। সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয় ২। উদয়তিলা, কানারহাটি, ৩। গভর্ণমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট, ৪। নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতি, ৫। আনন্দ আশ্রম, ৬। লাইট হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড, ৭। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, ৮। নারী সেবা সঙ্ঘ, ৯। মুর্শিদাবাদ সিল্ক ইন্‌ষ্টিটিউট, ১০। শান্তি নিকেতন মহিলা সমিতি, ১১। বাড়গ্রাম মহিলা সমিতি, ১২। নারী শিক্ষা সমিতি, ১৩। কংগ্রেস মহিলা সমিতি, ১৪। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত কাঁচড়াপাড়া, সেনহিয়া, গান্ধী কলোনী, আজাদগড়, ও লালা বাগান সমিতি।

মণীপুর ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণও শিল্প দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে পাঠান।

লেডী প্রতিমা মিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

১৯শে জুলাই ৯।০ হইতে ১২টা পর্য্যন্ত প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দলে আলোচনা করেন। ইণ্টারন্যাশানাল লেডিজ ক্লাবে অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় শ্রীঅনাদি প্রসাদ সিংহের পরিচালনায় হিন্দি হাই স্কুলে "লোক নৃত্য" প্রতিনিধিদের প্রদর্শন করা হয়।

২০শে জুলাই সকাল ১০ ঘটিকায় প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বসে। অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে ডাঃ কুরুবাই দেশমুখের সভানেত্রীত্বে সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব প্রাধীন মহিলা সঙ্ঘের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী ডিমেল প্রমুখ ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কে গ্রামের মহিলাদের উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই শিশু মৃত্যুর হার অত্যধিক। গ্রামের মেয়েরা এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারের সহযোগিতায় অনেক কাজ করিতে পারেন।

বিশ্ব প্রাধীন মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী এ, এম্ বেরী বিশ্ব মানবতার অগ্রগতিতে মহিলাদের ভূমিকার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মহিলারা তাঁহাদের স্নেহের পরশ দ্বারা জগতের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। অবশ্য এ কাজ সময় সাপেক্ষ। তবে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তিনি বর্ত্তমান বিশ্বের দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে কোন দেশই একক থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক দেশই অপর দেশের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া আমরা পরস্পরের মতামত আদান প্রদানের মধ্য দিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। গ্রামীণ জীবনের সমস্যাও আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমস্যার সামান্য পার্থক্য থাকিলেও দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার সকল দেশের সমস্যাই প্রায় এক।

শ্রীমতী অম্বু স্বামীনাথন গ্রামের মহিলাদের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, গ্রামের মধ্যে নেতৃস্থানীয় মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই অপর মহিলাদের শিশু পালন ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান সহজ হইবে।

ডাঃ আতানাশিয়া মিসন (ফিলিপাইন), শ্রীমতী এস পারভেন (মালয়) লেডী ডি সরসা (সিংহল) এবং শ্রীমতী আসান। পাকিস্থান) সমাপ্তি দিনের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

পাঁচ দিন ব্যাপী সম্মেলনে প্রতিনিধিবৃন্দ দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় গ্রামাঞ্চলে পরিচালনার জন্য শিক্ষিত মহিলার অভাব পূরণের জন্য সরকার ও অপরাপর কল্যাণ মূলক সংস্থার সাহায্য গ্রহণে স্বীকৃত হয়। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য গ্রামের কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং নূতন নূতন পরিপূরক শিল্প প্রতিষ্ঠা করাও স্থির হয়।

আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য পরিবার পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলা হয় যে, বর্ত্তমানে পরিবার পরিকল্পনা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে গ্রামের মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য স্বেচ্ছামূলক সংস্থা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সেমিনার

সংযুক্ত বিশ্ব নারী সংস্থার উদ্যোগে ২১শে জুলাই হইতে ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতার ১০৪, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোডস্থ ওয়াই ডবলিউ সি এ হলে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার পল্লী জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা বিষয়ে সেমিনার হয়। শ্রীমতী আচমা জোন খাবাই সভানেত্রীত্ব এবং শ্রীমতী রেণুকা রায়, এম, পি, সেমিনারের উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী নীতা নীলাম প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে সেমিনারে যোগদান করেন।

সেমিনারের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

গৃহ ও পল্লী উন্নয়ন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নারীদের মধ্যে সমবায় আন্দোলন।

গ্রামীন পরিবারে অর্থনৈতিক উন্নতির উপায়।

গ্রামীন মহিলাদের পুষ্টিকর খাদ্য বিষয়ক শিক্ষা।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া মহিলা সম্মেলন ও সেমিনার সাফল্য মন্ডিত করিবার জন্য নেতৃস্থানীয় মহিলারা যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান যাইতেছে।

চাঁদপুর মহিলা মঙ্গল সমিতি

চাঁদপুর মহিলা মঙ্গল সমিতি সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত এক গ্রামীন আদর্শ মহিলা সমিতি। অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে এই সমিতিতে গ্রামীন শিল্প দ্রব্য যথা বাঁশ বেতের কাজ, মাটীর তিনিষপত্র, খেলনা

তৈরী ইত্যাদি তৈরী করা শেখান হয়। ইহা ভিন্ন এই সমিতিতে একটি বয়স্কা শিক্ষা শ্রেণীও পরিচালিত হইয়া থাকে। বয়স্কা শিক্ষা বিভাগে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধাও শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ৯০ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্তা মান্যবালা দেবী কয়েক মাসের ভিতরেই অক্ষর পরিচয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন। তাঁহার উৎসাহ অন্যান্য সকলকে আকৃষ্ট করিতেছে।

গত ১৮ই জুলাই এই সমিতিতে একটি শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ঐদিন বেলা ৩টায় বিশ্ব প্রাচীন মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বেরী, পাকিস্থান, বালয়, সিংহল, প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেশের প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি সহ এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির শিল্প বিভাগীয় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা আরতি দত্ত ও মহিলা সমিতি বিভাগীয় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অমিতা চৌধুরী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে থাকিয়া সব বুঝাইয়া বলেন ও দেখান। ভারতীয় কিন্তু ডিভিসনের প্রতিনিধিও এই দলে ছিলেন।

সমাজ কল্যাণ শিক্ষাব্রতী ভারতীয় নারী

শিল্প আর বিশিষ্ট দেশসমূহে সমাজ কল্যাণ নীতি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত শ্রীযুক্তা আরতি দত্ত বিদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ৬ মাসের একটি ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য গ্লাসগোর ইন্‌ষ্টিটিউট অব সোসাল ষ্টাডিজ শ্রীযুক্তা দত্তকে একটি বিশেষ বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা আরতি দত্ত বিশিষ্ট দেশসেবিকা নেতা স্বর্গতঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের কন্যা এবং স্বনাম ধন্য স্বর্গতঃ ডাক্তার দত্ত, আই, সি, এস, এর পুত্রবধূ। শ্রীযুক্তা দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ। সমাজ সেবামূলক কার্য্যে শ্রীযুক্তা দত্ত ইতিমধ্যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির তিনি শিল্প বিভাগীয় সম্পাদিকা কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্যা।

শ্রীযুক্তা দত্তকে ইলাণ্ডস্থ প্রতিষ্ঠানটি সমাজ শিক্ষার বিশেষ বৃত্তি প্রদান করিয়া যোগ্যপাত্রেই নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

বঙ্গলক্ষ্মী

৪র্থ সংখ্যা] কার্ত্তিক—১৩৬৫ [৩৩শ বর্ষ

শক্তি উপাসনা

স্বামী সচ্চিদানন্দ

একটা অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর-জঙ্গম কীটপতঙ্গ সমস্ত জীবজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় লয় হইতেছে—এই মহান্ সত্য বর্ত্তমান যুগের অতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরাও মানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন—মানবের বিচার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির এমন একটা গণ্ডী আছে যাহা অতিক্রম করা তাহার অধিকারের বাহিরে। এই গণ্ডীটুকু পর্য্যন্তই তাহার পুরুষকারের এলাকার শেষ সীমা। এইখানে আসিয়াই তাহাকে চক্ষু মুদিয়া অচিন্ত্য শক্তির পদতলে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া প্রার্থনা করিতে হয়—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি, নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

এই শরণাগতির সোপানে আরোহণ করিলেই মানুষ বুঝিতে পারে—অনুভব করিতে পারে মহাশক্তির আনন্দময়ী রূপ এবং তখনই মানুষ তাঁহার সত্যিকারের ধ্যান করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইতে পারে।

মহাশক্তির এই আনন্দময়ী রূপকে দর্শন করিতে বা উপলব্ধি করিতে মানবের বহু যুগের সাধনা লাগিয়াছিল এবং ভারতের প্রাচীন ঋষিরাই এই পরমতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারিণী শক্তিকে দেবীমূর্ত্তিতে উপাসনা আধ্যাত্মিক রহস্য গবেষণাগারে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। দেবীমূর্ত্তিতে ঈশ্বরোপাসনার আবার তিনটী প্রকারভেদ আছে, যথা—কন্যা, কন্যা আর জননী।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা মহাশক্তির জগজ্জননী মূর্ত্তির উপাসনা। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে কন্যারূপেও পরিকল্পনা করিয়া পূজা করিয়াছে। তাহার প্রমাণ পাই আমরা আগমনী গানের মধ্যে। শ্রীশ্রীদুর্গা বাঙ্গালীর কন্যারূপে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন। বাংলার মাতৃজাতি মেনকারূপে কন্যা দুর্গাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠেন। বহুকাল অদর্শনের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মেনকা স্বামীর নিকট কত আবেদন—নিবেদন করেন কন্যা দুর্গাকে আনিবার জন্য। এই আবেদন—নিবেদনের আকুলি-বিকুলি বাংলার আকাশে-বাতাসে উথলিয়া দুর্গার মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। তিনিও অস্থির হইয়া ওঠেন বাপের বাড়ী যাইবার জন্য। স্বামী ভোলানাথ শিবের অনুমতি লইয়া দুর্গা কৈলাস হইতে চলিয়া আসেন বাংলার মাটীতে, বাপের বাড়ীতে। রাজরাজেশ্বরী দুর্গা যখন বাপের বাড়ী আসেন তখন সঙ্গে আনেন তাঁহার শত শত সাঙ্গোপাঙ্গকে। তাঁহারাও আসিয়া আনন্দ করেন। পিত্রালয়ে কন্যার আগমনে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। মা-বাবা স্নেহের পুতলীকে যত রকমে পারেন, বসনে-ভূষণে, আহারে-বিহারে সুখী করিতে চেষ্টা করেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারিণী শক্তির এইরূপ ঐশ্বর্য্যবিহীন মানবীরূপের

পরিকল্পনা করিয়া তাঁহাকে পরম আত্মীয়জ্ঞানে উপাসনা করা বা সেবা করা মহাশক্তির মাতৃত্ব উপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

মানবীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ মানব তাহাকে ভোগ্যা বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে বুঝিতে পারিল—তাহার ভোগের তৃপ্তি নাই, শেষ নাই। উহা যেন অনন্তকাল ধরিয়া তাহার সর্ব্বগ্রাসী মুখবিবর প্রসারিত করিয়াই রাখিয়াছে। কালক্রমে সে তাহার এই চিন্তাকে মোড় ঘুরাইয়া দিল। যাঁহাকে সে এতকাল ভোগ্যা বলিয়া মনে করিয়াছে তাঁহাকে সে পূজ্যা বা আরাধ্যা পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার পায়ে নিজের সমস্ত বাসনা বা ভোগেচ্ছাকে সঁপিয়া দিয়া দেখিল—তাহার মাথার বোঝা, হৃদয়ের জ্বালাকে যেন লাঘব করিয়া দিল। সে তখন দেখিল—মায়ের অংকে ছোট শিশুটীর মত সে নির্ব্বিবাদে, নির্ভয়ে শান্তিসুখে অবস্থান করিতেছে। মানব-মনের এই অনুভূতিই মহাশক্তির মাতৃ-উপাসনার আদি। সেই হইতে সে উদাত্তকণ্ঠে গাহিল—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

নারীর মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আর পালনীয়া শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাই আমরা। নারী একদিকে যেমন মূর্ত্তিমতী কামনা, আবার অন্যদিকে কামনাকে সংযত করিবার শক্তিস্বরূপিণী দেবী। মানব তাহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ভিতর দিয়া মানবীর মধ্যে তাহার দেবীত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

কী করিয়া?

তাহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিয়া। যে গৃহে পুরুষেরা নারীকে অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকে সেই গৃহেই নারীর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির কল্যাণীরূপ প্রকাশিতা হইয়া সংসারকে আনন্দময় করিয়া তোলে, শ্রীসম্পন্ন করিয়া তোলে।

প্রতিবছর বাংলার ঘরে ঘরে এবং প্রবাসী বাঙ্গালীরও ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা মহা সমারোহে হইয়া থাকে। এই পূজার সার্থকতা কতটুকু হয় তাহাই বিবেচনার বিষয়। শ্রীদুর্গা প্রতিমা গড়িয়া বিপুল অর্থব্যয় ও বহু জাকজমক করিয়া আনন্দ করা হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু ভাবিতে হইবে আমাদিগকে—আমরা যাবতীয় নারীমূর্ত্তিকে শুদ্ধপবিত্র দেবীমূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া কি মনে মনে তাঁহাদিগকে অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করি? তাঁহার কল্যাণীরূপ দর্শন করিবার জন্য কি ব্যাকুল হৃদয়ে অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করি?

মানুষ নারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভোগ করিবার জন্য পাগল। ইহাতে তাহার তৃপ্তি কখনই হয় না, হইতে পারে না।

যে দিন বাঙ্গালী সমস্ত নারীর ভিতর, পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা হইতে অশিতী বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা পর্য্যন্ত, সকল স্তরের সকল বয়সের নারীকে মহাশক্তির প্রতিনিধি ভাবিয়া তাহাদিগকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিবে সেই দিনই বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা সার্থক হইবে; শক্তি উপাসক বাঙ্গালীর শক্তিসাধনা সিদ্ধ হইবে আর নারীর অন্তরস্থ মহাশক্তির আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালীর বল, বীর্য্য, প্রতিভা ও উৎসাহ উদ্দীপনা প্রভৃতি সবই বৃদ্ধি পাইবে এবং এই জাগ্রত শক্তি ও উপাসনার ফলেই বাঙ্গালী আবার বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে।

শারদোৎসব

শ্রীমীরা দেবী

শারদোৎসব বলতে সাধারণতঃ দুর্গোৎসবই বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শারদোৎসব প্রাচীনতর। দুর্গা পূজার বহু পূর্ব্ব যুগেই এ উৎসব চলে আসছে। শারদোৎসব শরৎ ঋতুর আরম্ভ উৎসব। একদা ঋগ্বেদের ঋষিরা শরৎ ঋতু থেকে বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে শরৎ-প্রবেশ হয়। সেই দিন বিজয়োৎসব। সেই বিজয়োৎসবে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে নতুন বৎসরকে অভ্যর্থনা করার রীতি প্রচলিত ছিল। ঐ দিনটি ছিল

নতুন বৎসরের সর্বাঙ্গীণ বিজয় কামনার দিন। সেই জন্যই ঐ দিনটিকে বলা হয় বিজয়াদশমী। কালক্রমে লোকাচারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঋক্‌বেদের শারদোৎসব দুর্গাপূজায় রূপান্তরিত হয়। তত্ত্বালোচনায় অনেক ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। জাতীয় চেতনার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদুর্গাকে স্বদেশজননীর প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ যথাক্রমে ঋদ্ধি, বুদ্ধি, শক্তি ও সিদ্ধির রূপকল্প। বেদপুরাণতন্ত্রাদিতে দুর্গাপূজার উৎপত্তি ও বিবর্তনের যে চিত্রই থাকুক বাংলার দুর্গোৎসব অথবা শারদোৎসব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির একটি বিশেষ প্রমাণ। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলার সংস্কৃতি বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রাণের সন্ধান, ভক্তির রূপ আর আন্তরিকতার যে ছবি বাংলার ঘরে ঘরে আজও ফুটে ওঠে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলার বৈশিষ্ট্য আজও এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করে বজায় রয়েছে। আজও ৺বিজয়াদশমীতে সমস্ত বাঙালীর প্রাণে যে মন্ত্র রণিত হয়ে ওঠে তা হচ্ছে—

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবী বিশ্বার্তিহারিণী
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব।"

বসবন্নের ধর্ম ও নারীকবিগণ

অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বঙ্গলক্ষ্মীর বিজয় বৈজয়ন্তীর পৃষ্ঠদেশে যে মূলমন্ত্রটি মুদ্রিত হয়ে আছে, সেটী হচ্ছে নারীপ্রগতি; নারীর শিক্ষাদীক্ষার প্রসার এবং সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্র—সর্বত্র নারীদের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুন্নতি। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে যখনি যখনি দেশে নবভাবধারার বিপ্লাবন আসে, দেশ এগিয়ে চলে—তখনই নারীদের অভ্যুন্নতি ঘটে। কালক্রমে নারীরা আবার নানা অধিকারে বঞ্চিতা হন। ভারতেও এই সত্যের ব্যত্যয় হয় নি।

উপনিষদের পরম প্রগতির দিনে জনকরাজের সভায় গার্গী বাচক্নবী তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্কযুদ্ধে ব্যাপৃতা হয়েছেন। সূত্রের যুগেও বড়বা প্রাতিথেয়ী, সুলভা, মৈত্রেয়ী, গালবকাপাপত্নী, বহু গন্ধর্ব-দুহিতাদের সন্ধান পাই। আবার কালিদাসের যুগে এমন নারীকবির সন্ধান পাই, যিনি ব্যাস বাল্মীকি ও ব্রহ্মা ছাড়া আর কাকেও কবি বলেই স্বীকার করেন না; এঁরা ছাড়া আর কেও যদি গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা তাঁর মনোরঞ্জন করতে পারেন, তা হ'লে কর্ণাটরাজদুহিতা তিনি তাঁদের যশ পা' তাঁর মস্তকে তুলে নেবেন—অন্যদিকে, অর্থ হয় তাঁর কবির, —যদি তাঁরা পরাজিত হন, তিনি পরাজিত কবিদের মস্তকে স্বীয় যশ পদ তুলে দেবেন—

"অর্থক যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্বতে
তেষাং মূর্ধি দধামি বামচরণদ্বন্দ্বং কর্ণাটরাজসুতা"

এই কর্ণাট দেশের মাহিষ্মতী নগরে উভয় ভারতী বা সরস্বতী একদিন স্বীয় স্বামী মণ্ডন মিশ্র এবং শঙ্করাচার্যের বাগ্‌যুদ্ধে মধ্যস্থতা করেছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামীর বিরুদ্ধেই রায় দিয়ে নিরপেক্ষ বিচারের মর্যাদা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করেছিলেন। এই কর্ণাটেই আবার তিনশত বছর পরে হরসালরাজ বিষ্ণুবর্ধনের সভায় ছিলেন জৈন নারী কবি কান্তি—তিনি নাগরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ছিলেন।

এই কর্ণাটেই কিছুকাল পরে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, শঙ্করাচার্যের প্রায় একই সময়ে বীর শৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বসবন্ন স্বদেশ ত্যাগ করে কল্যাণের বিজ্জলের আশ্রয়ে আসেন এবং রাজার সাহায্যে স্বধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তিনি বর্ণপ্রথা প্রভৃতির বিরোধী এবং প্রগতি-বাদী ছিলেন বলে বিজ্জলের প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন রাজার বিরুদ্ধে; কারণ, রাজা বসবন্নের সহায়তা করছিলেন। এই বিদ্রোহের সময় রাজা নিহত হন। এর পরে বসবন্নেরও আর বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না।

এই বীর শৈবধর্মের প্রচারকদের মধ্যে অক্কতমা হচ্ছেন মহাদেবী অক্কা বা তপস্বিনী মহাদেবী। তিনি ধর্ম প্রচার

করতেন সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়ে; প্রবাদ আছে যে তিনি স্বর্গের নিমিত্ত রাণী মহেশও রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে আসেন। দাক্ষিণাত্যের বাহন সাহিত্যে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তিনি তাঁর "মেরেই মেলমু মনেরা মতি, মুগংগলিগে অভিমতে এত্তিয়া" -প্রকৃতি সঙ্গীতে বলছেন—পাহাড়ের উপর যে ঘর বাঁধে, তার আর পশুকে ভয় করলে চলবে কেন? সমুদ্রের পাড়ের উপর যে বাড়ী তৈরী করে, তার সমুদ্রের ঢেউকে ভয় করলে চলবে কেন? বাজারের ভিতরে যে বসতি করে, তার কোলাহলকে ভয় করে কি লাভ? তাঁর ইষ্টদেব শিব—তেই মল্লিকার্জ্জুনকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন—

"তের মল্লিকার্জ্জুনদেব কেলইয়া
লোকলোলগে পুট্টিদবলিকা স্তুতিনিন্দেগলু
বন্দেডে মনবলি
কোলব তালদে সমাধানিয়া সিরবেল্ল"—

অর্থাৎ হে সুন্দর মল্লিকার্জ্জুনদেব—তুমি শোন,—এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে স্তুতি ও নিন্দাকে ভয় করলে চলবে কেন? বরং ক্রোধ ত্যাগ পূর্বক প্রশান্ত জীবন যাপন কর।

এই মহাদেবী অবশ্য সমসাময়িক অনেক নারী কবি ছিলেন—কর্ণাটকেই। স্বল্পাবসরে এখানে তাঁদের নামমাত্র উল্লেখ করছি:—(১) সোমব্বে; (২) বসবের পত্নী গঙ্গাম্বিকা; (৩) মুক্তা অক্কা; (৪) রেমবেব; (৫) রেচবেব; (৬) নাগাম্বি অক্কা; (৭) রেকম্মা; (৮) সোগসব্বে; (৯) অত্তবে; (১০) সত্যক্কা প্রভৃতি আরো অনেকে।

দাক্ষিণাত্যের, ভাষা-সাহিত্যসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায় মুসলমানগণের ভারতে আগমনের বহু পূর্ববর্তী সময় থেকে এমন কি—ব্রিটিশ আগমনের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময় পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে বহু নারী কবি প্রাদুর্ভূতা হয়েছিলেন। কিন্তু বীর শৈব ধর্মের প্রচারঝঞ্ঝে যত নারী কবি ও দার্শনিক আত্মসমর্পণ করেছেন, অন্য কোনও ধর্মে তেমন দেখা যায় না। এঁদের রচনার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবপ্রকর্ষ সহজেই জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছিল।

আজ স্বাধীন ভারতে এই সব মহীয়সী ভাষাকবিদের বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বাঙলার মূলধন

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

বাঙলার মূলধন এক, দুই, তিন, চার
ক্ষেতে ভরা ধান গৃহে সুখী পরিবার।
উজ্জ্বল ভাষা মুখে লক্ষ্মন সাথে বাস,
বিগত শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস।
কী বিরাট প্রতিভার বাঙলায় জন্ম,
ঐক্যের সাধনা যার মূল মর্ম।
মানব ঐক্যের রূপ উঠিয়াছে ভাসি,
ভবসার পারে আনে আলোকের বাঁশী।
সে আলোকে শত শত মনীষার উদ্ভব,
জানে তাঁরা মহীয়ান বাঙলার গৌরব।
সে আলোকে বাঙলায় হোল নব সুপ্রভাত,
মানুষ স্বাধীন হবে হোল তার সূত্রপাত।
কভু যদি ঘটে কারো চিত্তের বিভ্রম
হারাইয়া ফেলে পথ জাতীয়ত সম্ভ্রম।
উনবিংশ শতকের পাতা খুলি ধরো;
সত্যের ধ্রুব জ্যোতি নিরীক্ষণ করো।
একজাতী, একধর্ম এক ভগবান,
সারা বিশ্বে এক ঐক্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
বাঙলার সন্তান যে আছ যেথায়,
রক্ষা কর মূলধন যোগ্য নাহি যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতা

শ্রীনমিতা রায় চৌধুরী, এম্ এ, বি-টি.

"বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া।"

বাঙ্গালী জাতির এক শুভক্ষণে বাংলা দেশে আবির্ভূত হয়ে পরম প্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালীর হৃদয়কে প্রেম-ভক্তির মাধুর্য্যরসে অভিষিক্ত করলেন। প্রেমে, ভক্তিতে, বিশ্বাসে, হৃদয়াবেগের অজস্র প্রাচুর্য্যে শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালীর অন্তর একেবারে জয় করে নিয়েছিলেন। বাঙ্গালী জাতি তাঁকে প্রেমময় ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ বলেই মেনেছিল।

শ্রীচৈতন্যের জীবনীকারগণও শ্রীচৈতন্য জীবনকে সাক্ষাৎ ভগবৎ জীবন বলেই গ্রহণ করে এই সব চরিত সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব মানব রূপেই জন্মেছিলেন। এই মর্ত্তভূমিতে আবির্ভূত হয়ে মানবীয় লীলাই প্রকটিত করে গেছেন।

এতকাল আমাদের সাহিত্যে দেবতারই ছিল একচ্ছত্র প্রাধান্য। কিন্তু যেদিন বিরাট মনুষ্যত্ব নিয়ে বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হলেন, সেদিন সমস্ত ধারণা বদলে গেল। চৈতন্য আবির্ভাবেই, তার ব্যক্তিত্ববোধের প্রাবল্যেই মানব মহিমা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। তাই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত' এই দুই গ্রন্থে তাদের ভক্তি প্রণত মনের প্রকাশে শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবৎ রূপটি প্রকাশিত হলেও স্থানে স্থানেই মানুষ শ্রীচৈতন্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীচৈতন্যের বাল্যকৈশোরের যে রূপটি ফুটেছে—তা এক দুরন্ত দুর্দ্দান্তরূপ। তার দৌরাত্ম্যে সমস্ত নবদ্বীপবাসী যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল—জগন্নাথ মিশ্রের কাছে নালিশ জানায়, ছোট ছোট মেয়েরা ও তাঁর দৌরাত্ম্যের হাত থেকে উদ্ধার পেত না—

কেহ বোলে "মোর মুখে দিলেক কুয়োল।
শুকড়ার ঘর দেহ কেশের ভিতরে।"
কেহ বোলে "মোরে চাহে বিভা করিবারে।"

আবার পড়ুয়াদের বিব্রত করতেও ছাড়ে না।

যে কোন ব্যাকরণ সম্বন্ধে বা অন্য বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাদের হারিয়ে দেয়! বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণে ভীত হয়ে যখন পিতা তাঁরও পড়া বন্ধ করে দিলেন তাতে তাঁর দৌরাত্ম্য যেন আরও বেড়ে গেল।

"কিবা নিজ গৃহে প্রভু, কিবা পর ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে॥"

বালক শ্রীচৈতন্যের দৌরাত্ম্যে সকলে অস্থির। একদিন তো ভাতের হাঁড়ির উপরই গিয়ে বসে রইলেন। মাতার তর্জ্জনার উত্তরে বললেন—

"তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
তত্ত্বাতত্ত্ব মূর্খামূর্খ জানিব কেমতে।"

অর্থাৎ কোন রকম দুষ্টামীই তাঁর অজানা নয়।

এর পর ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্যদেব বড় হয়ে উঠতে লাগিলেন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিকট পাঠ গ্রহণ করে সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু হলে কি হবে—নিমাই এখনও সেই পাগল ছেলে। মুরারীকে তর্কে হারিয়ে বলছেন—

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি কেন ইহা পড়।
লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥"

এখানে তাঁর রহস্যপ্রিয় রূপটিই প্রস্ফুটিত হয়েছে।

এরপর তাঁর মনের সূক্ষ্ম সুকুমার দিকও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একদিন গঙ্গাতীরে লক্ষ্মীকে দেখলেন—দু'জনেরই মনে যেন পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হল।

"দুহাঁ দেখি দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস
দেব পূজাছলে কৈল দুঁহে পরকাশ।"

নিজের বিবাহ সম্বন্ধে নিজেই উদ্যোগী হলেন।

নিমাই ছাত্রদের প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে মানুষ হিসাবেই ভালবাসত। তখন তিনি প্রেমাবতাররূপে পূজিত হননি। তিনিও বিদ্যার্থীগণকে পরম স্নেহ করতেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হবার পর যখন

তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, সেদিনের বিদায় দৃশ্যটি যেমন করুণ তেমনই মানবীয়তাবে পূর্ণ।

তারপর তাঁর সন্ন্যাসোত্তর জীবনে কৃষ্ণপ্রেম পাগল রূপটিই ফুটে উঠেছে। এই সময় তিনি "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্"—এইরূপেই পূজিত হয়েছেন।

কিন্তু তবু তাঁর চরিত্রে ভগবত্তা আরোপ না করেও মহামানব রূপেই ব্যাখ্যা করা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সময়ে বাংলাদেশে সমাজ বন্ধন খুব দৃঢ় ছিল। তিনি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বাণী সমাজকে শোনালেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ দিয়ে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও সাম্যনীতির প্রচার করলেন। তিনি শোনালেন—"চতুর্বর্ণের বা চারি আশ্রমের আমি কেহ নই—আমি সেই অখিল রসামৃত সিন্ধু—গোপীভর্তার দাসানুদাস।"

কাউকে তিনি ঘৃণা করেন নি। কাউকে হিংসা করা তো দূরের কথা, প্রাণি মাত্রেরও উদ্বেগের কারণ হতেন না। "তরুরিব সহিষ্ণুতা" শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রেত ছিল। এই উদারতা, সার্ব্বজনীনতা—মহামানবের লক্ষণ।

সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও স্নেহ প্রেম প্রীতি ভালবাসা শ্রদ্ধা তাঁর অন্তর থেকে মুছে যায় নি। শচীমাতার সঙ্গে তাঁর কথায় মানবসুলভ মনোভাবই সুস্পষ্ট।

সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য সম্মতি প্রার্থনা করে বলছেন—

"কান্দিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই।
তোমার শরীর বই মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ অন্ন তোমা হতে
কোটি অন্ন তোমার ঋণ না পারি শোধিতে"।

পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার ও সম্মতি প্রার্থনার এবং বিদায় দৃশ্যের আকুলতায়—মানুষের অন্তর বেদনাই ফুটে উঠেছে।

আবার নীলাচলে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় মাতা ও পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। স্বরূপ দামোদরকে নবদ্বীপ পাঠিয়ে বললেন—

"যাহাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে
মোর সুখ কথা কহি দুখ দিহ তারে।"

শ্রীচৈতন্যের চরিত্র একদিকে দৃঢ় এবং অন্যদিকে কোমল।—

"মহাপুরুষের চিত্তের স্বভাব এই হয়
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়।"

মানবিকত্বের নিদর্শনই তো তাই।

ভক্তগণের প্রতি অপূর্ব্ব প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার তাদের ভক্ত সত্যকার ব্যথা অনুভব করেন। শ্রীবাসের কি ভাবে সংসার চলে তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ভক্তদের প্রতি তাঁর ছিল সত্যিকার অন্তরের টান। প্রতি বৎসর প্রভুকে দর্শনের আশায় গৌড়দেশ হতে ভক্তগণ বহু দুঃখ স্বীকার করে নীলাচলে আসেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাতে ব্যথিত হয়ে বললেন—

"প্রতি বর্ষ আইস সবে আমাকে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে।"

সকলের দিকেই সচেতন দৃষ্টি।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন ভাবাবিষ্ট থাকতেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করতেন—কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তাঁকে কেউ ঈশ্বর সম্বোধন করলে তিনি বিরক্ত হতেন।

'চৈতন্যভাগবত' আছে,—সার্ব্বভৌমকে তিনি বলেছেন—

"সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।
সন্ন্যাসী করিয়া জান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি।"

এভাবে দেখা যায় শ্রীচৈতন্যের বালকসুলভ চপলতা, যৌবনসুলভতরঙ্গপ্রিয়তা, উদ্ধতভাব, চরিত্রের দৃঢ়তা, এবং অন্তরের প্রেম ভালবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানবীয় রূপটি ফুটে উঠেছে। শ্রীচৈতন্যের মধ্যেই ঘটেছিল মানুষী শক্তির চরম চরিতার্থতা। তাঁর উদারতা সর্ব্বযুগে দুর্লভ। শ্রীচৈতন্য দেব তাই মহামানব।

———

চিকিৎসকে বিপত্তি

শ্রীপুষ্প দেবী

সেই যে কথায় বলে না ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়। তাই হয়েছে। এই ত সেদিন সকালে উঠেই দেখি, ড্রইংরুমে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, আমি ঘরে ঢুকতেই বললেন - রায় বাহাদুর আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন— পুলিস থেকে আসছি আমি, শুনলুম আপনারা দুজনেই অসুস্থ—

কথাটা সত্যি—ওঁর এ্যালবুমেন আর ডায়বেটিস। আর আমার সন্ড ব্রোন আর স্প্যাসটিক আলসার। এই বিপরীত ধর্মী দুটি অসুখ নিয়ে দুজনে আজন্ম ভুগছি। বিয়ের সময় আমাদের কুষ্ঠীর নাকি রাজযোটক মিল হয়েছিল। তার লক্ষণ শুধু এইটিতেই পাওয়া যায়। অসুখ যাঁদের সদ্য হয়, তাঁরা অনেক সময়েই অসুখের কথা আলোচনা কর্তে ভালোবাসেন। কিন্তু পুরনো রুগী মাত্রেই বিরক্ত হয়ে উঠেন সেই বিরক্তিকর ও কষ্টকর অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে। যাক্—মনের রাগ মনেই চেপে মুখে ভদ্রতা বজায় রেখে বললুম। দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত কেতা দুরস্ত—একটু পরেই কথা প্রসঙ্গে বললেন, দেখুন আমাদের বার আনা অসুখই মনগড়া, সর্বদা মনে করতে হবে আমাদের কিছু অসুখ নেই। বলি পেটের দুরন্ত যন্ত্রণা কিছুতেই যে তা মনে থাকতে দেয় না। বললেম ও কিছু নয় জোয়ানে-নুনে ব্যথা সেরে যাবে।

পরদিন বাবা এলেন। দু-একটা কথা বলার পর বলি—কাল অমলবাবু বলে এক ডাক্তার এসেছিলেন। বাবা বলেন, এসেছিল নাকি? সর্বনাশ করেছে, বেজায় বাজে বকে ভদ্রলোক—তোদের পাগল করে ছাড়বে—মাথার গোলমালের জন্য ওর চাকরী গেছে। সরকারী ডাক্তার ছিল পুলিসার। মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠি।

এর পর থেকে প্রতিদিনই ঠিক দুপুর দুটোর সময় অত্যন্ত বিদিশুরে গলার আওয়াজ পাই—মিষ্টার মুখার্জী আছেন নাকি? ভালো এক আলা হয়েছে বোঝাই বলি না উনি বাড়ী নেই ৪টার ফেরেন অফিস থেকে; তবুও রোজই সেই এক ভুলের পুনরাবৃত্তি। আমার স্বামী অবিশ্যি বলেন - বাঁচা গেছে দুঃখীসটা তোমার ওপর দিয়েই যায় সারাদিন খাটুনীর পর কাঁহাতক আর পাগলের সঙ্গে বকা যায়।

প্রথমতঃ অমলবাবু আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারে তৎপর হলেন যখন দেখলেন দুধ আর ডোয়ানের কোন ফল আমি স্বীকার কচ্ছিনা, তখন বল্লেন, দেখুন মিসেস মুখার্জী এ বিষয়ে মেমসাহেবরা অদ্ভুত বুদ্ধিমতী, আমি দেখেছি ১০৩ জ্বর এক মেম সাহেবের; সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে, তার স্বামী তখন অফিসে। আমার কাছে তার রোগের ধাতমার কথা সব বল্লে, কিন্তু যেই স্বামীর পায়ের শব্দ পেলে র‍্যাকেট হাতে করে টেনিশ খেলতে আরম্ভ কর্লে, কে বলবে অসুখ করেছে। আর আপনি যদি প্রত্যহ এই হটওয়াটার ব্যাগ নিয়ে পড়ে থাকেন মিঃ মুখার্জীর মনের অবস্থা কি হয় বলুন দেখি। মা দেখা মেমটিকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। ১০৩ জ্বরে ছুটোছুটি করে টেনিশ খেলা সহজ নয়—কিন্তু আমি যে এ রকম যন্ত্রণাচেপে ওঁর আপার সময় উন্নসিত হয়ে অভ্যর্থনা কর্তে পার্ব তাতো হতে পারে না।

এরপর থেকে নানা ভাবে আমায় তিনি আনন্দিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কারণগুলি সব সময় আমার পক্ষে আনন্দকর হয়ে উঠে না। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার কর্লেন আমি ফুল ভীষণ ভালোবাসি। সেই দিন থেকে প্রায় প্রতিদিন, কখনো গন্ধরাজ, কখনো একটা বাদবীলতার ফুলের গুচ্ছ বা যা হোক দুটি ফুল তিনি প্রায়ই নিয়ে আসতেন। একদিন ছাদে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি আমার দেওর আর তার এক বন্ধু গেট দিয়ে ঢুকল, গেটার বন্ধের ওপর একটা ফুলশুদ্ধ এ্যাস্টিলোনাসের লতা দেখে দুজনে কি কথা বল জানি না, তারপর সেটা হাতে নিয়ে বেড়িয়ে গেল। তখন সেটা মনে বিশেষ কোন রেখাপাত

করেনি কিন্তু বুঝলুম তার পরদিন। অমল বাবু এসেই বল্লেন, কাল কত কষ্ট করে যে আপনার জন্য ঐ ফুলটুকু সংগ্রহ করেছিলুম তা আপনি ধারণাই কর্ত্তে পারবেন না মিসেস মুখার্জী—কই সেই ফুল দেখছি না তো আপনার ঘরে? তখন বুঝলুম সেই ফুলই সদ্গতি লাভ করেছে বন্ধু যুগলের হাতে। হেঁসে বলি, সত্যি ভারি চমৎকার ফুল। আমার এক বন্ধু এসেছিল সে নিয়ে গেল। ভ্রূ কুঁচকে ম্লান হেসে অমলবাবু বলেন- এ কিন্তু ভারি অন্যায়! আমি মনে মনে বল্লুম, কিন্তু সেটার রঙের ওপর ফুল রেখে যাওয়ার কীই বা দরকার ছিল? যাক্—ভাগ্যে দেখেছিলুম নইলে আজ মহা মুস্কিলে পড়তে হত।

এর পরদিন এসে আমার ছোট্ট মেয়ে তপুকে বলেন আজ একটা ম্যাজিক দেখাবো তোমায়। একমাত্র ভরসা ছোট্ট চাকর রাম সকাল থেকে কাজ ছেড়ে চলে গেছে, অথচ সত্যি ছেলেটা ভারি ভালো ছিল। কেন যে অমন হঠাৎ দুর্মতি হল তা বুঝতে পারি না। আর ঠিক চোখে না দেখে মানুষকে চোর বলতেও ইচ্ছে করে না। তাই সদ্য হারানো পার্কারটা একটু খুঁজে দেখতে বলতেই তার কেমন ধারণা হল আমি তাকে সন্দেহ করছি। আমারও অত দামের দামী কলমটা হারিয়ে মেজাজ ভালো ছিল না। কাজেই দামের কথার পর যেই বলেছি কলমটার কী ভানা গজাবে যে ঘর থেকে উড়ে গেল? ব্যাস আর যায় কোথা—সঙ্গে সঙ্গে রামহীন পোটলাপুটলী বেঁধে বললো "হামারো তলব দে দিজিয়ে হাম মুহুক মে যায়গা।" তারপর অনেক বোঝানর পরও সে রইল না—কাজেই সংসারের কাজ তো অনেকেই ছিল, তার ওপর কলম খোঁজার ধরুন সোফা-সেটির কভার খোলা—বিছানা তোষক সহ উল্টে-পাল্টে দেখা ইত্যাদি হাঙ্গামায় কাজ আরো যথেষ্ট বেড়েই ছিল। কাজেই সময়ও ছিল না অমল বাবুর কাছে বলার। ভাগ্যে তপুটা ছিল তাকে বসিয়ে আমি কাজ সারতে লেগুম। বিছানা ঠিক করছি এমন সময় তপু ছুটতে ছুটতে হাজির—তার হাতে আমার সদ্য হারানিধি পার্কার কিন্তু ওয়ান।

তপু বল্লে মজা দেখার জন্যে অমল বাবু কাল নিয়ে গেছলেন। আমায় চোখ বুজতে বলে আমার মাথার চিবুকে কলমটা ঠুকে বলছেন মাথায় তোমার ওটা কি ধরণের ক্লীপ? ওমা হাত দিয়ে দেখি তোমার কলম। দেখাদেখি শুধু শুধু রামহীনটা চলে গেল, ও কিন্তু আমাদের খুব ভালো বলতো মা—মনে আছে সেবার তোমার যন্ত্রণার সময় সারারাত ঘুমোয় নি। আর সেই ব্লাক আউটের রাতে বাপীর জন্যে ডাক্তার বাবুর বাড়ী গেছলো, অন্য কেউ হলে পারতো না।

তার বাক্য স্রোতে বাধা দিয়ে বলি, শুধু কি তাই? অমন লোক আর পাব না। অথচ বিনা অপরাধে ছেলেটা চুরীর অপবাদ মাথায় নিয়ে গেল। যত ভাবি ততই অমলবাবুর ওপর রাগটা প্রবল হয়ে ওঠে অথচ ভদ্রলোক অত্যন্ত আশা করে ছইংরুমে বসে আছেন, আমায় খুসী করছেন মজা দেখিয়ে মনে করে।

এরও চেয়ে বিরক্তিকর ঘটনা ঘটলো এর পর। দীর্ঘদিন কার্ডিয়াক এ্যাজমায় উনি কষ্ট পাচ্ছিলেন, বিধান বাবু এসে বলেন, হিমোপ্রোটিন ইনজেকশান দিতে হবে। তখন যুদ্ধের সময়—হিমোপ্রোটিন পাওয়া সহজ নয়। অনেক কষ্টে জোগাড় করা হল। এমন সময় অমল বাবুর আবির্ভাব। টেবিলের ওপর ওষুধের শিশিটি দেখেই হঠাৎ যেন বড়বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেন। খুব চড়া গলায় ডাকেন—মিসেস মুখার্জী—আমি অবাক হয়ে তাকাই, দেখি ভদ্রলোকের চোখ লাল, মাথার শিরাগুলি ফুটে উঠেছে। সেন্টার টেবিলের কাঁচের ওপর এক প্রবল ঘুষি মেরে তিনি বলেন এই আমি বলে যাচ্ছি, এ ইনজেকশান মিঃ মুখার্জীকে দিলে তারপর আধ ঘন্টার বেশী তিনি বাঁচবেন না। বাঁচতে পারেন না। এখনও বলছি সাবধান! এমন করে নিজের সর্বনাশ টেনে আনবেন না। অত্যন্ত বিব্রত হয়ে আমি বলি, এ ইনজেকশন তো তপুকেও একবার দেওয়া হয়েছিল। বাধা দিয়ে অমলবাবু বলে ওঠেন, তপুর ডায়বেটিস ছিল? তপুর হার্ট ডামেজ ছিল? ছিল কিডনির রোগ? থাক আমার যা বলার আমি বল্লুম, এবার আপনার কর্ত্তব্য আপনার কাছে। তিনি সবেগে প্রস্থান করেন—বুঝি সবই পাগলের কাণ্ড, তবু মন সায় দেয় না। কেউ মঙ্গল হবে বললে যদি বা সে কাজ না করি - অমঙ্গল হবে বললে করতে সাহস হয় না। বিকেলে বাড়ীর ডাক্তার ভৌমিক

এসে বলি—আজ্ঞা ও ইনজেকশানটা এখন থাক তাহলেই তো আছেন। ভৌমিক সব শুনে হেঁসে ওঠে বলে, তবে বিধান বাবুকে আনার কি দরকার ছিল? আচ্ছা কাণ্ড পাগলের!

এরপর হঠাৎ একদিন ১০৪ জ্বর নিয়ে উনি ফিরলেন কলেজ থেকে। সর্দ্দি নেই কাশি নেই হঠাৎ অতটা টেম্পারেচার দেখে ডাক্তার ম্যালেরিয়া সন্দেহ করে রক্ত নিয়ে গেলেন কিন্তু অমল ডাক্তার এসে হৈ-চৈ বাধালো—তিনি জোর গলায় প্রমাণ করলেন অসুখটা প্লেন নিমোনিয়া রিসিপ্রাল। এমন কি টি, বি, ও হলে হতে পারে তবু ম্যালেরিয়া কক্ষনো নয়। সেদিন ওঁর জ্বর খুব বেশী রোগের যাতনার চেয়ে এই পাগলের প্রলাপ কম অসহ্য নয়—অথচ 'ডাক্তার' এই দাবী নিয়ে তিনি রোগীর মাথার কাছে গ্যাট হয়ে বসে আছেন। তার আইন অনুযায়ী সব করতে হবে অন্য ডাক্তারদের নির্দ্দেশ মানার উপায় নেই।

ওঁর খুব ঘাম হতে লাগলো বোধ হয় জ্বরটা ছাড়বে। তখন বড় মেয়েকে বল্লুম—মন্তি তোর বাবার গা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে জামাটা বদলে দাও। সে বেচারা যেতেই অমলবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, মিসেস মুখার্জ্জী আপনি করুন বিশ মুখার্জ্জীর একাজ নয়। শুধু মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেই যথেষ্ট হয় না। প্রাকটিকাল হন একটু। আমি তখন ওঁরই জন্য বেদানা ছাড়াচ্ছিলুম—একজন ভদ্রলোক শোবার ঘরে বসে—সে সময় মেয়ের সেবাটাই শোভন হবে মনে করে কুণ্ঠায় নিজে না গিয়ে মন্তিকে পাঠিয়ে ছিলুম—মন্তি বেচারা খত-মত খেয়ে ফিরে আসে। আমিই জামা বদলে দিই।

দীর্ঘ সাত দিন বাদে প্রচুর কুইনাইন ইনজেকশানের পর সেদিন অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীরে উনি অফিস গেছেন।

একেই শরীর ভালো নয়। আর লো ব্লাড প্রেসার এর জন্যে মাথা ঘোরায় প্রায়ই কষ্ট পান। কাজেই মনটা আমার বেশ চিন্তাগ্রস্থ। তিনটে বাজলো বারে বারে ছাদে গিয়ে দাঁড়াই ওঁর ফেরার আশায়। এমন সময় সিঁড়িতে জুতো পড়া পায়ের আওয়াজ, যদিও ওঁর পায়ের পরিচিত শব্দ নয় তবুও আশায় এগিয়ে যাই, দেখি অমল ডাক্তার আসছেন। আমায় দেখেই হেঁসে বলেন, বসুন ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? আমি সবিস্ময়ে বলি, কই ডাকিনি তো। বলেন, তাতে লজ্জার কি আছে। এ ডাকার অধিকার তো আপনার প্রচুরই আছে—ছাদে দেখলুম দাঁড়িয়েও আছেন আমার প্রতিক্ষায়, তবে অস্বীকার করে লাভ কি? বলেই টেবিলে রাখা ওঁর জন্যে কমলা লেবুর রসটা এক চুমুকে শেষ করে বলেন, আচ্ছা কি করে জানলেন যে আমি লেবুর রস ভালোবাসি?

এবার আর নিজেকে দমন করে ভদ্রতা বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। দুপুরে বাড়ীতে চাকর বাকর কেউ নেই আর কমলালেবুও ঘরে নেই যে ওঁর জন্যে রস করে রাখবো। হয়তো রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠে থাকবে। পকেট থেকে একটা ব্লাক প্রিন্সের কুঁড়ি বের করে অমলবাবু বলেন—দেখুন কি সুন্দর, কি সুন্দর ফুল, রং কালো হলে কী হবে, সুগন্ধে নিজের অন্তরের পরিচয় লুকানো নেই। তাই ফুলটিই সব চেয়ে বেশী ভালোবাসি!

ব্লাক প্রিন্সের সঙ্গে ওঁর বা আমার কার রং এর তিনি উপমা দিতে চান না বুঝলেও আমি রেগে উঠি—বলি, দেখুন ঠিক মাথায় ফুল গুঁজে দুইরূপে বসে আপনার সঙ্গে ফুল করার মত মনের অবস্থা আমার নয় এবং বিশ্বাস করুন আপনাকে ডেকেও আমি কোন দিন পাঠাইনি। আমার স্বামী অসুস্থ। বাধা দিয়ে অমলবাবু বলেন,"ও কিছু নয়, মিঃ মুখার্জ্জী বড্ড বাড়াবাড়ি করেন অসুখ নিয়ে, সহ্য শক্তি ওঁর মোটেই নেই। এবার আমারই সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। আমি হাত জোড় করে বলি—থামবেন আপনি? নেহাৎ আমার বাড়ী নইলে আপনাকে বেড়িয়ে যেতে বলতে পারলে আমি সুখী হতুম। যথেষ্ট হয়েছে অন্ততঃ আমার স্বামীকে চেনাবার জন্য আপনার প্রয়োজন হবে না আমার।

এবার আমায় আরো অবাক করে অমলবাবু বলেন—কেন সে কী আপনিও জানেন না? নইলে বিধানবাবু বলার পরও আমার কথা শুনে আপনি কি হিষ্টোপ্রোটীন বন্ধ করেন নি? আমি আসলে কত খুসী হয়ে ওঠেন আপনি? আমি কি আজো বুঝি না কী ছাড়ল বিশ্বাস, নির্ভর আপনার আমার ওপর। দেখুতো পিসীমা বলতে অজ্ঞান—অতটা স্নেহ পরের ছেলেকে দেয়া কি সহজ?

আমি অবাক হয়ে যাই মিসেস মুখার্জ্জী আপনার মত একজন অদ্ভুত বুদ্ধিমতী ধৈর্য্যশালিনী মহিলার জীবন এভাবে

এবার আমার চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে আমি বলি—চুপ করুন এ সব মানুষ আজো লোকের বাড়ীতে আসে কি করে? রাঁচি যান আপনি—সত্যিই মাথা আপনার একেবারে খারাপ। কটমট করে আমার দিকে চেয়ে অমলবাবু বলেন, আমারো চের কাজ আছে। এ ভাবে বাড়ীতে ডাকিয়ে আমার অপমান করার কি দরকার ছিল আপনার? এমন সময় উনি এসে পৌঁছান—আমি হাত জোড় করে বলি, আপনি আজ বাড়ী যান বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আর কখনো এ বাড়ী না এলে আমি অত্যন্ত বাধিত হব।

ওঁর হাত থেকে পোর্ট ফোলিও নিয়ে আমি টেবিলে রেখে ফিরে এসে দেখি, অমল বাবু দিব্যি শান্ত জাঁকিয়ে বসে ওকে বলছেন, অদ্ভুত, অসম্ভব সহ্য আপনার মিঃ মুখার্জ্জী এই দীর্ঘকাল আমি রুগী নিয়ে কাটিয়ে এলুম, আপনার মত ধৈর্য্য ও সহ্য কোন রুগীর আমি দেখিনি।

মিসেস মুখার্জ্জী মিঃ মুখার্জ্জীকে কিছু স্নিগ্ধ পানীয় এ সময় দিলে ভালো হয়।

যে ক্ষত দেখা যায় না

শ্রীআশা গংগোপাধ্যায়

কোনও দিনও এত শীঘ্র রোগী দেখার কাজ শেষ হয়েছে বলে মনে পড়ে না ডাক্তার ইন্দ্রনীল চৌধুরীর।

সকাল থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাওয়া যায় না অন্যদিন। ইন্দ্রনীল নিজে ত গলদঘর্ম হনই—সংগে সংগে ওঁর সহকারী শান্তিনাথও হিমসিম খেয়ে যায়।

রোগীপ্রতি ষোলটাকা ত আছেই—তাছাড়া অধ্যাপনা, অস্ত্রোপচার, কন্‌সালটেশান প্রভৃতিতেও বেশ মোটা রকমই আয় হয়।

অবশ্য সকাল সাতটা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত শুধুই রোগের ইতিহাস শোনা এবং রোগীকে পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ কোরে রোগ নির্ণয় করা ও ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করা।

বাকী কাজগুলির জন্য সময় নির্দিষ্ট করেন যে দিন যেমন কার্যসূচী থাকে।

সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকে ইন্দ্রনীল হাত দেন না আর কোনও কাজে। যদি কোনও গুরুতর কেস্ আসেই—একমাত্র তখনই তিনি পুনর্বার তাঁর চামড়ার ব্যাগটি হাতে তুলে রোগীর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

আজ সবে বেজেছে আটটা-চল্লিশ—এরই মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে। যে ক'টি স্লিপ্ জমেছিল সব একে একে এসে দেখিয়ে চলে গেছে। ডাক্তার উৎফুল্ল মনে গুণ গুণ কোরে তাঁজতে লাগলেন গানের কলি।

টেবিলের কাগজপত্র গোছগাছ কোরে অন্দর মহলে যাবার উদ্যোগ করছেন সবে—এমন সময় একেবারে সরাসরি টেবিলের প্রান্ত ঘেঁষে এসে দাঁড়ান একটি লোক। পিছনে শান্তিনাথ - বিপন্ন অবস্থায়।

অপেক্ষাগৃহে থাকতে চাননি ভদ্রলোক—একেবারে খাসকামরায় অনধিকার প্রবেশ। বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ বয়স—সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা—বড় বড় কালো চুলের গোছা এলোমেলো অবিন্যস্ত—চোখ দুটি নিবিড় কিন্তু রক্তবর্ণ। ওষ্ঠাধর সুদৃঢ় কিন্তু যাতনায় পাণ্ডুর।

দৃষ্টিমাত্রেই বোঝা যায় যুবকটি অতিশয় যন্ত্রণাক্লিষ্ট, অসহ্য কাতর অবস্থায় ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে।

"ডাক্তার চৌধুরী—বাঁচান, বাঁচান আমায়।"—

বলতে বলতে একেবারে ইন্দ্রনীলের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। সংগে সংগেই অবশ্য সহকারী ও ডাক্তার দুজনেই ধরে ফেললেন ওকে।

কি হয়েছে? বলুন, বলুন। কেন অত কাতর

যন্ত্রণা ? আমি ডাক্তার—আপনার অসুখ এক্ষুনি সারিয়ে দোব।

উঃ, ডাক্তারবাবু, আজ কতদিন হয়ে গেল কেউ পারল না পারাতে। এই যে এই দেখুন, এইখানটায়।

বাঁ হাত দিয়ে ডানহাতের মূলে শার্টের কাপড় সরিয়ে একটি স্থান নির্দেশ করল—

এইখানে অসহ্য যন্ত্রণা—সারিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। যা চান স-ব দোব, সর্বস্ব দোব আমি।

দেখি—

ডাক্তার ভাল কোরে নিরীক্ষণ করলেন।

কাঁধের নীচে দক্ষিণ বাহুমূলে ছোট্ট একটু স্থান—কোন ক্ষীতি, ক্ষত বা বিকার, কিছুই খুঁজে পেলেন না।

বললেন—কই, কিছু না ত।

ওই—ওই জন্যই ত মুস্কিল, ডাক্তারবাবু :—কেউই বিশ্বাস করে না—সবাই পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আপনাকে আমি উড়িয়ে দিতে দোব না। আপনি চিরুন, কেড়ে কেলুন, পুড়িয়ে দিন। যা-খুশী করুন। আমাকে—আমাকে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিন ডাক্তারবাবু। আর আমি পাচ্ছি না। অসহ্য—অসহ্য হয়েছে আমার।

আকুল মিনতিতে ভেঙে পড়ল লোকটি।

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল—ইন্দ্রনীল ভাবলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর বললেন,—দেখুন, এক্ষুনি ত কিছু করা উচিত হবে না। রোগ যদি ধরতে না পারা যায় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে লাভ নেই। আপনাকে দিনকতক সবুর করতে হবে। তার আগে রক্ত পরীক্ষা, রক্তের চাপ পরীক্ষা, ইত্যাদি বহু ব্যাপার আছে—সেগুলির জন্য আপনাকে দিনকতক ত কষ্ট সহ্য করতেই হবে।

উঃ, ডাক্তারবাবু—সেরে ফেলুন, শেষ কোরে দিন আমাকে—

কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল রোগী—

নিন, যত টাকা লাগে নিন আপনি। এখুনি এইখানটা চিরে যত পারেন দূষিত রক্ত বার কোরে দিন। বেশ গভীর ভাবে কাটতে হবে ডাক্তারবাবু—

বলেই পকেটে হাত চালিয়ে একরাশ করকরে নতুন নোট টেবিলের উপর রাখল।

কি ফ্যাসাদ! এমন অদ্ভুত রোগী ডাক্তারবাবু জীবনে দেখেন নি!

কি করবেন ভেবে পেলেন না হতবুদ্ধির মত স্থির হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

হঠাৎ লোকটি পকেট থেকে একটি তীক্ষ্ণ ছুরি বার কোরে আঙুল বসিয়ে দিল তার সেই অদৃশ্য ক্ষতচিহ্নের উপর—কিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। রোগী অবিকৃত মুখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল—ডাক্তারবাবু আমিই কাটছি—আপনি শুধু আমার এইটুকু উপকার করবেন—দেখবেন ক্ষতটা যেন বিষিয়ে না ওঠে—কাটাকুটি যা করবার আমিই করছি।

এত দ্রুত চক্ষের নিমেষে সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল যে ডাক্তার একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন প্রথমটা—পরে রোগীর রক্তাক্ত ছুরিকা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন,—

আচ্ছা আসুন, দেখা যাক্—আমি কি করতে পারি কতদূর।

যথারীতি অস্ত্রোপচার হল—বেশ কিছু পরিমাণ তাজা রক্ত ক্ষরিত হল ক্ষতস্থান থেকে। রোগীর চেহারা অবিচলিত-অপরিবর্তিত।

সে যেন পরম তৃপ্ত।

আনন্দে, খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে।

আঃ,—

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললে,

ডাক্তারবাবু—আপনি ভগবান, আমার আর একটুও ব্যথা নেই। একেবারে সেরে গেছে। ঐ দূষিত রক্তটুকুই আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল—আর কিছু নয়।

ডাক্তারকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সে চলে গেল প্রীত মনে।

ডাক্তার ইন্দ্রনীল চৌধুরী তার কর্মজীবনে এই প্রথম রোগ এবং রোগী উভয়ের দ্বারাই প্রতারিত হলেন মনে হল তাঁর।

আজ তাঁর মনে হল, তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষা একে-

ব্যর্থই ব্যর্থ হয়েছে—তিনি এখনও গভীর অন্ধকারের মধ্যেই রয়েছেন নিহিত।

প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে—ডাক্তার ইন্দ্রনীল কিন্তু সেই অদ্ভুত রোগীকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। যখনই অবসর হয় তাঁর মনে হয় সেই আশ্চর্য্য ব্যক্তির কথা, এবং সেই পীড়িত ব্যক্তিটির নিরাময় হওয়ার অত্যোধিক আশ্চর্যকর, অভূতপূর্ব পদ্ধতি।

এইভাবে একদিন তিনি তাঁর চিকিৎসাকক্ষে বসে চিন্তায় রয়েছেন নিমগ্ন—অকস্মাৎ আবির্ভূত হল সেই অনন্যপূর্ব ব্যক্তি—সেই অপূর্ব পীড়াদায়ক দক্ষিণ হাতটিকে ব্যাণ্ডেজে ঢেকে নিয়ে

ডাক্তারবাবু—

ব্যাকুল স্বরে আর্তনাদ করল রোগী—

এবার গভীর—আরও অনেক গভীর কোরে ছুরি চালিয়ে দিন—

বাঁচান আমাকে—অসহ্য, অসহ্য আমার যন্ত্রণা।

বিস্মিত ডাক্তার নানাপ্রকার প্রশ্ন কোরে জানলেন কিছুদিন বেশ আরামে কেটে যাবার পর বাহুমূলে দেখা দেয় যাতনা—ক্ষতহীন নির্মম বেদনা—যা নাকি রোগীর জীবনী-শক্তির মূলকে কুরে কুরে নিঃশেষ কোরে দিচ্ছে দিনের পর দিন।

ডাক্তার করলেন পরীক্ষা—পূর্বের মত কোথাও কোনও দাগ নেই—শিরা-উপশিরার ক্ষতি নেই,—শুধু রয়েছে সদ্য অস্ত্রোপচারজনিত ছুরিকার দাগটুকু।

ডাক্তারের মাথার মধ্যে কিস্ কিস্ করতে লাগল।

উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ এ ব্যক্তি!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার এই মানসিক বিকারগ্রস্ত পীড়িত অসুস্থ মূর্তিটির দিকে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারই হলেন পরাজিত তর্কে - করলেন ছুরিকাবিদ্ধ—

এবার বেশ গভীর ভাবেই কাটলেন মাংসপেশী—প্রচুর রক্তক্ষরণ হল।

কিন্তু যথাপূর্ব রোগী রইল অবিচল, স্থির—মুখে সেই মুক্তির স্মিত হাসি—আরামের আনন্দ।

ছুটি বলিষ্ঠ হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে সে বিদায় নিল ডাক্তারকে অন্ধকারের অতলান্ত গহ্বরে নিমজ্জিত কোরে।

বছরখানেক গত হয়েছে। একদিন এল একখানি পত্র—রোগী নয়—এবার রোগের ইতিহাস বা ব্যথির প্রকৃত কারণ সমেত রোগীর অকপট স্বীকারোক্তি।

'ডাক্তারবাবু',

যখন পত্র পাবেন তখন আমি নিজের হাতে নিজের প্রাণ নিয়েছি জানবেন।

এ আমার আত্মহত্যা নয়—আমার প্রায়শ্চিত্ত, আত্ম-শুদ্ধির উপায়। কৃতকর্মের অনিবার্য্য ফলভোগ আমার অসহনীয় হয়ে উঠেছিল—তাই শেষ পর্যন্ত এই পথই আমাকে বেছে নিতে হল। রোগের কারণ আমি নিজেই খুঁজে পেয়েছি—তাই চিকিৎসার ভারটুকুও নিজের হাতেই তুলে নিলাম।

আজ আপনাকে আমি শোনাতে চাই একটি প্রেমের কাহিনী—জীবনে অন্ততঃ একজনও জানবে আমি অদ্ভুত —ব্যথিত।

আমার সুন্দরী স্ত্রী লীনার সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয় সে একটি ধনী বিধবা মহিলার শিশু-সন্তানের তত্ত্বাব-ধানের কাজ করত। মহিলাটি একদিকে ওর সখীও ছিল বলতে পারা যায়।

আমাদের প্রেম যথারীতি পরিণয়ে পরিণতি পেলো—কিন্তু লীনা তার কর্মত্যাগ করল না। সমস্ত দিনটাই সে ওই মহিলার গৃহে অতিবাহিত কোরে সন্ধ্যায় গৃহে ফিরত। তার পর আমরা দুজনে খুবই আনন্দে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিতাম।

বেশ কয়েক মাস কেটে যাবার পর আমি লক্ষ্য করলাম ড্রেসিং টেবিলের একটি টানাতে সে সর্বদাই চাবি বন্ধ কোরে রাখে। একটি মুহূর্তের জন্যও সে ঐ বিশেষ টানার চাবিটি হস্তান্তরিত করে না। আরও একটি সুদৃশ্য ক্ষুদ্র চাবি ঝোলানো থাকে তার গলার সোনার চেনের সঙ্গে। ওটি লুকেটের মত দেখতে হলেও চাবির আকার। ওটির সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরে অনেক সময় আমি পরিষ্কার উত্তর

পাইনি লীনার কাছ হতে। টানার ভিতরের বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরেও আমি হতাশ হয়েছি – কারণ লীনা সতর্কভাবে সে প্রশ্নও এড়িয়ে গেছে।

তাতে আমার সন্দেহ বেড়ে যায়।

লীনা, আমার আদরের প্রণয়িনী, পত্নী লীনা – মাত্র এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে—এরই মধ্যে সে আমাকে গোপন কোরতে পারে এমন কি জিনিষ তার কাছে থাকতে পারে? তার নিজস্ব—এক প্রেমপত্র ব্যতীত সব কিছুই ত আমাকে সে নিবেদন করতে পারে? এইরূপ চিন্তা করতে করতে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি।

সে কি ব্যভিচারিণী—অন্যাসক্তা?

দিনে দিনে আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই ওই টানার রহস্যভেদ করবার জন্য।

একদিন সে সুযোগ এসে যায়।

টানবা মাত্রই টানাটি খুলে আসে—লীনা চাবি দিতে বিস্মৃত হয়েছে। ভিতরে একটি সুদৃশ্য রৌপ্য নির্মিত ক্ষুদ্র পেটিকা – সম্ভবতঃ এরই ক্ষুদ্র চাবিটি থাকে লীনার কণ্ঠহারে ঝোলানো।

কি?—কি আছে এর ভিতরে?

এই বিশেষ ধরণের বাক্স এবং এর জন্য বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বিত হতে দেখে আমি বাক্সটি খুলতে বদ্ধপরিকর হই।

সেদিন বিধাতা আমার স্বপক্ষে কি বিপক্ষে ছিলেন জানিনা—অসতর্কভাবে স্নান ঘরে লীনা তার কটি খুলে রেখে কাজে চলে যায়। পরবার খেয়াল করেনি। ওর নিয়তি ছিল ওর নিতান্তই প্রতিপক্ষ।

আমি সেই সুবর্ণসুযোগ মোটেই নষ্ট হতে দিই না। টানাটি সেই মুহূর্তেই খুলে ফেলি। যা ভেবেছিলাম তাই! গোছা গোছা প্রেমপত্র।

আমার অজ্ঞাতে লীনা তার প্রণয়ীর সঙ্গে চালিয়েছে প্রেমের লীলা।

আমার সম্বন্ধে ওর প্রণয়ী বিশেষরূপে সাবধান হতে উপদেশ দিয়েছে। আমি যেন সন্দিহান না হই।

ডাক্তার, সেই সময় থেকে আমার অবস্থা কাউকে বোঝানো অসম্ভব। প্রগাঢ় ভালবাসার এই প্রতিদান—বিশেষ কোরে মাত্র মাসের নবপরিণীতা পত্নীর নিকট হতে—একথা কল্পনা করতেই আমার সারা দেহে মনে খুন জেগে উঠল।

সমস্ত রক্তকণিকাগুলি উত্তপ্ত হয়ে টগ্‌বগ্ কোরে ফুটতে লাগল যেন। আমি তখনি আমার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললাম—মনকে তৈরী করলাম। সিদ্ধান্ত কোরে ফেলে তবে এই প্রবঞ্চনাকারিণীর হাত হতে পার নিস্তার—তার পূর্বে নয়।

যথারীতি সন্ধ্যায় লীনা গৃহে ফিরল। আমাকে আলিঙ্গন করল—করল চুম্বন—এটা তার প্রাত্যহিক কর্মসূচীর একটি।

আমি স্থির নির্বিকার চিত্তে সমস্ত প্রবঞ্চনাই সহ্য করলাম—মুখে মিথ্যা হাসি এনে গ্রহণ করলাম সন্ধ্যার আহার।

তারপর!

তারপর এল সেই অন্তরঙ্গক্ষণটি! সেই কাল মুহূর্ত!

স্ত্রীর কোমল সুন্দর মুখপানে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজেকেই কি রকম উন্মাদ মনে হতে লাগল।

কিন্তু বেশীক্ষণ সময় বৃথা যেতে দেওয়া হবে না—তাহলে আমার নিজের উপর নিজেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলব।

মন—হৃদয় সমস্ত ক্রমে ক্রমে কোমল হয়ে পড়বে। লীনার প্রেমপত্রের স্তূপও ক্রমশঃ বেড়েই চলবে—আর আমার দাতের ঘরে দেখা যাবে এক ঘরাশূন্য!

নিদ্রিত লীনার শঙ্খধবল মসৃণ গ্রীবাটি দুই হাতে আঁকড়ে ধরে দিলাম প্রচণ্ড দানবীয় শক্তিতে চাপ—একটু ছট্‌কট্ কোরে আমার বুকেই লুটিয়ে পড়ল লীনার লতার মত তন্বী দেহ।

আমি তাকালাম না তার চোখের দিকে—তাকাতে পারলাম না।

বিম্বাধরের ফাঁক বেয়ে গড়িয়ে পড়ল এক ঝলক রক্ত—তাজা টক্‌টকে গোলাপের ছিন্ন দলের মত লাল রক্ত—তারই ক্ষুদ্র একটি বিন্দু এসে লাগল আমার এই অদৃশ্য ক্ষতস্থানটিতে।

আমি সমস্ত শোণিতচিহ্ন নিশ্চিহ্ন কোরে প্রস্তুত হলাম শেষকৃত্যের জন্য।

সহরের প্রধান ডাক্তার আমার বিশেষ পরিচিত—সুতরাং কোনও সন্দেহই কারো হলনা। শবদেহ সুষ্ঠুভাবেই করা হল দাহ।

সব শেষ হয়ে গেলে আমি আর সীমার বিধবা কন্যা একই গাড়ীতে যখন গৃহাভিমুখে ফিরছি—মহিলাটি বিশেষ বিচলিত হয়ে আমার দুটি হাত স্পর্শ কোরে অতি মৃদুস্বরে বললেন,—অনিমেষ বাবু, একটা কথা বলব; যদিও এখন আপনাকে এইসব কথা জানিয়ে বিব্রত করবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিলনা—তবু আমাকে বলতে হবে।

তাঁর কুণ্ঠিত বিব্রত ভাব দেখে আমি তাড়াতাড়ি বললাম—

নানা, সেকি, বলুন না কি বলতে চান আপনি?

তিনি একটু ইতস্ততঃ কোরে বললেন,—

মীমার কাছে আমার কতগুলি দরকারী কাগজপত্র ছিল, সেটা কি আমি আজকেই ফেরত পেতে পারি?

আমার সমস্ত শিরাগুলি উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। ব্যগ্র হয়ে বললাম—কোথায়—কোথায় ছিল বলুন ত?

তিনি আমার প্রশ্নের ভঙ্গী দেখে বিস্মিত হয়ে ধীরে ধীরে বললেন,—ওর ড্রেসিং টেবিলের সব চেয়ে নীচের টানাটির ভিতর একটি ছোট রূপার বাক্সের মধ্যে।

আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটি বরফের স্রোত বয়ে গেল।

মহিলাটির নাম মনোলীনা রায়!

আমি অসাড়—স্তব্ধ হয়ে গেলাম!

কিছুদিন পর থেকে সুরু হল এই মরণাধিক যন্ত্রণা। স্নেহময়ী পত্নীর প্রেমে লক্ষিত হয়ে যে পাপ আমি কোরেছি—তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে এই কয়েক মাস প্রতি মুহূর্ত্ত দিয়েই করতে হয়েছে।

আমার স্ত্রী অমলীনা—কিন্তু তার মৃত্যুকালীন নিষ্পাপ শোণিত বিন্দুটুকু আমাকে ধীরে ধীরে শারীরিক ও মানসিক শান্তি দিয়ে দিনে দিনে উন্মাদ কোরে তুলছে।

আপনি জানেন এর চিকিৎসা বিধাতার অসাধ্য!

অতএব ইহলোক ছেড়ে আমি পরলোকে সীমার কাছে চলেছি আজ—তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করব আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য।

ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আপনাকে অনুরোধ করছি—আপনি পারিষ্টের জন্য ভগবানের চরণে একটুখানি প্রার্থনা জানাবেন—দুরাত্মার শান্তি কামনা কোরে।

(বিদেশী গল্পের অনুসরণে)

———

বন্ধনহীন গ্রন্থী

শ্রীমীরা দেবী

সীমা আর অসীমা।

অসীমা যেখানে সেখানেই সীমা। অবশ্য সীমা যেখানে অসীমাও যে সেখানে সব সময় তা হয় না। অসীমার জীবনে ভাটা, সীমার জীবনে জোয়ার। সীমার সুরু অসীমার সারা। সীমা প্রাণচঞ্চল অসীমা প্রাণবন্ত। সীমা শুক্লচন্দ্রের দ্বিতীয়া কলা অসীমা কৃষ্ণচন্দ্রের একাদশী। পার্থক্য প্রচুর। তবু কোথায় যেন মিল। উৎসব মন্ত এক সন্ধ্যায় আবিষ্কার করল, দুজনে দুজনকে, অনেক কাছে। অসীমার সব যেন গেছে। সীমার আছে অনেক বলার তাই সীমা বক্তা, অসীমা শ্রোতা; মনের কবাট খুলে দেয় সীমা, অসীমা সেখানে বিচরণ করে স্বচ্ছন্দে। সীমা যদি বেহিসেবী হয়ে পড়ে অসীমা তার হিসেব করে দেয়। সীমার গতিপথ চিনিয়ে দেয় অসীমা। এমনি ভাবে কেটে গেল অনেক দিন। অসীমার একঘেয়ে দিনগুলো বিচিত্র হয়ে ওঠে সীমার স্পর্শে। থেমে যাওয়া সুর আবার গান ফিরে পায়। এবারে এল বৈচিত্র্য নূতনতম হয়ে।

সীমার কিছু অজানা নেই অসীমার কাছে। কিন্তু একটা মস্ত ফাঁক থেকে গেছে। সীমার সবচেয়ে প্রিয় এবং গোপন কথাটি আজও বলা হয়নি অসীমাকে। শুধু বলে তো সব কথা সম্পূর্ণ করা যায় না তাই একদিন সীমা তার একান্ত প্রিয়জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তার একান্ত প্রিয় বন্ধুর। মাত্র একদিনের দেখাশোনা। তারপর সুরু হল চিঠির পালা। সীমারই মারফৎ। সীমা, অসীমার মাকে এল তৃতীয় জন —'অরুণ'। হাসে লাস্যে বেশ কটা দিন কেটে গেল। কাব্যের ভাণ্ডার উজাড় করে অরুণ লেখে অসীমাকে অসীমা তার উত্তর দেয়—সে উত্তর বয়োত্তীর্ণ। দুজনের সেই লেখার নেশায় সীমা যেন আরও কাছে এল দুজনের। সীমাকে অসীমা আরো বেশী করে কাছে পেল। অরুণ পেল সীমাকে আরো নিবীড় করে। এ এক ব্যতিক্রম। চিরাচরিত নিয়মকানুন ভেঙে এ তিনের স্রোত বয়ে চললো উদ্দাম গতিতে। কিন্তু মোড় ঘুরলো একদিন। কখন কোন ফাঁকে যে অরুণ আর অসীমা ঘাবিয়ে বসে আছে নিজেদের এক নতুন আবর্তে তা তারা নিজেরাই জানতে পারেনি। হঠাৎই একদিন অসীমার কাছে অরুণের সেই স্বীকৃতি। আশ্চর্য্য অসীমার জীবনে গোধূলীর আলো এরই নাকে হল প্রেমের আবির্ভাব রাত্রির সমাপ্তি, প্রভাতের সূচনা আরম্ভ গোধূলীর সেই ম্লান-রক্তিম ক্ষণে জন্মেছিল অসীমা। সেদিনটা ছিল কৃষ্ণা নবমী। সেই নবমীর চাঁদের ১ম সুষমার প্রতিফলন কি সে দেখতে পেলো অরুণের মাকে?

অসীমা প্রায়ই বলতো ভিখারীর ঝুলি পূর্ণ করতে চাই না। রাজার মত যে আমায় জয় করবে তার কাছেই বিকিয়ে দেব নিজেকে। এতটুকু ফাঁকি রাখব না সেদিন। প্রেমের ক্ষেত্রে তাই তার রুচি ভিন্ন। ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী সে, দূরত্বের ব্যবধান রেখেই অগ্রসর হয়েছে সে এতদিন কিংশুকের বর্ণ-সম্ভার। পাখীর কাকলী, শ্যামলের শ্যামলীমা, নীলের সমারোহ তাকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু মোহগ্রস্ত করেনি। সৌন্দর্য্যের পিয়াসী সে—সীমাহারা অভিসার তার সেই সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্যে। তার উদ্দাম রথ পথের ধূলোয় চিহ্ন রেখে গেছে। কিন্তু সে চলে গেছে রাজ ধূলো উড়িয়ে দিয়ে।

যাই হোক সেদিনও ছিল গোধূলী। দিনের শেষ ও সন্ধ্যার রক্তিমাভা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। অসংযত, অসংযত, অপর্য্যাপ্ত।

অরুণ বলে চলেছে—

"আমায় তুমি ভুল বুঝো না। তোমার জন্ত কোন কৌতূহল আমার ছিল না। পরিচয় করেছি শুধু সীমারই অনুরোধে কিন্তু আজ বুঝতে পারছি তোমাকে এড়িয়ে যাবার উপায় আমার নেই। তোমার মাকে খুঁজে পেয়েছি আমার আত্মাকে! যেটা সীমার মাকে পাই না তারই সন্ধান তোমার মনের অলিকোঠায় লুকিয়ে আছে আমি তা জেনেছি। এ কথা তোমায় না জানিয়ে পারলাম না। যদি ঘৃণা কর উপায় নেই যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবুও এ সত্য আমার স্বীকার করতেই হবে। এর পরে তুমি জান আমি আর কিছু জানি না।"

অভিভূত হয়ে পড়ে অসীমার মন। উদ্দাম রথের গতি থেমে যায় এ কি কথা শোনাল আজ অরুণ। অকম্পিত, অবিচলিত এ কি সত্য স্বীকৃতি। নিরস্ত্র ঘোষণা, যা শুধু রাজার ভেরীতেই বেজে ওঠে। "ওগো মহাকাল। একি করলে এই অবেলায়, এই অসময়ে?"

লুটিয়ে পড়ে অসীমা মহাকালের পায়ের তলায়। প্রশ্ন করে অরুণ—"কৈ তুমি তো কিছু বলো না?" কি বলবে অসীমা? যে কথাটি শুনবার জন্ত তার উন্মুখ অন্তর দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিল আজ সেই অন্ত ঘোষণা সেই নির্ভীক প্রকাশ কেমন করে উপেক্ষা করবে সে; কিন্তু এমন ভাবে ভেরী বেজে উঠবে তা তো সে চায় নি?

আর সীমা? তার নিভৃত অন্তরের সবটুকুই যে অসীমার জানা। সীমার অন্তরবেদীতে অরুণের যে স্বর্ণ-সিংহাসন কেমন করে তাকে শূন্য করে দেবে অসীমা। একি কঠিন পরীক্ষা? একি প্রচণ্ড পরিবেশ? মহাকালের পায়ে মাথা নোয়ায় অসীমা—"যা পেলাম যেন চিরদিন তার সম্মান দিতে পারি।" শুধু এই কটি কথাই ভাবতে পেরেছিল সেদিন অসীমা। তারপর মনে নেই শুধু মনে আছে ওর শিথিল কম্পিত হাতদুটি ধরে অরুণ নিয়ে গিয়েছিল তাকে গোবিন্দজীর মন্দিরে।

তারপর চলে যায় অরুণ অন্য পথে। অসীমার পথ চলা সুরু হয় নতুন করে।

অসীমার বুকের মধ্যে গুমরে মরে একটি কথা বারে বারে "সীমা" যাকে অসীমের সন্ধান পাই না, সে সীমিত — তুমি কি আমায় বুঝতে পার না; পার না কি আমার সব দ্বন্দ্বের সমাধান করতে;"—কিছুই স্থির করতে পারে না অসীমা। এতখানি ভালবাসা, এতখানি নির্ভরতা, সে কেমন করে উপেক্ষা কোরবে? আবার ভাবে, তারই উপস্থিতিতে হয়তো সীমার ভাগ্যকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবে! অসীমা তো তা চায় না—সীমাকে যে ভালোবাসা সে দিয়েছে, তাতে তো কোন ফাঁকি নেই—গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে অসীমা ভেবে দেখে যে এ অবস্থায় অরুণকে ত্যাগ করে গেলে হয় তো তার ক্ষতি হবে। অরুণ তো তার কাছে কিছুই চায় না! চায় শুধু প্রসন্নতা, ভালবাসা—সেই ভালবাসা, যা দেহের মাঝে ধরা দিতে চায় না, চায় অন্তরের মাঝে বন্ধন। তবে কি দোষ তাকে শুধু ভালবাসায়? মনের সঙ্গে বোঝাপড়া সীমার শেষ হলো। ভাগ্যের হাতে সে তুলে দিল সবকিছু, তবে নিজেকে সে একটু একটু করে সরিয়ে নিতে চায় সবের থেকে—সীমার কাছ থেকে, অরুণের কাছ থেকে। অরুণকে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করালো যেন সীমাকে সে কোনদিন না আহত করে, তার জন্য যদি অসীমাকে আঘাতে জর্জরিত হতে হয়, তাতেও সে রাজী!!

অসীমা নিজেকে এখন সত্যই ভাগ্যবতী মনে করে—নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসতে পেরে যে সুখ—ভালোবাসা পাওয়ার যে তৃপ্তি, তা তো সে পেয়েছে—প্রেম তাকে অমরমুকুট পরিয়েছে, আর তো কোন দুঃখ তার নেই!!

অসীমা চলে চায় অনেক দূরে—নিজের ভাবের সম্পদে নিজেকে ভরে নিয়ে। সীমার চোখে বা মনে এ সবের কিছুই ধরা পড়ে না।

অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। অরুণের চিঠি, সীমার চিঠি হানা দিয়েছে অসীমার নির্জ্জন প্রবাসে। একটু ব্যতিক্রম—আগে একই খামে দুজনের চিঠি আসতো—এখন আলাদা এবং দুজনের দুজায়গা থেকে। সীমার চিঠিতে থাকে দুজনের কথা, অরুণ আর তার নিজের কথা। কিন্তু অরুণের চিঠিতে থাকে শুধু অরুণের নিজের কথা।

হঠাৎ দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন ঘোটলো। আবার এল ভারী নীল রংয়ের খাম—অরুণ আর সীমার যুক্ত চিঠি। সীমা লিখেছে, "অসীমা তোমার বক্ষিত যৌবন কি মধু সংগ্রহ কোরতে চেয়েছিলো আমারি মধুভাণ্ড থেকে?" অসীমার মনটা ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয় সীমার ব্যবহারে। অরুণ লিখেছে, "অসীমা! বন্ধুত্বটা বজায় রাখতে পারলে না কুৎসিত প্রেমের পর্য্যায় নামিয়ে নিয়ে এসে অসমান কোরলে তোমায় আমায়, আর সীমাকে। সীমার সরলতার সুযোগ নিতে কি তোমার একটুও বাধলো না।" তারপর? অসীমা শুধু স্তম্ভিত হ'য়ে যায়—পৃথিবীর এক কোণে সে আজও বেঁচে আছে। শুধু বিরাট একটা প্রশ্ন নিয়ে।

সীমা সীমাবদ্ধ হ'ল, অসীমা হয়তো একদিন অসীমেই হারিয়ে যাবে।

রহস্যময়ী

শ্রীসীতাদেবী মুখোপাধ্যায়

—নারীকে রহস্যময়ী যিনি বলেছেন, অতি খাঁটি কথা বলেছেন তিনি। সত্যি, এই রহস্যময়ীদের আদি-অন্ত পাওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীদের দুরূহ ব্যাপার।

স্বাতী বললে, নারী রহস্যময়ীকে নিয়ে হঠাৎ এই বিশ্লেষণ করার হেতুটা জানতে পারি?

অনন্তা এতক্ষণ মাথা নামিয়ে কোলের ওপর রাখা বইখানা পড়ছিল। স্বাতীর কথা শুনেসশব্দে বইখানা বন্ধ করে বললে, হেতু অন্য কিছু নয়, আমি যে এই বইটা পড়ছি তাতেই নারী রহস্যময়ীর আবির্ভাব ঘটেছে।

ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরিয়ে সুধীর বললে, আহা, তা কেন? তুমি যত পুশী বই পড়ো তার ভেতর রহস্যের কি আছে। কথাটা হঠাৎ মনে পড়লো তাই বললুম। বিশেষ আজ যখন ঐ কথাটা শুনলুম তখন নারীকে রহস্যময়ী ছাড়া অন্য কিছু মনে হোল না।

—কি শুনলে বলতে আপত্তি নেই নিশ্চয়?

—নাঃ আপত্তি কিসের! তোমাদের নিশ্চয় আভাকে মনে আছে? সে কাল রাত্রে আত্মহত্যা করেছে।

—আত্মহত্যা? সেকি? স্বাতী আর অনন্তা রুদ্ধশ্বাসে বললে।

—হ্যাঁ, কারণ কিছু জানা যায়নি। ছেলে স্বামী নিয়ে সুখের সংসার। স্বামী অতি ভদ্রলোক, তাছাড়া দুজনে ভালবেসে তার পর বিয়ে হয়েছে—কাজেই এক্ষেত্রে হঠাৎ এ রকম করবার কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলছি নারী রহস্যময়ী। তারপর দেখো অনিলের মা। ভদ্রমহিলা কত কষ্টে ছেলেকে বড় করলেন লেখাপড়া শেখালেন। ছেলে ভাল চাকরী পেলে, তার বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনলেন, হঠাৎ একদিন সকালে জানা গেল তিনি ঘর সংসার সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। কেন কি বৃত্তান্ত কিছুই জানা গেল না—সেইজন্যে রহস্যময়ী কথাটা অনিলের মাকেও অনায়াসে বলা যায়।

—আহা কি কথাই বললেন, অনিলের বৌয়ের ব্যবহারে কষ্ট পেয়েই তো উনি কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন। অত কষ্ট করে মানুষ করা ছেলের বউ যদি ভাল না হয়, তাহলে মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক বিশেষ ছেলেও যখন বউয়ের পক্ষ নিলে।

সুধীর বললে, ছেলের দোষ দিচ্ছো কেন? স্ত্রী যদি দিনরাত কানের কাছে বলতে থাকে তখন ও বেচারার না শুনে উপায় কি? মেয়েরাই তো সংসার ভাঙে আবার তারাই গড়ে।

—বেচারা বোল না। মেয়েরা যখন বলে তখন পুরুষ তা শোনে কেন? নিজের মা বোন ভাইকে সে কি স্ত্রীর চোখ দিয়ে নতুন করে দেখবে নতুন করে সব শুনবে? তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নেই?

—আহা থাকবে না কেন? কি জানো স্ত্রীর প্রভাব স্বামীর ওপর বেশী পড়ে কিনা—তাছাড়া সুন্দরী স্ত্রী যখন। সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়। এটা জানো তো!

—ওঃ তুমিও বুঝি ঐ সুন্দর মুখের খপ্পরে পড়েছো? তা না হলে অনিলের বউয়ের কথা কে না জানে।

সুধীর হো হো শব্দে হেসে বললে, মেয়েরা বড় জেলাসী হয়। এই মাত্র অনিলের বউয়ের পক্ষ নিয়েছিলে। যেই আমি একটু ওর হয়ে বললুম অমনি সেটা সহ্য করতে পারলে না, তার বিপক্ষে চলে গেলে... আরে শোনো শোনো, চলে যাচ্ছো কোথায়?

স্বাতী হেসে বললে, নাও, এবার যাও রান্না ভাঁড়ারে। আচ্ছা দাদা, আভা হঠাৎ এ কাজ করলে কেন?

সুধীর বললে, কেন করেছে বলা শক্ত। তবে আমার মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রে ভালবেসে বিয়ে করলে পরস্পর পরস্পরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কেমন একটা সন্দেহ আসে। অন্ততঃ আভার দু'একটা কথা শুনে আমার ঐ ধারণা হয়েছে। অবশ্য সকলের ক্ষেত্রে কথাটা

খাটে—তা নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়। এ সম্বন্ধে বিদেশে ওরা অনেক বই লিখেছেন। কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, কেন এমন হয়।

মাতী বললে, যাও দাদা, দেখো গিয়ে। ওদিকে সিনেমা যাবার সময় হয়ে এল।

—হ্যাঁ যাই। সুধীর উঠে গেল।

দুর্লভ ক্ষণ

শ্রীকুমারী অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনদিনই ডাইরী লিখি না আমি। মনে যে হয় নি তা নয়, তবে এক কথায় বলতে গেলে হয়ে ওঠেনি। এই লেখাটি আমার অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই হয়ে গেল বলতে হবে। তবে এটাকে ঠিক ডাইরী বলা চলে কি? একটি দিনের, একটি সামান্য অতি তুচ্ছ ঘটনা·· কিন্তু সেই তুচ্ছতার যে গভীরত্ব তার গাঁথুনীই বড় পাকা হয়, যা বহুকাল পর্য্যন্ত মানুষের মনের অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকে। এই ঘটনাটি সেইরকমই একটি অতি সামান্য ঘটনা।··

সবেমাত্র শরীর খারাপ থেকে উঠেছি, শরীরটা তখনও ঠিকমত সুস্থ হয়নি - কাজেই মা বললেন—

"এই আজ তুই নাই বা স্কুলে গেলি, কাল না হয় যাস্। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে গেলে আবার যদি কিছু হয়।"

মনের আনন্দে গান করতে করতে বই গোছাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল আবার কতদিন বাদে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে —কারণ সেইদিনই পুজোর ছুটীর পর প্রথম স্কুল খুলছে।

তাই মনের আনন্দে গান করছিলাম—

"আমার প্রাণে নবীন মেঘের সুর·····"

কিন্তু গানের লাইনটা শেষ হতে না হতেই মা এসে ঘরে ঢুকলেন, এবং মার কথায় আমার গান অর্দ্ধপথেই বাধা গেল। "নবীন মেঘের সুর" আর লাগতে দিল না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মনের ক্ষোভ মনে চেপেই নিজের মনে কাজ করে গেলাম। দুপুর বেলায় সবাই যখন নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আমি তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বইগুলি নিয়ে বসলাম।

কিন্তু বইএ মনঃসংযোগ করার এমন শক্তি কার? কেবলই মনে হতে লাগল আজ সবাই স্কুলে কত আনন্দ করছে, আর আমি? আমার ভীষণ রাগ হতে লাগল।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম, বাইরের দিকে চেয়ে। শরতের স্নিগ্ধ সোনালী রৌদ্রের রূপটা হঠাৎ বড় করুণ লাগল, কেমন যেন মন কেমন করা, বিষাদপূর্ণ নিরিবিলি ভাব।···

অবাক হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলাম এই নির্জ্জনতার দিকে। কি গভীর নির্জ্জনতা! মনে হল এই নির্জ্জনতার অন্তরালে পৃথিবীর যে অপরূপ মহিমময় রূপটি তাকে এখনও কেউ বুঝতে পারেনি।

মন থেকে সমস্ত বিষাদ দূর হয়ে গেল, শুধু চেয়ে রইলাম সেই দিকে। নিস্তব্ধ ক্লান্ত শরৎ দুপুরের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে ব-হু-দূ-রে একটা কাকের একটানা কর্কশধ্বনি ভেসে এল। রৌদ্রতপ্ত সুনীল মেঘপথের বুকে ইতস্ততঃ চিলের দল স্থির ভাবে উড়তে উড়তে ক্রমে ছোট্ট হয়ে মিলিয়ে গেল।

মনে হল এই পৃথিবীর প্রতিটি মুহূর্ত্তই কি মূল্যবান! নিজের কথাই বলছি, মনে হল এই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তটি কি জীবনে কোনদিন এত মধুর ভাবে ফিরে পাব? হয়ত যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই শরৎ দুপুরটিও আবার আসবে কিন্তু তা এত মধুর সুষমায় আত্মপ্রকাশ করবে না। তখন বাল্যের সে সুমধুর মনও পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠবে। আজ হয়ত ভুলে যেতে না দেওয়ার জন্যে অভিমান করছি কিন্তু

যখন বার্ধক্যে উপনীত হব তখন কৈশোরের এই প্রতিটি মুহূর্ত, এই নির্জন ক্লান্ত দুপুরের স্মৃতিটি মনের আয়নায় ধরে থাকবে চিরপ্রজ্বলিত।

তার সঙ্গে ভেসে উঠবে আর একটি স্মৃতি। ব-হু-বি-ন আগের মাতা-পুত্রীর একটি দিনের অভিমান।

তখন সেই স্মৃতিটিও ধরে উঠবে চির সুমধুর।.....

———

প্রহসন

শ্রীগীতা গুহ
(নন্দ)

গভীর বেদনায় অব্যক্ত ক্রন্দন, জলে ভরে ওঠে মধুছন্দার চোখ দুটি তৃপ্তি মেলেনা, এত বড় পৃথিবীটাতে নিজেকে বড় একা মনে হয়।

রটু কিন্তু পাশেই বসে আছে, প্রদ্যুম্নের ছেলে তারই মত একদিন অনায়াসে বন্ধন কেটে পালাবে কী না কে জানে? অজানতেই দীর্ঘশ্বাস পড়ে, প্রদ্যুম্নের ধরার মর্ম সে বুঝল না! আর মধুছন্দার সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করে তার বান্ধবীর দল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র সুদর্শন প্রদ্যুম্ন রায়ের ভাবক দলের অভাব ছিল না। আজকের বিখ্যাত অধ্যাপক ও সুলেখক প্রদ্যুম্ন রায়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ছাত্রছাত্রীর দল নিয়ে সে বেড়াতে বার হোয়েছে ওয়ালটেয়ার। চারিদিক থেকে কত সম্মান, শ্রদ্ধা বর্ষিত হয় প্রদ্যুম্নের ওপর, কিন্তু তাতে সত্যিই কী লাভ ক্ষতি আছে কিছু মধুছন্দার?

ওয়ালটেয়ার যাবার আগে প্রদ্যুম্ন বলেছিল, "রটুকে নিয়ে তোমার দিন তো ভালই কাটছে ছন্দা!"

তারপর একটু ভেবে আবার বল্ল, "দু একটা কবিতা টবিতা লিখলেও তো পার, বার করে দেবার ব্যবস্থা করে দেবখন।"

মধুছন্দা হাসি গোপন করেছিল, সময় কাটাবার ব্যবস্থা পত্র দিচ্ছে প্রদ্যুম্ন, কত দয়া। কিন্তু, কয়েক বছর আগেও ধরার এমন প্রকট প্রকাশ হয়নি তো।

ফ্রাচের মধ্যে ভালো পা দুটো—স্থির রেখে আন্ততোষ বিল্ডিংয়ের একতলার লিফটের সামনে দাঁড়িয়েছিল মধুছন্দা; সবেমাত্র অনার্স নিয়ে বিয়ে পাশ করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সে প্রবেশ করেছে...কত ভয়, নতুন জগতে প্রবেশের আনন্দও সঙ্গে আছে।

"এ কী ছন্দা, তুমি এখানে?" কতদিন পরে ষোলোও তাকে হঠাৎ দেখেই চিনে পেরেছিল প্রদ্যুম্ন।

"আরে তুমি।" ফ্রাচের ভিতর ভাঙা পা দুটো যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হোয়ে উঠল, জীবনে এই প্রথমবার অঙ্গ-হীনতার জন্য লজ্জিত হোয়েছিল মধুছন্দা, তারপর বাকি জীবন ধরেই সে সঙ্কুচিত হোয়ে রয়েছে।

"তোমার এ দুর্ঘটনা"—কপালটা কেঁপেছিল প্রদ্যুম্নের। হয়ত মনে হোল, কৃষ্ণচূড়া গাছটার সেই উঁচু ডালের শেষ প্রান্তে প্রদ্যুম্ন যদি সেদিন মধুছন্দাকে তুলে না দিত.....

"সে আমার দুর্ভাগ্য।" পুরাতন দুর্ভাগ্যের জন্য সত্যিই কিন্তু দুঃখ পেলনা মধুছন্দা, বরঞ্চ খুশি হোল, কতদিন আগেকার কথা আজও মনে রেখেছে প্রদ্যুম্ন।

সেদিন লিফটের সামনে ফ্রাচ ধরা একটা কুরূপা মেয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিখ্যাত ছাত্রকে এতক্ষণ কথা বলতে দেখে কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি চারিদিক থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন মধুছন্দার অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল, তার প্রকাশ সম্পর্কে পরবর্তী জীবনে সে সচেতন হোয়েছিল বৈ কী! কিন্তু, এক সময়ে যা ছিল তার গৌরব, আজ তাই বুঝি তাকে লজ্জা দিচ্ছে।

বাড়ি গিয়ে প্রদ্যুম্ন জানাল, "মা, রাণু মাসীমারা ক'লকাতায় এসেছেন"—

রাণুমাসীমাদের মা ভুলে যাননি, এক সময়ে পূর্ববাঙলার

বরিশাল জেলার পাশাপাশি তাঁরা বাস করতেন। তারপর কর্মসূত্রে প্রসূনের বাবাকে কলকাতায় চলে আসতে হোল, পরিবার সঙ্গে নিয়ে এলেন। আর এতদিন পর, বাঙলা ভাগ হোলে, যাদুঘাদীরা ক'লকাতায় এলেন।

মধুছন্দাদের খবর নিলেন মা উৎসুক হোয়ে, কতদিন আগেকার দুর্ঘটনার কথাও মায়ের আজ মনে আছে। মধুছন্দা তখন হাসপাতালে, প্রসূনরা সে সময়েই চলে এসেছিল।

ওদের পুরাতন পরিচয়ের সূত্র ধরে আবার নতুন করে টান পড়ে যেন নতুন জগৎ সৃষ্টি করল।—সে সব স্মৃতি মধুছন্দার কাছে আজও স্পষ্ট হোয়ে আছে, প্রসূন তাদের ভুলে গেছে।

মধুছন্দা জানে, প্রসূনের বহু বিস্তৃত জীবনের খণ্ডাংশেও নয়, অতি নগণ্য একটা স্থানে পড়ে আছে মধুছন্দা, কিন্তু তার জীবন ঘিরেই যে রইল প্রসূন।—আবার নতুন করে মধুছন্দা যেন তার অজ্ঞতাসত্ত্বার জন্য সঙ্কুচিত হোয়ে পড়ে। তার দুর্ভাগ্য, তারই দুর্ভোগ, সুদূর অতীতে প্রসূন তাকে গাছের অত উঁচু ডালটাতে না তুলেও সে তার পা দুটোকে হারাতে পারত। আর সুদূর অতীতে প্রসূনই তাকে আবার অনেকটা উঁচুতে তুলেছিল, সেও তারই দুর্ভাগ্য।

তবু পঙ্গু অঙ্গের জন্য এর আগে সে কখনও নিজেকে দুর্বল মনে করেনি। রূপে, রসে ভরা অপরূপ এ বিশ্ব জুড়ে উপভোগ করবার বিচিত্র মাধুরী চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—তাই কোন জীবনই অসুস্থ নয়, এ সহজ সত্যকে সে বুঝেছিল, এম, এ, ক্লাসে ঢোকবার আগে পর্যন্ত সুস্থ জীবনই ছিল মধুছন্দার! পড়াশুনা, সাহিত্য চর্চা, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গলাভ · সেও এক পরিপূর্ণ জীবনের রসাস্বাদন। মধুছন্দার দুর্বলতার কথা সে নিজে কেবল ভুলে যায়নি, আর পাঁচজনও মেনে নিয়েছিল মধুছন্দার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে।

মা বাবার আদুরে মেয়ে মধুছন্দা, তাঁদের প্রচুর অর্থ ছিল আর ছিল মধুছন্দার 'পরেই স্নেহাধিক্য। সুতরাং মধুছন্দার সব আব্দার তাঁরা রক্ষা করতে পেরেছেন, আর মধুছন্দার আব্দারকে সার্থক করত প্রসূন।

একবার প্রসূন একটা সাহিত্যপত্র প্রকাশ করবার পরিকল্পনা করেছিল, সম্পাদনা সেই করবে স্থির হোল, আর টাকা জুগিয়েছিল মধুছন্দা! অবশ্য কাগজটা বেশি দিন চল্ল না, তাতে ওদের দুঃখ ছিল না। প্রসূনকে খুশি হোতে দেখেই খুশি হোত মধুছন্দা। ওর সব কিছু আশা আকাঙ্খা সেদিন প্রসূনকে ঘিরেই বিকাশ লাভ করত। প্রসূনের চোখের উৎসাহ যেন মধুছন্দার চোখে ধারার অঞ্জন পরিয়ে দিত। প্রসূন তখন কী ভেবেছে তা জানে না মধুছন্দা। কিন্তু অনেক কথা ভাবত মধুছন্দা, অপূর্ব সে সব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর শুধু স্মৃতি নিয়ে আর খেলা করতে পারে না মধুছন্দা।

ক'দিন থেকে জ্বর হোচ্ছে মধুছন্দার, এমন জ্বর আজ-কাল তার প্রায়ই হোয়ে থাকে। সংসারে একটা বোঝা হোয়ে পড়ছে নাকি মধুছন্দা? কিন্তু পঙ্গুর 'পরে মমতা দেখাতে এ পরিবারের কেউ তো কখনও কার্পণ্য করেনি!

প্রসূনের ছোট ভাই অরন্ত সম্প্রতি বিয়ে করেছে, মাত্র অল্প ক'দিনে এ সংসারে মালতীর কেবল প্রতিষ্ঠা হোয়েছে। জন্তুর মূল্যই বুঝি বাড়িয়ে দিল ঐটুকু মেয়েটা—সকলকে খুশি করবার ব্রত যেন সে নিয়েছে। আজ মধুছন্দার মনে হয়, বাইরের জগৎ একদিন তাকে যেমন করে গ্রহণ করেছিল, আজকে ঘর তাকে তেমন ভাবে আপন করে নিল না। এখানে তার পঙ্গু দেহ বারবার হার স্বীকার করছে।

"দিদি!" মালতী এসে কাছে দাঁড়িয়েছে, "রন্টুকে আমার কাছে দেবে?"

"কেন?" তাজা পা দু'খানা শাল দিয়ে ঢাকা রয়েছে; বালিশে হেলান দিয়ে সুস্থ মানুষের মত বসে রয়েছে মধুছন্দা, ওর পাশে শুয়ে রন্টু ঘুমোচ্ছে।—এটুকুও বুঝি কেড়ে নিতে চায় মালতী; ওর বাধিত মুখের হাসি যে অমল, তবু ওর সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করবার মত ছোট হোতে পারবে না মধুছন্দা! তবু—প্রসূনও নির্ভর করে মালতীর পরে, এ বাড়ির সকলেই করে যে।

মুখ নিচু করছে মালতী, মধুছন্দার কণ্ঠস্বরে ভিরস্কার ফুটে উঠেছে। তবু মালতী বল্ল, "তোমার শরীর ভাল নেই।"

"কে বলেছে? আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।" সোজা হোয়ে বসল মধুছন্দা।

মালতী তবুও চলে গেল না, মেয়েটার স্বভাব মাধুর্যে মা কী সকলে প্রীত, কিন্তু মধুছন্দা তা মানে না।

"দিদি", মালতী তখনও বল্ল, "আজকে দাদা আসছেন, তাই না?"

চমকে উঠল মধুছন্দা, সদা ব্যস্ত প্রসূনের কোন খবরই পায় না সে, কিন্তু মালতী তো জানে। মালতীর প্রশ্নের জবাব দিতে হোল মধুছন্দাকে, সে বল্ল, "তাই হবে।"

"যাবার সময়ে আজকে ফেরবার কথাই বলে গিয়েছিলেন সে—"

"তবে আজ আসবেন।" নিজের দুর্বলতা চাপতে গিয়েই বুঝি কণ্ঠস্বর তার রুক্ষ হোয়ে উঠেছিল।

মালতী চলে গেল। আর সোজা বসে থাকতে পারল না মধুছন্দা, তাকে বিছানায় শুয়ে পড়তে হোল। মালতীর মনটা কিন্তু খারাপ হোয়ে গেল, মধুছন্দাকে সে যেন বুঝেও বুঝতে পারে না। যথেষ্ট মমতা নিয়ে তার কাছে এগিয়ে গেছে সে, কিন্তু মধুছন্দা তাকে কাছে চায় না।

পঙ্গু, অসুস্থ মানুষটার জন্য আন্তরিক বেদনা আছে মালতীর, তাই সে মধুছন্দাকে যত্ন করতে চায়, কিন্তু মধুছন্দা তাকে ভুল বোঝে।

অসুস্থ শরীরের ওপর অন্যায় ভাবে অত্যাচার করে মধুছন্দা তার রোগ বাড়াতে চায়, কিন্তু কেন? এ অভিমানের কারণ খুঁজে পায় না মালতী, বরঞ্চ অঙ্গহীনা মধুছন্দার সৌভাগ্যকে অনেকে যে ঈর্ষা করে তার অর্থ সে বোঝে···। ছাত্রী জীবনে সে প্রসূন আর মধুছন্দার প্রেম কাহিনীর গল্প শুনেছে বান্ধবীদের মুখে, মনে মনে ওদের পরবর্তী দাম্পত্য জীবনকে সে শ্রদ্ধা করেছে। ঘটনা চক্রে অমন্তর সঙ্গে তার বিয়ে হোল, এ বাড়িতে বধূরূপে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য তাকে আন্তরিক আনন্দ দিয়েছিল। অমন্ত তার জীবন সার্থক করেছে, প্রসূনকে সে শ্রদ্ধা না করে পারে না। কিন্তু, মধুছন্দা কেন এমন করে, আর এ আত্মপীড়নের কারণ খুঁজে পায় না মালতী। একজন পঙ্গু মেয়ে এমন স্বামী পেয়েও খুশি হোতে পারে না!

জ্বর হোচ্ছে রোজ, তবু অবেলায় মধুছন্দা স্নান করে এল। মালতী বাধা দিয়েছিল, রাগ করে মধুছন্দা বল্ল, "কেন তোমার এত মাথা ব্যথা মালতী।"

"শরীর যে আরও খারাপ হবে!"

"শরীর ভাল রেখেই বা কী হবে? মাথাটা ধরেছিল, বেশ ভাল করে স্নান করে এলাম।"

"ডাক্তার বাবু বারণ করেন—" মালতী।

"ডাক্তার আমার চেয়ে আমার শরীরের কথা বেশী বোঝে না!" মধুছন্দা উত্তেজিত হোয়ে পড়েছিল, মালতীই তাকে ধরে বসিয়ে দিল।

সেদিন সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিল মালতীর। তাই অমন্তকে সে বলেছিল, "দিদি কেন এমন করেন বল তো?"

ম্লান মুখে অমন্ত কেবল বলেছিল, "বৌদিকে মেনে নিও।" এর বেশী আর কিছু বলেনি অমন্ত। মালতী অমন্তর কথা রেখেছে। আর অমন্ত ভাবছিল, মেয়েরা মেয়েদের ব্যথা বোঝে না কেন? মধুছন্দাকে বুঝতে কি কোন অসুবিধা আছে! দাদার পরে মনে মনে অভিযোগ আছে অমন্তর।

জ্বর বেড়েছে মধুছন্দার, রুটুকে তাই নিজের কাছে নিয়ে গেছে মালতী। প্রসূন আজ ওয়ালটেয়ার বেড়িয়ে বাড়ি ফিরেছে।

সদা অসুস্থ মধুছন্দা সুস্থ কি না এ সংবাদ সব সময়ে না নিলেও চলে; মধুছন্দা সুস্থ আছে, এটাই যেন কিছু নতুন খবর। তবু মধুছন্দাকে অবিচ্ছেদ্য বিশ্রাম দেবার জন্য কেউ তার ঘরে ঢোকেনি; প্রসূন জেনেছে, মধুছন্দা ঘুমোচ্ছে।

মালতীর ঘরে আসর জমেছে। সুন্দর গল্প করতে পারে প্রসূন, ওর লেখার মতই সুন্দর ওর কথা বলার ভঙ্গী। এ ঘরে চুপচাপ পড়ে থেকেও সব কিছু অনুভব করতে পারে মধুছন্দা!····· প্রসূনের হাতে থাকবে জলন্ত সিগারেট, ওর মুখে প্রশান্ত হাসি, সুন্দর করে গল্প বলছে··· ···· আর উৎসুক শ্রোতা দুজন দুপাশে বসে আছে, অমন্ত খুব নিচু করে বসে শুনছে, মালতীর বড় বড় চোখ দুটো ঔজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রুটু ঘুমিয়ে পড়েছে মালতীর নরম বিছানায়··· প্রসূন কথা বলছে···তারা প্রসূনের কথা শুনছে চকল

জেগে উঠছে মধুছন্দা। ঘুম তো আসে না, কিন্তু কেন? প্রশ্নটা একবারও আসতে পারতো না তার মনে? কোন কথা বলবার কিম্বা শোনবারও কি ছিল না কিছু?

ঘরের আলো নেভান, রাত ভোরেছে। মধুছন্দা উঠে বসল। কেন এসব থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত করবে? সেও যাবে পাশের ঘরে, হাসি মুখে ওদের কাছে গিয়ে বলবে মালতীর জীবন এমন ভাবে চারিদিক থেকে পূর্ণ হোল, আর সে কিছুই পাবে না? কেন?

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে চাইল মধুছন্দা,... কিন্তু হাঁটুটা হাতের কাছে নেই যে!

কৃষ্ণকলি

শ্রীস্বপ্নপ্রভা ভাদুড়ী

(১২)

শঙ্করের মিলের অর্দ্ধেক শ্রমিক ও কর্মচারী তার জমিদারীর খাসমহলের চাষী প্রজা। বর্ত্তমানে যারা হচ্ছে শ্রমিক। তবে সাধারণ চটকল এবং কয়লা খনির শ্রমিকদের চেয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক ভালো, অনেক উঁচু। ঘূর্ণমান যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তারা যখন শুনলো যে তাদের মৌরাশীমার মৃত্যু হয়েছে, তখন তারা বজ্রাহতের মত হাতের কাজ বন্ধ করে মাটীতে বসে পড়লো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বালকের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বৃদ্ধেরা কপালে করাঘাত করে বললে, "মা যে আমাদের সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী ছিলেন রে; তিনি কেন এই দুঃখের পৃথিবীতে থাকবেন? আমরা পাপী, আমরা চিরকালের অভাগা; তাই আমাদের অকালে মাতৃহীন করে তিনি আনন্দের রাজ্যে চলে গেলেন। ওরে তোরা আজ সত্য করেই মা-হারা হলি।"

এইসব শ্রমিকরা দেশে থাকতে কোনও দিন সূর্য্যার ছায়া পর্য্যন্ত দেখেনি। তার মাতৃত্বদয়ের পরিচয় ওরা পেয়েছিল ইদানীং। দেশে যাওয়ার পূর্ব্বে রজব প্রায়ই সূর্য্যাকে মিলে নিয়ে গিয়ে কাজকর্ম দেখাতো; ছুটীর দিনে বস্তিতে নিয়ে গিয়ে ওদের অভাব অভিযোগ শোনাতো; এসময় সূর্য্যা কখনও শূন্য হাতে ওদের মধ্যে যেতো না; নিজের বিরাট সঞ্চয় থেকে যা মন চাইতো, তাই নিয়ে গিয়ে ওদের মধ্যে বিতরণ করতো এমনি ভাবেই সূর্য্যার সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। রজব এমনি ভাবে সুকৌশলে তাকে তার অহঙ্কার আর আভিজাত্যের উচ্চ আসন থেকে ধীরে ধীরে মাটিতে নামিয়ে আনছিল। এতে সকলের চেয়ে বেশী সুখী হয়েছিল শঙ্কর। আজ সকলের সেই নিরঙ্কুশ সুখের মূলে নিষ্ঠুর বিধাতা অকস্মাৎ কুঠারাঘাত করে বসলেন।

শ্রমিকদের সেই শোকসভার মধ্যে ধূমকেতুর মত এসে উদয় হলেন, তাদের রক্ষক বিকাশ বাবু। এসেই তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন, "এই তোরা কাজ ফেলে হাত গুটিয়ে বসে আছিস কেন?"

কেউ কোনও কথা বললো না, সকলে নিরুত্তরে বসে রইল। বিকাশ বাবু অধীর হয়ে কারো কারো পৃষ্ঠদেশে তাঁর হাতে কোলানো কুলাবের ডাঁটো দিয়ে বললেন, "কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি? সাধে কি বলে লাথির চোঁকি চড়ে ওঠে না"—

মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠে একটী বৃদ্ধ বললে, "কাজ করতে হাত উঠছে না বাবু; মায়ের জন্য মনটা কাতর হয়েছে"—

"রাখ, শালা তোদের প্রাণ কাতরের কথা"—বিকাশ বাবু হুমকি দিয়ে উঠলেন। বসে বসে দুঃখ করলে কি তোদের পেট ভরবে?"

দলের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে একটী যুবক উঠে দাঁড়াল। বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে তার অল্প বিস্তর পরিচয় আছে। স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ে সে রীতিমত অধ্যয়ন করে এবং নিয়মিতভাবে সে স্বাধীনতা সংবাদপত্র পাঠ করে

থাকে কাজেই অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে তার নীতি একটু উগ্র ধরণের। সে বললে, "আজ আমরা আর কাজ করবো না বড়বাবু।"

চোখ বড় করে বিকাশবাবু বললেন, "কেন?" এই ছেলেটীকে তিনি রীতিমত স্নেহ করেন।

"আমাদের মাকে স্মরণ করার জন্য, আজ আমরা কাজ বন্ধ রাখবো"—যুবকটী নির্ভীক স্বরে বললে।

"তোর বড় যে বুকের পাটা হয়েছে দেখছি", বিকাশবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, "কাজে যে করবি না বলছিস, মিল বন্ধ করার অর্ডার ওপরআলা থেকে এসেছে?"

আমরা অর্ডার নিয়ে আসছি ওপরআলা থেকে; যুবকটী হাঁটতে উদ্যত হয়ে বললে, "এস ভাই তোমরা, আমরা আপিস ঘরে চৌধুরীবাবুর কাছে ছুটীর জন্য যাই"—

মিলের পক্ষের এই দারুণ দুঃসময়ে বিকাশবাবু ইচ্ছা করলেই শ্রমিকদের ছুটী দিতে পারতেন। কিন্তু ওদের কাছে আর একটু খোসামোদ পাবার প্রত্যাশায়, তিনি বৃথা বাক্যব্যয় করছিলেন। এইসব কাজের লোকেরা ভয় করে হাতে থাকলে ওদের দিয়ে সময়ে অসময়ে অনেক কাজ পাওয়া যায়। বিকাশবাবুর হিসাবে কিন্তু একটু ভুল হয়েছিল। চোখ রাঙ্গিয়ে লাঠি উঁচু করে যে চিরদিন সকল বয়সের মানুষকে হাতে রাখা যায় না, এই আকাট্য যুক্তিটী তাঁর হিসাবের মধ্যে ধরা পড়েনি। সেই ভুলের জন্য আজ তিনি এই যুবকের কাছে পরাস্ত হলেন। শ্রমিকের দল হাঁটতে উদ্যত হলে তিনি কটুকণ্ঠে বললেন, "মনে থাকে যেন আজ হাজিরা বন্ধ"—

"না বাবু এতে হাজিরা বন্ধ থাকতে পারে না"—পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অনেক শ্রমিক উত্তর দিলে। "আলবৎ বন্ধ থাকবে"—মাটীতে কুলার ঠুকে বিকাশবাবু চিৎকার করে উঠলেন। হাজিরা বন্ধের নামে শ্রমিকের দল আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা দিন আনে দিন খায়। এহেন অবস্থায় হাজিরা না পেলে তাদের ত খাওয়াই জুটবে না। দরকার কি এসব গোলমালের মধ্যে গিয়ে? একজন তাদের মধ্যে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "চল্ ভাই সব কাজ করিগে; কি দরকার এসব হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে?"

এই কথা শুনে পূর্বেকার যুবকটী রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "না কিছুতে না; এ আমরা কিছুতে মানবো না। আপিস ঘরে আমরা যাবোই।"—

এমন সময় অদূরে কারখানের আড়াল থেকে রঞ্জনের সুদীর্ঘ মূর্তি দেখা যেতেই সকলে চুপ করে গেল। বিকাশ বাবু সরে পড়তে চেষ্টা করছিলেন। কেননা শ্রমিকদের সঙ্গে অকারণে বচসা করা শক্ত এবং রঞ্জন উহাদেরই পক্ষপাতী করে না। কিন্তু পালাবার তখন আর উপায় ছিল না। রঞ্জন একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার অতি গম্ভীর মুখ দেখে সকলে ভয় পেয়ে গেল। রঞ্জন দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের দিকে একবার ভালো করে লক্ষ্য করে গম্ভীর স্বরে বিকাশবাবুকে প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে বিকাশ বাবু?"

বিকাশবাবু তাঁর বিপক্ষচারীদের দিকে একবার আড়-চোখে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, "ওরা আজ কাজ করবে না বলছে স্যার।"

"কেন?" রঞ্জন শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। সে প্রশ্নে ওরা নিতান্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। কেউ মুখ নীচু করল, কেউ চোখে হাতচাপা দিল, একটী বৃদ্ধ হাঁউ মাউ করে কেঁদেই ফেলল। তারমধ্যে থেকে একটী যুবক বললে, "আজ আমাদের কাজে হাত দিতে মন লাগছে না ম্যানেজারবাবু। মায়ের জন্য মনটা বড় উদাস হয়ে গিয়েছে"—

বিকাশবাবুর দিকে ফিরে রঞ্জন বললে, "আজ ফ্যাক্টরী বন্ধ করার অর্ডার দিন বিকাশবাবু।" তারপর শ্রমিকদের পানে চেয়ে সে সজল কণ্ঠে বললে, "যাও ভাই, আজ তোমাদের সব ছুটী।"

কোনও গোলমাল না করে প্রত্যহের মত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে শ্রমিকরা দল বেঁধে গুদামটীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো তারপর সেখান থেকে নিজেদের জিনিষপত্র নিয়ে, সারি বেঁধে দ্বারদেশের দিকে যেতে লাগল। সেই দিকে চেয়ে রঞ্জনের মনে হোল, ঠিক যেন একটী নীরব শোকযাত্রায় যোগদান করেছে তারা। ততক্ষণে কলে ছুটীর বাঁশী বেজে উঠেছে, "পোঁও-ও-ও"—

আপিস বন্ধ হয়ে গেছে, কল বন্ধ হয়ে গেছে; শ্রমিক ও কর্মচারীরা যে যার ঘরে ফিরে গেছে। এবার রঞ্জনকেও

ফিরতে হবে। কিন্তু কোথায় ফিরবে সে? সে যে ঝড়ের রাতে নীড়হারা পাখী। তার ঘর নেই, বন্ধন নেই, কিছুই নেই। শূন্য উদাস মনে সে হাঁটতে হাঁটতে এসে গঙ্গার ধারে বসল। প্রাচীন একটী অশ্বত্থ গাছ; সেখানে তার অজস্র শাখা প্রশাখা মেলে শীতল ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ছায়াখানি তার পরিচিত বাহু বিস্তার করে ধীরে ধীরে রঞ্জয়কে তার অঙ্কে টেনে নিল। এ স্থানটী রঞ্জয়ের বড় প্রিয়। এই অশ্বত্থ গাছের তামল ছায়ায় ভরা কোমল মাটীর সঙ্গে মিশে তার বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি। এইখানে সে শঙ্কর ও সুধার সঙ্গে বসে বহু মেদুর অপরাহ্ণ ও সূর্যাস্তের সুষমামাখা সন্ধ্যা কাটিয়েছে; কে জানতো সে সুখের এরিমধ্যে অবসান ঘটবে? কে জানতো এরিমধ্যে সুধার জীবন-দীপ নিভে যাবে? রঞ্জয়ের দুটী চোখ জলে ভরে উঠল। সে জলও মুছল না, উদ্ভত অশ্রুকেও রোধ করতে চাইল না—চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে সে অবিরাম ধারায় ঝরে পড়তে লাগল। আর অফুল জল-রাশির মধ্যে দেখতে লাগল সে একখানি অতি পরিচিত স্নেহ-সুষম মুখ। একটী দরদী হৃদয়। যে হৃদয় তাকে অজস্র স্নেহ দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিল তার প্রেমবঞ্চিত অন্তর। হায় বলে ডেকে যে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার মনের যত যত অভাব ও অসম্মান ও অপূর্ণতার দুঃখ।

হায়, সেই মমতাময়ী সুধা এ পৃথিবীর কোথাও আর নেই। কোথাও গেলে তাকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। রঞ্জয়ের মন কিছুতে প্রবোধ মানতে চায় না। এর চেয়ে সে যদি সুধার কোনও সংবাদ না পেতো সেও শতগুণে ভালো ছিল। সে জানতো, তার ছোট বোনের মত মেয়েটী, তার জীবনের বিশিষ্টতমা দরদী নারীটী, যেখানেই থাক, আছে। কিন্তু এ যে নেই; কোথাও সে নেই। সেই বিরাট শূন্যতার মধ্যে একটী কথা শুধু অহির মত জলছে; "নেই, নেই, সে কোথাও নেই"—হায় রঞ্জয়, দুঃখ করে তুমি কি করবে? এ দুনিয়ার এই নিয়ম। তুমি আজ যাকে আপন মনে করে নিজের কাছে টেনে নেবে, কালই সে তোমায় অন্ধকারে একলা ফেলে, ছায়া হয়ে অনন্তে মিলিয়ে যাবে।

কৃষ্ণার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যখন সে হৃদয়ের গোপন দহনে দগ্ধ হয়ে যেতো, তখন বহু সময় সে সুধার মুখ স্মরণ করে মনে মনেই আনন্দ ও সান্ত্বনা পেয়েছে। তাই সে ভেবেছিল কৃষ্ণাকে ভুলে যাওয়া তার জীবনে খুব সহজ হবে। কিন্তু আজ সে বুঝতে পারলো, বিশিষ্টতম কোনও মানুষকে ভুলতে হলে, আগে নিজেকে ভুলতে হবে। তার জন্য হয়তো নীচেও নামতে হতে পারে তোমাকে, হয়তো উপরেও উঠতে হতে পারে, আত্মবিস্মৃত হলে যা হয়, তাই আর কি?

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রঞ্জয় বসে আছে। টুপটাপ করে তার আশে পাশে ঝরে পড়ছে লাল টুকটুকে পাকা অশ্বত্থ ফল। দৃষ্টি তার দূরে, বহুদূরে শূন্যে মীলিমার অসীমের মধ্যে হারিয়ে গেছে। সম্মুখে সৈকত বরণা গঙ্গা, মৃদু তরঙ্গ ভঙ্গে দুলে দুলে দুলে দুলে বয়ে চলেছে। অদূরে গঙ্গার ওপারে সারি সারি দেখা যাচ্ছে কলের চিমনি। তার থেকে গল গল করে কালো ধোঁয়া এঁকে বেঁকে বেরিয়ে শূন্যে উঠে সোনাঢাকা নীলাভ শূন্যের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন বঞ্চিত মানবাত্মার পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস পৃথিবীকে অভিশাপ দিচ্ছে, ফুঁসে ফুঁসে, ফুলে ফুলে। কোনও একটা কারখানায় বোধহয় শ্রমিক ধর্মঘট চলেছে। দলে দলে লোক সার বেঁধে পথের ধারে বসে আছে। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে; "ইনকেলাব জিন্দাবাদ মজুরী বাড়াও, হাঁটাই বন্ধ কর" ইত্যাদি তাদের তীব্র কণ্ঠস্বরে গঙ্গার জল কেঁপে কেঁপে উঠছে। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে লোকগুলো তেতে পুড়ে কালসে যাচ্ছে; তাদের কি ক্ষুধা তৃষ্ণাও নেই? এমন সময় উত্তাল জনস্রোতের মধ্যে পুলিসের লাল পাগড়ী ঝলসে উঠল। তাদের হাতে ব্যাটন ঝুলছে; অস্ত্রশস্ত্রও হয়তো গোপনে লুকায়িত আছে! সভয়ে শিউরে উঠে রঞ্জয় চোখ বন্ধ করল। নিজের দুরন্ত ছেলেমেয়েকে শাসন করতে যে মায়ের নিষ্ঠুর কার্যকলাপের প্রয়োজন হয়, সে কেমন মা? কেমন তার পালিকা শক্তি?

"স্যার"—রঞ্জয় অন্যমনস্কভাবে মুখ ফেরাতে দেখলো, তার পিছনে বিকাশবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। রঞ্জয়ের চোখে চোখ পড়তে বিকাশবাবু কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন তার তবে একটা কথা বলি—।"

রঞ্জয়ের তখন মনেরই কোনও বালাই ছিল না ; তা তার আবার কথা-কবির কি থাকতে পারে ? কাজেই সে জলের দিকে চেয়ে সেইরকম দূরের মানুষের মত বললেন, "কি বলবেন, বলুন ?"

"দয়া করে যদি এই গরীবের কুঁড়েয় একবার পায়ের ধুলো দেন"—বিকাশবাবু বললেন।

"কেন ?" রঞ্জয় প্রশ্ন করলে।

"বেলা অনেক হয়ে গেছে"—বিকাশবাবু বললেন, "গলায় দেখুন, সূর্য হেলে পড়েছে।"

"তা তো হয়েছেই"—রঞ্জয় আকাশের দিকে চেয়ে বললে।

বিকাশবাবু নাছোরবান্দা। সুযোগ বুঝে তিনি জলে চৌপ ফেলতে পারেন। আজ সুযোগ পেয়েছেন তিনি, রঞ্জয়কে গৃহে নিয়ে গিয়ে আদর আপ্যায়ন করে নিজের মহৎ অভিপ্রায় তিনি নিবেদন করবেনই তার কাছে। তাকে হাত করতে পারলেই কেল্লা ফতে। কেননা, এই রঞ্জয় শঙ্করের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ; অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। এই বাজারে ধরার জোরে কত লোক কত কি করে নিচ্ছে। আর বিকাশবাবুর প্রতি মিলের কর্তারা এত প্রসন্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ছেলের জন্য একটী কাজ সংগ্রহ করে নিতে পারছেন না। আজই ত সুযোগ এসেছে ; বাবুর মন খারাপ আছে, এই সুযোগে একটু আদর আপ্যায়ন করে তাঁর মন ভিজিয়ে দিয়ে, কথাটা তুলে একেবারে কাজ হাসিল করে নিতে হবে। মনের সমস্ত কুণ্ঠা জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিকাশবাবু বললেন, "আপনার মুখ বড় শুকনো দেখাচ্ছে স্যার, বোধহয় অসুখ করেছে আমার বাসা কাছেই, তাই বলছিলুম সেখানে বসে একটু বিশ্রাম করে তারপর বাড়ী ফিরবেন"—

বিশ্রাম ? রঞ্জয়ের জীবন থেকে বিশ্রাম, শান্তি, সুখ, আনন্দ সমস্ত চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। তার জন্য সে কাঙালের মত আর কারো দুয়ারে হাত পেতে পেতে ঘুরতে পারবে না। কথাটা মনে হতেই তার বুকের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের খালি খালি ভাব মনে হতে লাগল। সে এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা। বিকাশবাবু সেখানে না থাকলে সে হয়তো গলায় কাঁপ দিয়েই বসতো।

বিকাশবাবু আরও একটু অগ্রসর হয়ে, কণ্ঠস্বর আরও একটু মোলায়েম করে আবার বললেন, "চলুন স্যার, মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনার বড় পিপাসা পেয়েছে, চলুন একটু চা কি সরবৎ খাবেন।"

"চা ?" হাঁ সত্যি, রঞ্জয় অনেকক্ষণ চা খায়নি ; দারুণ পিপাসায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে ! তাই বুকের মধ্যে এমন করছে। আহা, বিকাশবাবু দীর্ঘজীবি হোন, ঠিক মায়ের মত তার মনের কথাটী ধরে ফেলেছেন। গাছতলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, "চলুন বিকাশবাবু, একটু চা খাওয়া যাক্"—

"চলুন স্যার"—বলে বিকাশবাবু খুশী হয়ে আগে আগেই হাঁটতে সুরু করলেন।

মিল-সংলগ্ন বাঁধানো পীচের রাস্তা শেষ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই খোয়াওঠা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথ দেখা গেল। পথের পাশে চওড়া করে কাটা কাঁচা নর্দমা, তাইতে আবর্জনা জমে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এইসব আধাসহরে জায়গায় ডাষ্টবিনের কোনও বালাই নেই। পথের পাশে পাশে স্তূপীকৃত হয়ে জমে রয়েছে সমস্ত গৃহস্থ বাড়ীর আস্তাকুড় ও জঞ্জাল। আর পাশে খেয়ো কুকুরদের খেয়োখেয়ি ত লেগেই আছে। এইরকম বিপজ্জনক পথে, রঞ্জয়ের মত মানসিক অবস্থার লোকদের অত্যন্ত সতর্ক ভাবে হাঁটার প্রয়োজন ; তা না হলে, যে কোনও মুহূর্তে কোনও নোংরার মধ্যে তাদের পদস্খলন হতে পারে। মানুষকে এদেশের মানুষ এখনও ঠিক মর্য্যাদা দিতে শেখেনি। তাই এইসব গ্রাম্য পথে নিজেদের সভ্য ভাবে পথ চলারও কোন ব্যবস্থা রাখেনি। নর্দমা আর আবর্জনার মধ্যভাগে লোক চলাচলের জন্য যে পথটি নির্দিষ্ট আছে ; সেটি দিনের বেশীর ভাগ সময় যানবাহন যাতায়াতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একবার পাট বোঝাই গরু মহিষের গাড়ী চলতে সুরু করলে তার সে যাত্রা শেষ হবার শীঘ্র কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধুলো উড়িয়ে দিয়ে তালে গরুর গাড়ীর মিছিল চলেছে ; পথের দুপাশে যেন ধুলোর ঝড় উঠছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সচকিত হয়ে রঞ্জয় বললে, "কোথায় নিয়ে চলেছেন বিকাশবাবু ? এদিকে কোথাও চায়ের দোকান ত দেখছিনা।"

আর আহ্লাদে গদ্গদ হয়ে বিকাশবাবু বললেন, "কি যে বলেন স্যার; এদিকের দোকানের চা কি আপনাদের মুখে দেওয়ার যোগ্য?"

"তবে এদিকে কোন্ যোগ্যতর স্থানে আমায় নিয়ে চলেছেন!"

"এই গরীবের কুঁড়েয়; ও কথা বলে স্যার আমায় লজ্জা দেবেন না—আমাদের সাধ্য কি আপনাদের মত অতিথির যথাযোগ্য সম্মান করি?"

রঞ্জয়ের এতক্ষণে মনে পড়ল, বিকাশবাবুর প্রথম অনুরোধের কথা; হ্যাঁ তিনি বলেছিলেন বটে তাঁর বাড়ী গিয়ে চা খাওয়ার জন্য। কিন্তু এটা কি ভালো হোল? গরীব ছাপোষা মানুষের বাড়ীতে গিয়ে তার একমুঠো পয়সা খরচ করিয়ে দেওয়া? ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, রঞ্জয়ের গলা শুকিয়ে তখন কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পথ চলতে তার তখন রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। কাজেই বিকাশবাবুর চাটুবাক্যে তার মত ভিজলোনা।

একটা জীর্ণ একতালা গৃহের সামনে এসে, বিকাশ বসু বিনীত কণ্ঠে বললেন, "আসুন স্যার, ভেতরে আসুন"

ভদ্রতা বিক্রেতিরতে ঢুকে রাঁধাতি একটি ছোট ঘরে ঢুকে রঞ্জয়কে চৌকিতে বসিয়ে বিকাশ বাবু ভিতরে চলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

জীবন

শ্রীকুসুম ভট্টাচার্য

কেন বাঁচি ব'লে কিছু নেই।
বাঁচতে হয় তাই বাঁচি
জন্মাতে হয় তাই আছি
মৃত্যুর পরে থাকব না।
দুই সীমানার মাঝখানে
কাল শুধু গোণা।

আগা নেই গোড়া নেই যার
একটি নিবিড় অন্ধকার
তার মাঝে একটি বিন্দুতে
ক্ষণকাল আলো এক কণা।
সেই আলো আমি। আর,
সেই আলো আর জ্বলল না।

আহ্নিক

শ্রীধীরেন বসু এম, এ.

উষ্ণ বাষ্পকণা
সিক্ত বাষ্প হয়ে উড়ে চলে
মৃদু স্বর্ণপথে
মুক্ত ডানা মেলে মেলে।
পাংশুবর্ণ দিবাসূর্য্য
রশ্মিজাল ফেলে
জাহ্নবীর জলে।
ধ্যান ভঙ্গী হাল
মগ্নদেশে ডুবে ডুবে
ডুবুরীর মতো চলে
যতটুকু পথ যাওয়া হ'ল
ততটুকু কুয়াশায় নাওয়া হ'ল।
ছপছপ স্রোতসিক্ত দাঁড়
ধীরে ধীরে চলে।
তীরে দেব মন্দিরে
বেজে যায় গান বেলা হ'লে।
আতুর রচনা করে
ঢালে অর্ঘ্য আহ্নিকের জলে।

এবার বুঝেছি আমি বাতাসের মত প্রেম

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কবে তুমি ভালোবেসে দূর বাতায়ন হোতে
মোর পানে চেয়ে
করেছিলে ভাবাবেশে দৃষ্টি বিনিময়, সে কথা
গেলে কি ভুলে ?
প্রথম আসঙ্গলিপ্সা অন্তরে জেগেছে তব মোরে কাছে পেয়ে,
দেবদারু বীথিকায় আমার ইঙ্গিতে এলে দুরুদুরু বুকে।
সরম বন্ধন টুটি বাধা নিষেধের মত যুক্তি তর্ক জাল
ছিন্ন করি এসেছিলে যৌবন-উৎসব তরে। সমাজ-সংসার
তোমার বিদ্রোহী মন করেছে বর্জ্জন, মোর ভাগ্যচক্র বাঁধা
আলো করে দিয়েছ যে, বাতাসের মত প্রেম বক্র গতি তার।
এবার বুঝেছি আমি, অন্তরে লালসা বহ্নি জ্বলে প্রতিদিন,
পূর্ণ যৌন নির্ম্মাণের অন্তরালে ঘুরিলাম দেশে দেশান্তরে।
যৌবন প্রবাহ মোর দুর্দ্দম কামনা সনে জীবনের চরে
ছুটিতেছে অনিবার, তুমি কেন মোর প্রতি হয়েছ কঠিন।
হৃদয়ের সীমা হোতে যে হৃদয়ে নীড় বেঁধে করিছ কূজন,
সেথা কি স্বপনে কভু লভিয়াছ কুণ্ঠাহীন মোর আলিঙ্গন ?

বিনিদ্র

(বি নি-দ্র)

শ্রীশতদল গোস্বামী

চোখে আজ ঘুম নেই, বসে আছি জানালার ধারে
শীতের কুয়েলি রাত বারে বারে তোলে শিহরণ।
অরণ্যের চোখে ঘুম, ঘুম নামে তুটান-পাহাড়ে
ঘুমন্ত ফুলের চোখে নীল রাত বুলায় স্বপন।

'হিলা'র আকাশে চাঁদ, ছায়া ফেলে কমলার বনে
চা-গাছের ঝোপে ঝোপে জোনাকিরা করিয়াছে ভিড়
ধ্যান মগ্ন হিমালয়, অসীমের বাঁশি আজ শোনে
দলিম খালের তীরে ঝ'রে পড়ে হিমেল-শিশির।

'জলঢাকা' 'তিস্তি' নদী ঘুমে তারা বিছায় আঁচল
গভীর অরণ্যে জ্বলে বাঘেদের হিংস্র দুটি চোখ :
'শিপ্‌চু'তে মেলা বসে, 'বাগো' খেলে জুয়াড়ীর দল
বনের মর্ম্মর শোনে কান পেতে বুঝি বিশ্ব লোক !

ভয়ার্ত্ত হরিণ-শিশু মৃত্যুভয়ে কাঁপে থর থর—
কি কি পোকা গান গায়, 'হিলা-বোরো' বাজায় ঘুঘুর :
চোখে মোর ঘুম নেই, কেটে যায় অতন্দ্র-প্রহর
ঘুমি মৌন ধরিত্রীর বক্ষে বাজে বেদনার সুর।

স্বপ্ন সাধ

বন্দে আলি মিয়া

রাত্রির আঁধার হতে ফিরিলনা দিনের পরীরা—
এখনো ফেরেনি ঘরে নিশি জাগা বখাটে কপোতী।
আমি আজ বসে আছি বাতায়নে একা নিরিবিলি,
তুমি কি আসিবে বন্ধু আজিকার অবসর ক্ষণে !
তোমার জীবন হতে ফুরায়েছে কামি নাকি বলো
সে দিনের চেয়ে থাকা দু'টি চোখে বিভল প্রহর !

রাতের স্বপন ভাঙে যেমনার প্রবাহের 'পরে
তোমার গানের সুর মোর মনে রয়েছে অক্ষয়।
আজিকে এসেছে তিথি দু'জনার জীবনের তটে
এনেছে সোনালি বেলা—এনেছে কি মাধবী বিলাস
তোমার মহির মনে জেগেছে কি এতটুকু সাধ !
তুমি যদি আসো আজ—রুধিবনা মনের দুয়ার।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা

শ্রীহিরণ্ময়ী বসু

"ঘটনাটা অবিশ্বাস্য।"

বীণা হেসে বলল—"যেন কথা বলছ মণিকা যদি অবিশ্বাস্যই হয় তাহলে আর বলছ কেন?

—বড় দুঃখে হয়তো বা মনের কোণে। তাছাড়া একেবারে যে চোখের সামনে ঘটা ব্যাপার কিনা তাইতেই বলতে সাহস পাচ্ছি। এ ধরণের গল্প অবশ্য আগেও শুনেছিলাম কিন্তু বিশ্বাস করিনি। নিজের জাতটাকে বড় করে দেখতাম ভাবতাম বাঙ্গালীর মত স্নেহপ্রবণ মন বুঝি আর কোন দেশের লোকের হয় না তাইতেই অতিরিক্ত আঘাতটা পেলাম।

—মেয়েটিকে তুমি আগেই চিনতে তাহলে?

—হাঁ চিনতাম মানে পরিচয় মাত্র একটি রাতের।

—বেশ মেয়ে না ভাই মণিকা?

—হাঁ বেশ। শ্রীটাও সুন্দর কথাবার্ত্তাও ভাল। তবু মাথায় তেল নেই পরণের কাপড় ময়লা ছেঁড়া।

একদিন নেত্র সিনেমায় ছুটির শোতে মাসিকা দেখতে এল পাশাপাশি দুই বাড়ীর দুটি বউ—মণিকা আর বীণা। সিনেমাতেই দেখা হয়ে গেল। আরো একটি মেয়ের সঙ্গে বসেছিল সাড়ে সাত আনার সিটের পাশেই সাড়ে চার আনার সিটে। প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গেই মেয়েটি বলে উঠল "প্রণাম দিদি, আপনার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে ভাবতেই পারিনি!"

—আরে: মিনু না? ইস্ তুমি যে খুব রোগা হয়ে গেছ ভাই মুখটা অত শুকনো কেন? সময় কি তোমার ভাল যাচ্ছে না?

মুখটা উঁচু করে তাকাল মিনু. সুন্দর চোখ দুটোর ভেতর থেকে অজস্র ব্যথা ঝরে পড়ল। মুখটা পরক্ষণেই নামিয়ে নিয়ে নীচু গলায় বলল—"আজ আমার সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি দিদি তাই বোধহয় মুখটা শুকনো লাগছে।"

উৎগ্রীব হয়ে এদের কথাবার্ত্তা শুনছিল বীণা। ছোট করে মণিকার হাতে একটা চিমটি কেটে ফিস ফিস করে বল—"কে ভাই মেয়েটি? কোন দিন বলোনি তো ওর কথা?"

—পরে বলব। আস্তে করেই উত্তর দিল মণিকা।

বই আরম্ভ হয়ে গেল। চিরাচরিত নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলল। বীণার দৃষ্টি কিন্তু ঐ আবছা অন্ধকারের ভেতর কেবলই ঘুরে ফিরে পড়তে লাগল মিনুর মুখের উপর। সত্যি ভারী সুন্দর লাবণ্য মুখটি কপালে একটা কাটার দাগ সেটাই যেন ওর মুখটাকে আরো করুণ করে তুলেছে। বং যে খুব ফর্সা তা নয়, সাজ সজ্জার কোন ঘটা নাই তবু মেয়েটি সুন্দর। মাঝে মাঝেই আঁচলে ছবিতে প্রিয় মিলনের সম্ভাবনা ঝরে এলেই চোখের জলটা শাড়ীর আঁচলে মুছে নিচ্ছে। কে জানে ওর কোন প্রিয়তম আছে, কিম্বা নেই বলেই মনোবেদনা; কত কথাই ভাবল বীণা।

ইতিমধ্যে বিরাম হল। মণিকা চাওয়ালা ডেকে চা কিনে খাওয়াল মিনুকে, চানাচুর আর বিস্কুট কিনে দিল। প্রশ্ন করল মিনু—"আচ্ছা দিদি মানুষ কতদিন না খেলে তাড়াতাড়ি মরতে পারে? প্রশ্নটা অদ্ভুত কিন্তু তার মুখ থেকে এল সেই অষ্টাদশী মিনুর পক্ষে এ প্রশ্নের মত স্বাভাবিক আর কিছু নেই। যে মিনু বাঁচবার আশা রাখে না মৃত্যুকে যে বন্ধুরূপে পেতে চায় মৃত্যুই আসবে দুর্ভিক্ষের রূপে। কাণায় কাণায় পূর্ণ করে দেবে তার সকল আকাঙ্ক্ষার, ঘটাবে তার অবহেলিত জীবনের সমাপ্তি।

মণিকা সস্নেহে ওর মাথা ভরা রুক্ষ চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই ভগবান কখনো অবিচার করেন না তোমারও সুদিন আসবে।"

মিনু একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল বলল—"সুদিন তো পায়ে ঠেলে চলে এলাম দিদি এখন বাবা ভাই উঠতে

বসতে বলেন, তোমার তাদের জন্য যা করেছিলাম তা তো তুমি নিতে পারলে না এখন সারা জীবন কষ্ট করো। পয়সা খরচা করে বিয়ে আমি তোমার দিতে পারব না। তাছাড়া বিয়ে দিলে সংসারের কাজ করবে কে? অসহ্য বাথায় ঘরে আসে মিনুর গলাটা।

আবার বই আরম্ভ হয়। অনুরাগের অপূর্ব দীপ্তি ফুটে ওঠে সাগরিকার প্রতিটি ভঙ্গীতে। প্রিয় মিলনের আশা নিরাশায় জমাট হয়ে ওঠে বইটা। শেষ পর্যন্ত অরুণ আর সাগরিকার বিড়ম্বিত ভালবাসারই জয় হয়। আলোগুলো জ্বলে উঠতেই মণিকা এগিয়ে গিয়ে মিনুর হাত ধরে তাতে গুঁজে দিল দুটো টাকা, সঙ্গে তার বেশী ছিল না। মিনু সঙ্কুচিত হল। মণিকা আদর করে তার গলাটা টিপে দিয়ে বলল, বড় বোনের কাছে হাত পেতে চেয়ে নিলেও লজ্জার কিছু নেই আর এতো আমি তোমায় দিচ্ছি মিনু।

মিনু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আর একবার চেয়েই এক বিধবা মহিলার সঙ্গে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

বীণার আর তর সই ছিল না জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটার কে কে আছে?

নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল মণিকা. বাবা নেই মা আর দুই ছোট ভাইবোন।

—তা থাক বাপ তো আছে। হাঁফ ছাড়ল বীণা। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল মণিকা, "হাঁ তা আছে এবং তিনি শিক্ষিত ও খুব ভাল চাকরি করেন।"

—তবে আবার মেয়েটা অত কথা বলল যে?

—কিছুই তো বলেনি বীণা, যেটুকু বলেছে তা আমি জানি বলে।

অসহিষ্ণু হয়ে বলল বীণা, আরে বাবা জানতো বুঝলাম তা বলছ কৈ? সেই থেকে তো বারে বারে সেই কথাই জানতে চাইছি।

দুজনে এগিয়ে এসে সিনেমার গেট পার হয়ে হাত বিশ্রাম ফেলে বসল। রিক্সাওয়ালা চেনা তাই বাড়ীর রাস্তা আর বলতে হল না।

আবার তাড়া দিল বীণা, কিগো বলো?

—আরম্ভটা ঠিক করতে পারছি না বীণা, বাপ হয়ে মেয়ের সর্বনাশ করতে যাওয়ার নজীর এই প্রথমই দেখলাম আমি। দাদা কাকা পড়শী এরা তো করেই থাকে কিন্তু নিজের সন্তানকে নিজে কর্দমাক্ত পথে ঠেলে দিতে আমি দেখিনি কোনদিন।

—তোমার গৌরচন্দ্রিকাটা ছোট করে ঘটনাটাই বলো না বাপু।

—হাঁ বলছি। এক মিনিট থেমে আরম্ভ করল মণিকা, চলতে রিক্সার টুংটাং শব্দের সঙ্গে, তখনো খানিকটা পথ বাকি।

লক্ষ্ণৌএর দুটো ষ্টেশন আগে তখন উনি পোরেও দিলেন। বেশী দিন আগের কথা নয়—এখানে আসবার মাস তিনেক আগে আর কি। আমরাও সেই রাতে আসছি, ষ্টেশনে সেকিণ্ড ওয়েটিং রুমের এক কোণায় একটি লম্বা বেঞ্চের ইজিচেয়ারে দেখতে পেলাম একটা মেয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পরণে তার সালওয়ার ও পাঞ্জাবী একটা কালো জর্জেটের উপর সোনালি চুমকি বসান ওড়নায় সর্বাঙ্গে ঢাকা মুখটা দুই হাঁটুর ভেতর গোঁজা।

উনি বললেন, হাঁ করে দেখছ কি যাওনা এগিয়ে, কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো কি ব্যাপার।

আমি ইতস্তত: করে বল্লাম, হিন্দি তো মোটেই আসে না কি বলবো?

—আরে জিজ্ঞাসা করো বাংলাতে, অধৈর্য্য হয়ে আমার কর্ত্তাটি বলে উঠলেন।

অগত্যা আমি মেয়েটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আপকো কেয়া হুয়া? কুছ তকলিফ সে জাকর, পড়েছেন নিশ্চয়?

মেয়েটী মুখ তুলে তাকাল সম্ভবতঃ বাংলা শুনেই তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমাকে রক্ষা করুন দিদি আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।"

আমি তখন সালওয়ার কামিজের ভেতর থেকে বিশুদ্ধ বাংলা শুনে হকচকিয়ে গেলাম, কিন্তু তৎক্ষণে মিঃ এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। সেই প্রশ্ন করল, তুমি বাঙ্গালী তো? মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর দিল, হাঁ।

—তাহলে এখানে একাবে বসে আছ কেন, তোমার সঙ্গে কোন লোক নেই—মানে অভিভাবক ?

কক্ষণভাবে মেয়েটি উত্তর দিল, হাঁ ছিলেন তো, আমার সঙ্গে আমার বাবাই ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ছুটো ষ্টেশন আগে কোথায় চলে গেলেন আমাকে একটা ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে বসিয়ে রেখে তা জানি না।

আমার স্বামী তখন পুলিশি আর্টে জেরা আরম্ভ করলেন। বললেন, তোমরা যখন ফার্ষ্ট ক্লাসে আসছিলে তখন তোমাদের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব ভাল ?

মেয়েটী উত্তর দিল, ভাল না ছাই। পিসিমা টাকা পাঠিয়েছিলেন কিনা তাই।

—কোথায় যাচ্ছিলে ?

—প্রথমে আমার পিসিমার বাড়ী এলাহাবাদে বেড়াতে নিয়ে এসেছিলেন, ওখানে ছিলাম মাত্র তিন চার দিন। তারপর বললেন, চলো তোমাকে আগ্রা দেখ দেখিয়ে আনবো, বলে সেখান থেকে নিয়ে বার হলেন। সারা পথ মোটে ভাল করে কথাই বললেন না। সেদে লক্ষ্ণৌএ যখন গাড়ী থামল তখন জলের গ্লাসটা নিয়ে গেলেন। আমি বললাম কিছু খাবারও কিনে আনুন। তাতে বাবাও বললেন, হাঁ এখনো অনেক পথ বাকি আমি খাবার কিনে আনাই তুমি বসে থাকো। বেশ অনেক খাবার দাবার কিনে আনলেন। আমাকে কাঁচের চুড়িও কিনে দিলেন। আমি তো অবাক।

—কেনো অবাক হলে কেন ? সঙ্গে সঙ্গে উনি প্রশ্ন করলেন, তোমার বাবা বুঝি তোমাকে ভালবাসেন না ?

—একটুও না। অর্দ্ধেক দিন খেতেই পেতাম না বাড়ীতে, তার উপর মা তো মারতেনই আবার বাবা বাড়ী ফিরলে কি যে সব বলতো বাবাও ঘরে মারতেন। দেখছেন না এই কাটার দাগ ? কপালের পাশে চোখের ঠিক ওপরে তখনো মেয়েটির কাটার ক্ষত শুকোয় নি।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা হল কি করে ?

—আমি যে দিদি যার আগে ভাইয়ের পাতে এঠো কাঁটাগুলো খেয়ে ফেলেছিলাম, তাই দুদিন আমার খাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন মা, আর ঘা মেরেছিলেন।

—মারবার পরেই তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বার হলেন বুঝি ?

—না, এই মারের প্রায় সাতদিন পর।

—তখন তোমার কি মনে হয়েছিল ?

—খুব আনন্দ হয়েছিল পিসিমার কাছে থাকবো বলে, কারণ ঠাকুমাই তো আমাকে মানুষ করেছিলেন। ঠাকুমা আজ ক'বছর মারা যেতেই আমার এত কষ্ট।

—হুঁ, তারপর কি হল বল ?

—তারপর খাবার দাবার কিনে দিয়ে বাবা আর গাড়ীতে উঠলেন না। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে জানলায় হাত রেখে কথা কইতে লাগলেন। আমি বারে বারে বলায়, আপনি উঠে পড়ুন, যদি গাড়ী ছেড়ে দেয় ? বাবা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন কচি খুকি তো আর নও যে তোমার অত ভয়, চুপ করে বসে থাকো। তখনই কিন্তু আমার ভয় করছিল—ইতিমধ্যে গাড়ীটা ছেড়ে দিল। আমি চীৎকার করে উঠলাম, উঠে পড়ুন উঠে পড়ুন, কিন্তু দরজার হাতলই ঘোরাতে পারলাম না। বাবা পেছিয়ে রইলেন। আমি তখন মনে করলাম বাবা পেছনের গাড়ীতে উঠবেন নিশ্চয়, কারণ আগেই উনি বলেছিলেন পেছনে অফিসের বন্ধুরা আছে আর গাড়ী ছাড়তেই বাবা হাতের ইসারায় পেছনদিকটা দেখিয়ে দিলেন। তবুও আমি কেঁদে ফেললাম। ইতিমধ্যে প্ল্যাট-ফর্ম প্রায় পার হয়ে গাড়ী এগিয়ে চলেছে, এমন সময় দরজার হাতল ঘুরিয়ে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উঠল। তার হাতে একটা সুটকেশ, উঠেই দরজা বন্ধ করে উপরের ছিটকিনিও লাগিয়ে দিল, তখন আমি তাকে বললাম, সব বন্ধ করছ কেন ? আমার বাবা এক্ষুনি আসবেন।

লোকটা হাসতে লাগল, তখন আমি খুব জোরে কেঁদে উঠলাম। লোকটা আমাকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল, কাঁদছ কেনো তোমার বাবা আউর আসবে না, তোমাকে আমি আমাদের দেশে নিয়ে যাবো, খুব আচ্ছা আচ্ছা চীজ খিলাবো, পোষাক দেবো তুমি রোয়া মাৎ।

আমার তখন ভয়ে কণ্ঠতালু শুকিয়ে এসেছে, তবে তক্ষুনি বুঝলাম লোকটা আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায় এখন কান্না মিথ্যে। তারপর পাঞ্জাবীটা তার সুটকেশ

থেকে এই কাপড় জামাগুলো দিয়ে বলল, তুমি এগুলো পরিবর্তন করে নাও। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে বাথরুমে গিয়ে কাপড় বদল করে এলাম। এসে শান্ত হয়ে বসলাম।

লোকটা আমাকে খেতে বলল, আমি তাড়াতাড়ি পুরী তরকারি মিষ্টান্ন নিজেও খেলাম ওটাকেও খাওয়ালাম। পরে যেখানে গাড়ী থামল একটা ছোট্ট ষ্টেশনে আমি কেবল সাবধানে থেকে নিজেকে মেয়ে পালাতে পারব কিনা, কিন্তু দেখলাম সুবিধা হবে না। এর পর যেই এই ষ্টেশনটা আসল অমনি লোকটা আমাকে বলল "কুছ পাথরকা খেলনা আউর চুড়ি বাগেরা লে লেও যো তোমরা খুশি। লোকটা দরজাটা খুলে দিয়ে তফাতে সরে দাঁড়াল, আমি অনেক জিনিষ পত্র কিনে সিটের উপর জমা করে লোকটিকে পয়সা দিতে বললাম। সে প্রত্যেকটার দাম হিসেব করে যেই সুটকেশ খুলছে মন দিয়ে সেই সুযোগে আমি ম্যাচকর্মে নেমে পড়েই ছুট। একেবারে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। লোকটা নামল কিনা দেখিনি পর্যন্ত। ষ্টেশন মাষ্টারকে বলতে তিনি রেলের পুলিশের কাছে আমাকে সঁপে দিলেন। তাদের ভেতর একজন বাঙ্গালী ছিল সেই বলল, কোন ভয় নেই আমরা পাহারায় রইলাম, তুমি এখানে বিশ্রাম করো আমরা তোমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তোমার বাড়ী পৌঁছে দেবো।

—ওদের কাছে কি সব ঘটনা তুমি খুলে বলেছ? আমার স্বামী ওঁর ডায়েরী বুকে নোট করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন।

মেয়েটি বলল, খানিকটা বলেছি, তবে বাবা যে ইচ্ছা করে ছেড়ে গেছেন তা বলিনি।

উনি বললেন, ভালই করেছ, তোমার বুদ্ধি আছে। হাঁ ভাল কথা তোমার নামটা? আর কতদূর পড়াশোনা করেছ বলতো?

মেয়েটি উত্তর দিল, মিনু ব্যানার্জি। আমি ক্লাশ সিক্স পর্য্যন্ত পড়াশোনা করেছি।"

বুড়ো বিজ্ঞাসাগর বয়ক দিয়ে উঠল, তেরা মাইজী আপ-লোক উতার যায়েগী না রাত ভোর গাড়ীমে বৈঠকে গপ্ করায়েগী?

মণিকা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, নেহি বুড্ডা আজি উতার যায়েগী।

—ছিঃ ছিঃ দরজার গোড়ায় আধঘণ্টা বিজ্ঞার বসে গল্প লোকেই বা বলবে কি বীণা?

—লোকের বলার ভারী বয়ে গেল এমন চমৎকার গল্পটা। আমি না হয় আট আনা বকশিস দিচ্ছি বুড়োকে। মণিকা চেঁচিয়ে উঠল "গল্প"? গল্প নয় বীণা খাঁটি সত্যি ঠিক তোমার আমার মতন।

—কিন্তু নিজের বাপ তো?

—হাঁ বাপ এবং সেই বাপটি শিক্ষিত উচ্চপদস্থ চাকুরে, পাড়ায় পাঁচজনের একজন, সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে কিন্তু বিবেকহীন। এরা মানুষ নয়, আকৃতিতে মানুষ হলেও প্রকৃতিতে নৃশংস পশুর চেয়েও হীন। নাম শুনলে তুমি চমকে উঠবে বীণা।

—এতদূরই যখন বললে তখন নামটাতেই বা কিসের?

—সত্যিই শুনতে চাও?

—হাঁ হাঁ আমাদের পাড়ার নাকি?

—না কিছু দূরের। রসরঙ্গ নামের বাজারের।

—কে? কে? ভদ্রলোকটি তুমি?

—ইস্ এখনো ভদ্রলোক? হাঁ ভদ্রলোকই, সোকল্ড ভদ্রলোকটির নাম বঙ্কুবিহারী ব্যানার্জি।

—অ্যাঁ? বঙ্কু বাবু?

সে রাতে আর ঘুম হল না বীণার। নিষ্করুণ মেয়ে পাষের চমৎকার বুদ্ধি যার করেছিলেন বঙ্কুবাবু, হয়ত বা মোটা অঙ্কের লোকটাও ছাড়তে পারেন নি।

বড়দের খেয়াল

শ্রীমতী কুন্তলা রায়

অনেক বড় বড় লোকের ভারি মজার মজার বাতিক ছিল। এ রকম খেয়াল হয়তো আরও কত লোকের ছিল। কিন্তু তারা তেমন নামকরা লোক নয় বলে সে সব বাতিক আমরা খেয়াল করি নি। লোক বড় হয়ে গেলে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতিক আমরা মনে রাখি, সেগুলো তখন গল্প হয়ে ওঠে। সাধারণ লোকের পাগলামী বড় বড় লোকদের বাতিক ব'লে ধরা হয়।

ইংরেজ কবি শেলীর নাম সকলের জানা আছে। তিনি অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে ছিলেন। শেলীর একটি বিচিত্র অভ্যাস ছিল, কোন ভাল কবিতা লিখবেন ব'লে মনে করলে আগে থাকতে একটা শাদা ধবধবে পোশাক পরে নিতেন। তার পর সেটি যতক্ষণ না ময়লা হয়ে যায় ততক্ষণ সেটি পরে কবিতা লিখতেন।

শেলী চিরকালই দুরন্ত, কাব্য প্রতিভায় তিনি যখন সমুজ্জ্বল, তখনও তাঁর এই সব দুষ্টুমি যায় নি। তাঁর বাড়ীতে ডিনারের টেবিলে তিনি পকেটে কতকগুলো রুটির গুলি নিয়ে যেতেন, তারপর খেতে খেতে তিনি সেগুলো অতিথিদের ছুঁড়ে মারতেন।

আমেরিকার বিখ্যাত হাস্যরসিক সাহিত্যিক ছিলেন মার্কটোয়েন। পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক মজার মজার বাতিক ছিল। সারা শীতকাল তিনি পাতলা সামার-সুট পরে ঘুরে বেড়াতেন, আবার গরম কালে একটা মোটা কাপড়ের পোশাক ছিল তাঁর নিত্য সাথী। লোকে হাসুক, তিনি কোন পরোয়া করতেন না। তিনি টেবিলে বসে কাজ করতে পারতেন না, বিছানায় বসে চারিদিকে কাগজপত্র ছিটিয়ে তিনি লিখতেন।

ইংরেজ লেখক থ্যাকারের সঙ্গে আমাদের জাতির একটা আত্মীয়তা আছে। থ্যাকারে আমাদের এই কলকাতাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন লেখা লিখে তা পাঁচজনকে না শুনিয়ে তৃপ্তি পেতেন না। কোন লেখা তাঁর হঠাৎ ভাল লেগে গেলে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বেড়াতেন।

লর্ড কিচেনার ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি। বেড়াল সম্পর্কে তাঁর ভীতি ছিল বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। বেড়ালের ডাক শুনলেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত। একবার সামরিক বিভাগের এক গোপন পরামর্শ সভায় তিনি কূটরাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করছেন, এমন সময়ে শিবিরের বাইরে একটা বেড়াল ডেকে ডেকে উঠতে লাগল। লর্ড কিচেনার নিজে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন, অন্য কেউ তো তাঁর বেড়াল-ভীতির খবর জানত না! শেষে কিচেনার মুখ ফুটে তাঁর ব্যক্তিগত সহকর্মীকে ডেকে বললেন—"ওহে ঐ বেড়ালটার ডাক বন্ধ করো না হলে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব।"

বেড়ালটিকে তাড়াবার অল্পক্ষণ পরেই কিচেনার আবার পূর্বের মতো সুস্থ হয়ে উঠলেন।

রাশিয়ার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ কাউন্সিল বিসমার্ক এমনিতে বেশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ তাঁর এমন একটা বাতিক চাপত যে, তখন রীতিমত ছেলে মানুষী শুরু করতেন। বাল্য জীবনের কোন সঙ্গীসাথী তাঁর বৈঠকখানায় দেখা করতে এলে তিনি চেয়ার নিয়ে এমন ছেলে মানুষী করতেন যে বলার নয়! বারবার চেয়ার বদলাতেন, এটা থেকে ওটায় লাফালাফি করতেন।

টমাস আলভা এডিসন এ যুগের বিশ্বকর্মা নামে খ্যাত। তিনি পরিণত জীবনে কোন দিন বাড়ীর বাইরে রন্ধন করা খাবার খেতেন না, বাইরে কোনদিন কোথাও খেতে হলে বাড়ী থেকে খাবার বয়ে নিয়ে যেতেন।

(২)

বিদেশী সাহিত্যিকদের লিখন ক্ষমতার ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয় এক একজন প্রখ্যাত বিদেশী সাহিত্যিক বিরূপ

দ্রুত গতিতে লিখতেন ভাবতেই আশ্চর্য্য লাগে। তাঁরা প্রত্যেকেই এই দ্রুত লেখার জন্যই এতগুলি করে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। লোকে ব'লে যে অধিক লিখলে না-কি লেখার গুণপরিমা হ্রাস পায়! কিন্তু আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ কত বেশী এবং কত ভাল লিখেছেন বিবেচনা করলে ঐ ধারণা যে অমূলক তা জানা যায়।

এইচ জি ওয়েলস যখন খ্যাতির শিখরে সবেমাত্র আরোহণ করতে শুরু করেছেন, তখন দৈনিক সাত হাজার শব্দ লিখতেন। পরে তিনি নিজেই ঠিক করলেন দৈনিক এক হাজার শব্দের বেশী লিখলে লেখার মান বজায় রাখা যায় না।

এইচ জি ওয়েলসের মতো দৈনিক অত বেশী আর এক জন মাত্র মহিলা সাহিত্যিক লিখেছেন। জন ট্রুট উইন্টারে দৈনিক তিন হাজার শব্দ লিখতেন সাধারণত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ফরমাইস্ মতো সাত আট হাজার শব্দ ও লিখে শেষ করেছেন।

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল তাঁর অমর চরিত্র শার্লক হোম্‌সের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত হয়েছিলেন। শার্লক হোমসের ডিটেকটিভ গল্প, ছাড়া তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্স গুলিও সুপ্রসিদ্ধ। শার্লক হোমসকে তিনি এমন জীবন্ত চরিত্র করে গড়ে তুলেছিলেন যে, আজও বিশ্বের সর্বত্র তাঁর চরিত্র কথা শুনবার জন্য লোকে আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকে। সম্প্রতি কোনান ডয়েলের পুত্র এড্রিয়ান কোনান ডয়েল এবং জন ডিকসন কার শার্লক হোমস চরিত্রটিকে পুনর্জীবিত ক'রে আবার তাঁর এবং ভাঃ ওয়াটসনের বিচিত্র গল্প বলতে শুরু করেছেন।

কোনান ডয়েল দৈনিক দুই হাজার শব্দ লিখতেন, একদিন তিনি এক চেয়ারে বসে এক সঙ্গে ১২ হাজার শব্দের একটি উপন্যাস লিখে শেষ করেন।

ডবলিউ ডবলিউ জেকবের অনেক গল্প প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। তিনি কিন্তু দৈনিক ৮০০ শব্দ লিখেই কলম বন্ধ করতেন।

আবার অনেক লেখক এক বারেই কলম ধরতে পারতেন না। অনেক বড় বড় সাহিত্যিক স্বহস্তে না লিখে মুখে বলে যেতেন এবং অপর কেউ তা লিখে নিতেন।

গাই মুপাসাঁ এই ভাবে অপরকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। তিনি বলে যেতেন আর কপিটাই লিখে যেত তাঁর শেষ উপন্যাসখানি এই ভাবে ফিনোগ্রাফোনে রেকর্ড ক'রে নেওয়া হয়েছিল। কোন কোন দিন তিনি ১০ থেকে ১২ হাজার শব্দ লেখাতেন।

আদর্শ

শ্রীরমা দেবী

বন্ধু তুষারকণার বাড়ী থেকে এই মাত্র ফিরে এসেছে মালতী। অবাক হয়েই ফিরে এসেছে সে। আজ প্রায় চার বছর ধরেই তাদের বন্ধুত্ব, কিন্তু আজ আর তার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না মালতী। তুষারকণার সঙ্গে যখন ওর প্রথম আলাপ হোলো তখন থেকেই তুষারের স্বভাবের রীতি নীতিতে ও মুগ্ধ ছিলো। মালতীরা যখন প্রথম এই ফ্ল্যাটে উঠে এলো তখন ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারতো না মালতী। ছিপছিপে সুন্দর সুঠাম দেহখানি ধপধপে রং আর কোমর অবধি কোঁচকানো থাকে থাকে চুল। মনে হোতো বিধাতা যেন নিজে হাতে তাকে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন কোনো রসন তুষণেরই আর দরকার নেই। রসন তুষণ বিশেষ কিছুই তার অঙ্গে উঠতোও না তার কারণ সে ছিলো বিধবা কোলে তার ৭ বছরের ছেলে ববু!

বিধবা হোলেও কিন্তু তুষারকণার হাসি খুসীর অভাব ছিলো না। অবশ্য সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা সে আর তাই

সে সংসারের চাকায় ঘাড় না পেতে যাতলো লেখা পড়া নিয়ে। ওর সঙ্গে সেদিন মালতীর ভাব হলো ঐ রঘুর মারফৎ। রঘুর সাথে আলাপ অনেক আগেই হোয়েছিলো। সেদিন দুপুর বেলায় রঘু কখন এসে এ বাড়ীর কড়া নাড়ছে টুকটুক কোরে ও বাড়ীর কেউই তা জানতে পারেনি। রঘুর মা কলেজ থেকে ফিরে রঘুর খোঁজ কোরতে গিয়ে দেখে কেউই জানে না তার খোঁজ। পাগলের মত খুঁজতে থাকে মা তুষারকণা পাড়ার বাড়ী বাড়ী কেউ কি জানে ওর একমাত্র অবলম্বন, ওর একমাত্র শান্তি ওর স্বর্গগত স্বামীর একমাত্র সন্তান রঘুর কোনো খবর? রঘুকে কোলে নিয়ে এই ভাবেই হয় ওদের দুজনের বন্ধুত্ব—রঘুই আদরে বেঁধে দেয় সখীত্বের বন্ধন "রাখি এ মাহিমা"। সেই থেকেই চলে দুজনের আসা যাওয়া। মালতী গরীবের মেয়ে বিয়ে হোয়েছে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের সঙ্গে। স্বামী বিকাশ কিন্তু ভারি স্বার্থপর মানুষ। সংসারের জন্য বিয়ে কোরেছেন তাই মা বাবা আত্মীয় পরিজনের সেবা শুশ্রূষা ও কর্ত্তব্যের সব ভারই মালতীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি শুধু এ হোটেলে খান এবং ঘুমান। মালতীর সঙ্গে দুদণ্ড বসে গল্প করার ও কোনো দরকার মনে করেন না। মালতীর ডাক শুনে শুধু প্রয়োজনে এটা দাও, ওটা দাও, ভালো করে আজ রান্না কর ইত্যাদি। ভদ্রলোকের মেজাজও ভারী গরম কারণে অকারণে খিঁচিয়ে খানিকটা বাক্যসুধা বর্ষণও মালতীর প্রায় রোজই কপালে জোটে। সংসারে থেকেও তাই নির্লিপ্ত হোয়ে গেছে মালতী। বিবাহ বাড়ীর উৎসব আনন্দ দেখে তাই সে হাসে দুঃখের হাসি। মেয়েরা এক সংসার ছেড়ে উৎপাটিতা হোয়ে আসে আর এক সংসারে। সে সংসার তাকে যতই আপনার মত মনে করুক তবু যে বিয়ে কোরে এনেছে তার এতটুকু ত্রুটি পেলে সব দুঃখই মাথা পেতে নেওয়া যায়। মালতীর অদৃষ্ট দেবী কিন্তু বড়ই নির্মম তাই মালতী সংসারে থেকেও সংসার বিমুখ। সঙ্গী সাথী সকলের কাছ হোতেই তাই সে মুখ নীচু কোরে ফিরে আসে তাদের স্বামী-সোহাগের এর গল্প শুনে। এ ধরণের গল্পতে যোগ দেবার মত কোনো সম্বলই তো তার নেই তাই সে অপরাধীর মত উঠে আসে সেখান থেকে। ভালো লাগেনা তার একটুও। ভালো লাগে মালতীর তুষারকণার ঘর। ও ধরণের কোনো আলোচনাই হয় না এখানে। পরিষ্কার ঝকঝকে একখানি ছোট ঘর। আসবাবের ভিতর একটি খাট—তাতে সব সময় সুবিন্যস্ত বিছানা। ছোট একটি দেওয়াল আলনা। আর আছে ঘরের ওধারে প্রকাণ্ড একখানি বাঁধানো ফটো তার নীচে ছোট শ্বেত পাথরের ব্রাকেট এবং তাতে একটি ধূপদানে ধূপ। এ ছবি রঘুর "বাণীর।" গল্প কোরতে কোরতে হয়তো সন্ধ্যে হয়ে এলো। উঠে দাঁড়ায় তুষার সেই ছবির সামনে। খানিক চুপ কোরে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থেকে আবার এসে গল্পের খেই তুলে নেয়। আবার গল্প চলে।

এ কতবার দেখেছে সে, দেখেছে তার এই আড়ম্বর হীন জীবন যাত্রা তাই শ্রদ্ধায় নত হোয়ে গেছে তার মন তুষারকণার প্রতি। খাওয়ার ব্যাপারেও দেখেছে তার কৃচ্ছসাধন। দুদিন তিনদিন ভাই বোনেদের জন্যে নানারকম মাছ মাংস রেঁধে আপন হাতে পরিবেশন কোরে খাইয়ে যখন আবার স্নান কোরে দুটি হবিষ্যি ফুটিয়ে হাসিমুখে খেতে বসেছে তখন মালতী আর চোখের জল সামলে রাখতে পারেনি। নিজের মন্দভাগ্য নিয়ে হাসিমুখে চলবার শক্তি ও ধৈর্য্য ও পেয়েছে এই ধৈর্য্যশীলা তুষারকণার কাছ থেকে। প্রায় এক বয়সী হোলেও মনে মনে তাই ও শ্রদ্ধা করে তাকে। নিজেদের মাঝে ব্যক্তিগত কোনো গল্প না কোরলেও ও যেদিনই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আসে তুষারকণার কাছে সেদিনই তুষারের সুন্দর সুন্দর আলোচনায় স্নিগ্ধ সান্ত্বনার বাণী তার মনকে ছুঁয়ে যায় তাই ভারি ভালো লাগে তার। মুগ্ধ হোয়ে শোনে গার্গী ও মাধবীর গল্প। শোনে উত্তথ্য চান্দ্রায়ণীর গল্প। শোনে রুরু প্রমদ্বরার গল্প। শোনে মন্দপাল ও অরিতার গল্প ও। মালতীর চোখের সামনে মূর্ত্ত হোয়ে ওঠে খাণ্ডব কাননে মন্দপাল ও অরিতার জীবনস্নুষ্ণ পুষ্পিত হোয়ে উঠেছে। সন্তানবতী অরিতা পুষ্পিতা। ব্রততীর মত ধন্য হোয়ে উঠেছে। মালতী শোনে মন্দপাল বোলছেন, "তুমি আমার স্বপ্ন সফল কোরেছ অরিতা। তুমি

এই কুটীরের বাতাসে সঞ্চারিত কোরেছ স্নেহ তুমি আমার বক্ষের কাছে নিয়ে এসেছ শিশুর মধুর স্পর্শ।" তখন সন্তানহীনা মালতী বুঝি বিকাশের ব্যবহারের অর্থ খুঁজে পায় মনের মাঝে জ্বলে ওঠে আশার ক্ষীণ আলোক। কিন্তু যখন তুষার পড়ে চলে—"একদিন মন্দপাল বলেন—আমার আশঙ্কা সত্য হোলো সত্য হোলো অরিতা" তখন অরিতার সাথে মালতীও যেনআর্ত্ত ভাবে তাকায় কিসের আশঙ্কা? মন্দপাল বলেন "আমি নিঃসঙ্গ একাকী। তোমার বাৎসল্য বিহ্বল কুটীরে আমি একটি ছায়াযাই।" অরিতা আর্ত্তনাদ কোরে ওঠে স্বামী এযে তোমারই প্রাণের পুষ্পিত আনন্দের চারিটী মূর্ত্তি কিন্তু মুখে তার ভাষা যোগায় না। স্তব্ধ হোয়ে শোনে মালতী তুষারের পড়া। চলে যান মন্দপাল ভ্রমর-জড়িত পুষ্পাগ তরুর ছায়ায় পুষ্পপ্রেক্ষার একটি আসন আজও খালি পড়ে আছে কিনা দেখতে। কিন্তু কণ্ঠের আহ্বান ধ্বনিত হয় আমি এসেছি লপিতা। মালতী ভাবে এত সুন্দর সুন্দর বই রয়েছে অথচ ও তার কোনো খবরই জানে না। ভাবি আশ্চর্য্য লাগে ওর এই এত দিনের অদ্ভুত জীবন যাত্রার কথা ভেবে। পাতার পর পাতা উল্টে পড়ে যায় তুষারও তাই নিঃশব্দে শোনে ঋষি মন্দপালের কথা। মন্দপাল বলেন লপিতাকে আমার সকল কঠোরতা ক্ষমা কোরে আজ তোমার পাশে আমাকে গ্রহণ কর লপিতা, আমি বুঝেছি তুমিই প্রেমিকা আর সত্য তোমার প্রেম। সত্য তোমার সে কল্পনা। দোলে নিকুঞ্জের নিভৃতে পুষ্পপ্রেক্ষায় দুটী প্রেম বিধুর জীবনের কান্তিহীন আকাঙ্ক্ষা। দোলে চিরক্ষণের প্রেমিক ও চিরক্ষণের প্রেমিকা। ওদের জীবন সংসারের কণীর চায়না। ক্রোড় ও বক্ষ চায়না কোনো শিশু স্নেহের স্পর্শ। মন্দপাল শুধু লপিতার জন্য লপিতা শুধু মন্দপালের জন্য। একটু থেমে আবার পড়ে চলে তুষার—কালচক্রে মাস ঋতু ও বৎসর আবর্ত্তিত হয়। আসে নিদাঘ আসে প্রাবৃষা—আসে শিশির ও বসন্ত। পুষ্পপ্রেক্ষার আসনে বসে দৃষ্টি পড়ে বহু দূরে যাওয়া প্রভুর আগমনের দিকে কিন্তু মড়ে না মন্দপালের বিশ্বাসের কুহেলিকায়য় কোনো কুটীরের কথা। সুখী হোয়েছে লপিতা। কিছুদিন যায় একদিন অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ করে ওঠেন মন্দপাল দেখেন অগ্নি শিখার বটিকা ছুটে চলেছে যাওয়া কাননের দিকে। নিকুঞ্জের নিভৃত প্রান্তর পথ অতিক্রম কোরে ভগবান হুতাশনের নিকটে এসে দাঁড়ান ঋষি মন্দপাল ও লপিতা। প্রার্থনা করেন মন্দপাল—খাণ্ডব দাহনাভিলাষী ভগবান হে পিঙ্গলাক্ষ লোহিত শ্মশ্রু হুতাশন মন্দপালের কুটীর যেন আপনার জ্বালায় ভস্মীভূত না হয়। হুতাশন বলেন কেন? কে আছে সেখানে? বলেন মন্দপাল ভার্য্যা অরিতা ও চারিটি শিশুপুত্র। হুতাশন আশ্বাস দান করেন চিন্তা কোরো না ঋষি তোমার কুটীর স্পর্শ কোরবে না অগ্নির কোনো শিখা জ্বালা। আবার সেই পুষ্পপ্রেক্ষা। কিন্তু সেই প্রেক্ষায় আন্দোলিত হয় না মধুর কাকলীর স্বপ্ন। দুশ্চিন্তা হোতে মুক্ত হোতে পারেন না জ্বলে ওঠে লপিতা বলে কিসের দুশ্চিন্তা?

মন্দপাল বলেন—জানতে ইচ্ছা হয় আমার কুটীরের প্রাণ সত্যই রক্ষা পেল কিনা? লপিতা আবার জ্বলে উঠে বলে সত্য করে বলদেখি সত্যদ্রষ্ট ঋষি কার মুখ চেয়ার জন্য। লপিতা আবার বলে আর কারও জন্য নয়? উত্তর আসে "না।" লপিতা বলে তবে যাও। খাণ্ডব কাননের নিভৃত কুটীরের অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন মন্দপাল। অগ্নির কোনো স্পর্শ লাগেনি সত্যই। অরিতা এসে সম্মুখে দাঁড়ায়। কোনো কথা না বলে শুধু প্রণাম করে অরিতা। বিস্মিতা বিচলিতা বা বিব্রতা হয় না অরিতা। এতকাল যেন মন্দপালেরই প্রাণের চারিটি শিশুকে স্নেহাঞ্চল ছায়া দান কোরে রক্ষয়িত্রীর মত এই কুটীরের নিভৃতে দিন যাপন কোরেছে অরিতা। তৃপ্ত হোক শান্ত হোক ঋষি তাঁর সন্তানদের কোনো ক্ষতি হয়নি দেখে। একে একে সন্তানরাও এসে দাঁড়ায় পিতার কাছে। ঘরের আবহাওয়া যেন জমাট হোয়ে ওঠে হঠাৎ ছুটে আসে বধূ এসেই মাকে জড়িয়ে ধরে। মা তুষারকণা তার চিবুকে হাত দিয়ে একটু আদর করে। আবার দৌড়ে চলে যায় বধূ। সেই দিকে চেয়ে তুষার অতি সন্তর্পণে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আবার পড়ে সে, সন্তানদের আদর করে অকস্মাৎ যেন কি এক বিভ্রমের

বসে বিচলিত দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে নতমুখি অরিতার মুখের দিকে তৃষ্ণার্ত্তের মত তাকিয়ে থাকেন। তাকেন অরিতা! জীবনের বেদনায় কুণ্ঠিত ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকে অরিতা উত্তর দেয়না। মন্মথনাথ বলেন আমার এ আহ্বানের অর্থ বুঝবে না? অরিতা বলে, বুঝি কিন্তু বিশ্বাস কোরতে পারিনা স্বামী, আমি চিরাদৃত মধুর পুষ্পপ্রেক্ষা নই তবি, আমি নিতান্তই এক বাংলার বিধুর কুটীর, তাই বিশ্বাস হয় না। মন্মথনাথ বলেন কেন? উত্তর আসে আপনার চক্ষুকে প্রশ্ন করুন তবি। তবি মন্মথনাথ বলেন, কোরেছি অরিতা কোরেছি আমার দুই চক্ষু আজ দেখতে পেয়েছে তুমি সাবিত্রী তাই তুমি সুন্দর। সন্ধ্যা হোয়ে আসে বই বন্ধ কোরে উঠে দাঁড়ায় তুষারকণা। রঘুর বাপীর ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সে স্থির অচঞ্চল ধৈর্য্যে নীরবে নিস্তব্ধে। মালতীর মনে হয় এই তো অরিতা চুপ কোরে দাঁড়িয়ে স্বামী মন্মথনাথের সামনে। এখনই আহ্বান শোনা যাবে "অরিতা!" আস্তে আস্তে মালতীও হাত দুটী জোড় কোরে প্রণাম করে সামনের এই অরিতার উদ্দেশ্যে। তারপর সজল চোখে বাড়ী ফিরে আসে। কিন্তু কে জানতো এই অরিতার বুকের মাঝেই ঘুমিয়ে আছে লজিতা!! কে জানতো এই ধীর স্থির আত্মসংযমী রঘুর মা তুষারকণার জীবনেও এসে লাগবে কালের প্রবাহ?

মাস তিনেকের জন্য কলকাতার বাইরে গিয়েছিল মালতী মায়ের অসুখে। কলকাতা ফিরে কদিন খোলমাসে খোঁজ নিতে পারেনি মালতী রঘুর মার ও রঘুর। কিছুটা অভিমানও ছিলো বৈকি! বৈ তুষারকণাও তো কোনো খবর নিতে পারেনি তার। কিন্তু থাকতে পারেনি মালতী তাই অভিমান ভুলেই দুপুর বেলা ছুটে যায় ওদের বাড়ী। থমকে থেমে যায় তার পা। দেখে রঘুর অগোছালো বেশ, খেলছে ধুলো কাদা মেখে। "মাছিমা"কে দেখে দৌড়ে জড়িয়ে ধরে। মালতী জিজ্ঞেস্ করে, মা কোথায়? রঘু বলে, মা নেই। মালতী আবার জিজ্ঞেস্ করে, কোথায় গেছে? পরম গম্ভীর ভাবে রঘু জবাব দেয়, বিয়ে কোরতে। রঘুকে নিয়ে দোতলায় ওঠে মালতী। দেখা হয় রঘুর বড় মামীর সাথে সে ওকে নিয়ে তুষারের ঘরেই বসায় এবং সংক্ষেপে যা বলে তার অর্থ এই যে তুষার একদিন জানায় তার বাস্তব জীবনে এক জনের অন্তরের প্রেম ও অন্যকে তুচ্ছ করার স্পর্দ্ধা তার নেই। নেই তার প্রেমকে অপমান কোরে ফিরিয়ে দেবার স্পৃহা তাই···তাই সে রঘুর জন্য একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে তাকে তার মামাদের হাতে তুলে দিয়ে বরণ করেছে সেই প্রেমিকাকে। যাবার আগে নাকি রঘুর বাপীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে গেছে। কিন্তু ক্ষমা কি কোরেছেন তিনি? তাঁর প্রাণের রঘুকে যাঁর হাতে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে চোখ বুজেছিলেন সেই স্নেহাকুল ছায়া ঘনে বিমুখ প্রিয়াকে কি তিনি ক্ষমা কোরতে পারছেন? ফিরে এসেছে মালতী। বিস্মিতা বিচলিতা দুঃখিতা মালতী ফিরে এসেছে তাই। তার আদর্শ আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হোয়ে গেছে। আনমনা মালতী তাই আজ উদাস চোখে চেয়ে থাকে দূর নীলাকাশে কল্পনায় ভেসে ওঠে নিভৃত নিকুঞ্জে পুষ্পপ্রেক্ষায় দোলে প্রেমবিধুর জীবনের আকাঙ্ক্ষা। দোলে প্রেমিক ও প্রেমিকা। দোলে প্রেমিকা তুষার ও তার প্রেমিক।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্রী :

শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৮ সালের এম. এ. পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। মজঃফরপুর ওএল. এম. এস্ কলেজ হইতে বি-এ, পরীক্ষাতেও অনার্সসহ দর্শনে প্রথম হইয়াছিলেন। ইনি ভাগলপুর প্যালেস হোটেলের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরীর কন্যা।

মীরা দাস (১৮ বৎসরের) আই এ পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এখনও বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা বিহারে শিক্ষালয়ের সম্মান রাখিতেছে।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বঙ্গরমণী চ্যাম্পিয়ন :

অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে নয়া দিল্লীতে একবিংশ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে মহিলা বিভাগে বাঙ্গলা মোট ৪৪ পয়েন্ট পাইয়া দলগত চ্যাম্পিয়ান শিপের গৌরবে ভূষিত হইয়াছে।

১০০ মিটার পিঠ সাঁতারে এ সন্ধ্যা চন্দ্র ১ মিঃ ২৯'৪ সেকেণ্ডে সম্পন্ন করিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ্ লাভ করিয়াছেন। কুমারী কল্যাণী বসু ২০০ মিটার সন্তরনে প্রথম হইয়াছেন। কয়েক বৎসর ভলি নাজির (বোম্বাইয়ের) জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হইতেছিলেন—সন্ধ্যা এই দক্ষ সাঁতারুকে পরাজিত করিয়া বাংলার গৌরব রাখিয়াছে।

অবাঙ্গালী মেয়েদের বাংলা শিক্ষায় কৃতিত্ব :

সম্প্রতি বালিগঞ্জ রাজকীয় বিদ্যালয়ের এ্যাসেম্ব্লী হলে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির ২১শ কনভোকেশন (সমাবর্তন) হইয়া গেল। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতি, বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী প্রধান অতিথি ছিলেন। জাপানের কনসল জেনারেলের পত্নী মিসেস্ তাকুইচী ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও পদক পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিবরণে বলেন বর্ত্তমান বর্ষে বোম্বাই, ত্রিবান্দ্রম, এরনাকুলাম, নাগপুর, নিউদিল্লী, কাশিয়াং, দার্জিলিং, কামারহাটী, রামকৃষ্ণপুর ও কলিকাতা হইতে আদ্য, মধ্য, অন্ত পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে মেয়েরাই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

মধ্য পরীক্ষায়—শ্রীমতী পল্লবী বেরেটা প্রথম হইয়া "নগেন্দ্র রক্ষিত" স্বর্ণ পদক পাইয়াছেন। এই পরীক্ষার পরীক্ষক ডাঃ শ্রীকুমার বাগচী। শ্রীমতী পল্লবী বাংলা গান গাহিয়া "পার্ব্বতী শঙ্কর" স্বর্ণ খচিত পদক পাইয়াছেন। তিনি ১৩৬৪ সালের আদ্য পরীক্ষায় ২য় স্থানের জন্য পুরস্কার পাইলেন। ইনি গুজরাতি মহিলা। মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক ছিল রবীন্দ্র নাথের "কথা ও কাহিনী" এবং "গল্প গুচ্ছ", বঙ্কিম চন্দ্রের "রাধারাণী" ও শরৎচন্দ্রের "বিন্দুর ছেলে"। এই পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন শ্রীমতী শান্ত প্যাটেল।

আদ্য পরীক্ষায় : শ্রীমতী এম্ সরস্বতী (তামিল) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "রবীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ" স্বর্ণমণ্ডিত পদক পান। পুষ্প ঘরোলিয়া (গুজরাতি) তৃতীয়, ঐম্-এস্ কাবেরী (তামিল) ৪র্থ, বৎসলা বেনিগেল (মারাঠী) ৫ম স্থান অধিকার করিয়া পাশ করিয়াছেন। শ্রীমতী বলমায়া বেদিং কাশিয়ং হইতে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া "পদক" পাইয়াছেন।

বাংলা আবৃত্তির জন্য কুমারী ভুবনেশ্বরী "রামানন্দ চ্যাটার্জি পদক" (দিল্লী বাসী—তামিল ব্লক) এবং শ্রীমতী জ্যোতি বেলাড়িয়া (অমৃতসর গোস্বামী পদক) পাইয়াছেন। কুমারী কে. বি. সীতা (তামিল) ২য় পুরস্কার পাইয়াছেন।

বাংলা সঙ্গীতের জন্য মিস্ যোগাবল (তামিল) "কুমার সরবিন্দু নারায়ণ" পদক পাইলেন। নৃত্যের জন্য বিজয়লক্ষ্মী (তামিল) চিত্র পদ্মনাভ (কাকনী) জ্যোৎস্না মালতী (মারহাঠী), তরু ও বাসন্তী শাহি (গুজরাতী) বাংলা গানের সহিত নৃত্য দেখাইয়া প্রশংসা ও পদক লাভ করেন।

এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা অনুষ্ঠানে মি. টৈ, মেয়ো (চীনা) 'মুরাতের তৃতা' আবৃত্তি ও বিশ্লেষণের মধ্যে সর্ব্বাধিকবার করতালিতে "মিস মুখার্জি" গোল্ড মেডেল পান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুতন মহিলা ডি ফিল :

বাসন্তী সেন : নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সহঃ প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী বাসন্তী সেন সম্প্রতি ডি. ফিল উপাধি লাভ করেন। তাহার গবেষণার বিষয় ছিল "বহুরূপ সুরের উপকারিতা" তিনি এম-এ তে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। ইনি বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীমায়ধলাল সেনের কন্যা।

বাসন্তী চৌধুরী :

"উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতরাগের" উপর গবেষণা করিয়া শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী এম-এ বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ডি-ফিল উপাধি লাভ করিলেন।

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রী :

অলকা দাস ইংরাজী; মীরা ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত; বন্দনা দেবী বাংলা; চারুকলা দেবী ইতিহাসে; অপর্ণা চৌধুরী, রেবা দেব, তপতী ভট্টাচার্য্য, মীরা বসু, মিঠী সেন, রাধারাণী দর্শনে; বিনীতা বড়ুয়া, কৃষ্ণা দাস, বিনতী গোস্বামী, শুভ্রলি রায়, লিলি বড়ুয়া অর্থ নৈতিক শাস্ত্রে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছেন।

ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গমহিলা পি-এচ্-ডি :

মিসেস গৌরী গাঙ্গুলী মগধ মহাবিদ্যালয়ের বাইরো-লজীর অধ্যাপিকা তিনি ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাণিতত্ত্বের উপর পি. এচ. ডি. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। কোন ভারতীয় মহিলা এরূপ উচ্চ সম্মান পান নাই। তিনি F. R. M. S. (Dublin) হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

বি-ও-সি বিমান লাইনে বাঙ্গালী হোস্টেস্ :

এ যুগে বিমান পোতের গমনাগমন ও গতি বিস্ময়। জল-স্থল ছাড়িয়া শূন্যে ভ্রমণ করা যেমন সুখ-সুবিধা আছে তেমনই একঘেয়েমীর পীড়নও আছে। ইহা দূর হয় অনেকটা অনভিজ্ঞতার ও পারদর্শিতার দ্বারা। বি. ও. সি. বড় বিমান পোত চালাইবার কোম্পানি। ইঁহারা বিলাতে Air Hostess Training দিবার ব্যবস্থা করেন নানা জাতির সুন্দরী মহিলাদের লইয়া। বাঙ্গালী তন্বী ব্যানার্জি প্রথম হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। মীরা রায় ও নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা বিভাগের ছাত্রী :

কুমারী মীনা সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমান বর্ষে বি-এ পরীক্ষায় অনার্সে লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছেন।

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত বৎসরের আয় ব্যয় ও কার্য্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সনের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয় :—

প্রধান পৃষ্ঠপোষক—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল—শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, পৃষ্ঠপোষক—শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর, সভাপতি—শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ, সহ-সভাপতি—ডাঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রীমতী বিভা ঘোষ ও শ্রীমতী চিত্র লেখা সিংহ।

সাধারণ সম্পাদিকা—শ্রীমতী মণিকা গুপ্তা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদিকা—শ্রীমতী মণিমালা রায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়, মহিলা সমিতি বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী। বিদ্যালয় বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী গীতা মুখার্জী। আরও ২২জন নির্ব্বাচিত সদস্য এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের ২ জন কাউন্সিলার এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প ও স্বাস্থ্য বিভাগের ১ জন করিয়া প্রতিনিধি এই কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় রহিয়াছেন।

সভাপতি

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ১৯৩৪ সাল হইতে সরোজ নলিনী সমিতির সভাপতি ছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গের হেতু তিনি সভাপতির গুরুদায়িত্ব পূর্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল সমিতির সভাপতি থাকিয়া সমিতির বহুবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, গুণী, প্রতিভাবান ও আদর্শ কর্ম্মীকে সভাপতি হিসাবে লাভ করা যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সেই সৌভাগ্য সরোজ নলিনী সমিতি লাভ করিয়াছিল। সরোজ নলিনী সমিতিকে ভালবাসিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই তিনি তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের মূল্যবান সময় সমিতির কল্যাণে ব্যয়িত করিয়াছেন তাঁহার বিদায় গ্রহণ সমিতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতি জনক। সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও তিনি সমিতির পৃষ্ঠপোষক থাকিবার সম্মতি জানাইয়াছেন, এই জন্য সমিতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

নূতন সভাপতি

১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ ১৯৫১ সাল হইতে সহ-সভাপতি রূপে সমিতির বহুবিধ কাজে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বাংলার বরেণ্য সন্তানদের একজন। অবসর জীবনে আরামলব্ধ জীবন যাপন না করিয়া তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া শ্রম স্বীকার করিতেছেন। ইহা তাঁহার দেশ প্রীতিরই পরিচয় বহন করিতেছে। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও গুণীকে সভাপতি হিসাবে লাভ করিয়া সরোজ নলিনী সমিতি গৌরব বোধ করিতেছে।

মহিলা সমিতি পরিদর্শন

সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মণিকা গুপ্তা, মহিলা সমিতি সম্পাদিকা শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী, কমিটির অন্যতম সদস্যা শ্রীমতী প্রীতি সেন গত ২০শে আগষ্ট তারিখে কাচড়াপাড়া মহিলা সমিতির সভায় যোগদান করেন। সভ্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্প শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে স্থানীয় সমিতির সদস্যাদের তাঁহারা বিশেষ ভাবে বলেন।

চাকদহ নারীমঙ্গল সমিতি

গত ২০শে আগষ্ট চাকদহ নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্র সমিতির মহিলা সমিতি সম্পাদিকা শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী সভানেত্রীত্ব করেন।

সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলিমা দাশ সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। শ্রীমতী দাশ দুইটি

উদ্বোধনযোগ্য দানের সংবাদ ঘোষণা করেন। স্থানীয় কর্ম্মী শ্রিমেমার স্বত্বাধিকারীর 'আশুতোষ ৪০২৮', মহীয়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী চি, কে, গুহের সুপারিশে পুনর্বাসন মন্ত্রী মহোদয়ের ভাণ্ডার হইতে দুইটি সেলাইয়ের কল ঘড়ির বাবদ ৪৪০, দানের সাহায্যে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভানেত্রী শ্রীমতী চৌধুরী চরদহের এই মহিলা প্রতিষ্ঠানটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

সমিতির সিনিয়ার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী সুধাংশু দেবী—অভ্যাগত নেতৃবৃন্দকে ও সমবেত মহিলাগণকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি জানান যে গৃহনির্ম্মাণ বাবদ স্থানীয় সাহায্য ৫০০৲ টাকার মধ্যে ঢাকুরহ পৌর সভাপতি ও অতিরিক্ত প্রাদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য শ্রীদেবেন্দ্র নাথ যে একাকীই ১০০২৲ দান করিয়াছেন তিনি শ্রীযুক্তের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীকমলতা দে'কে সভানেত্রী, শ্রীমতী সুধা রায়, বি, টি, সহ সভানেত্রী, শ্রীমতী নীলিমা খাসকে সম্পাদিকা ও মীণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোষাধ্যক্ষ এবং দশজন মহিলা সদস্য নির্বাচন করিয়া নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমিতিভবনে সভার আয়োজন করা হয়। সমিতির কর্ম্মী শ্রীমতী সুবোধ বালা ঘোষ পতাকা উত্তোলন ও সভানেত্রীত্ব করেন। স্বাধীনতা লাভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা এবং স্বাধীন দেশের নাগরিকদের কর্ত্তব্য ও আদর্শ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। উপস্থিত সকলকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বিভিন্ন শাখা সমিতি—
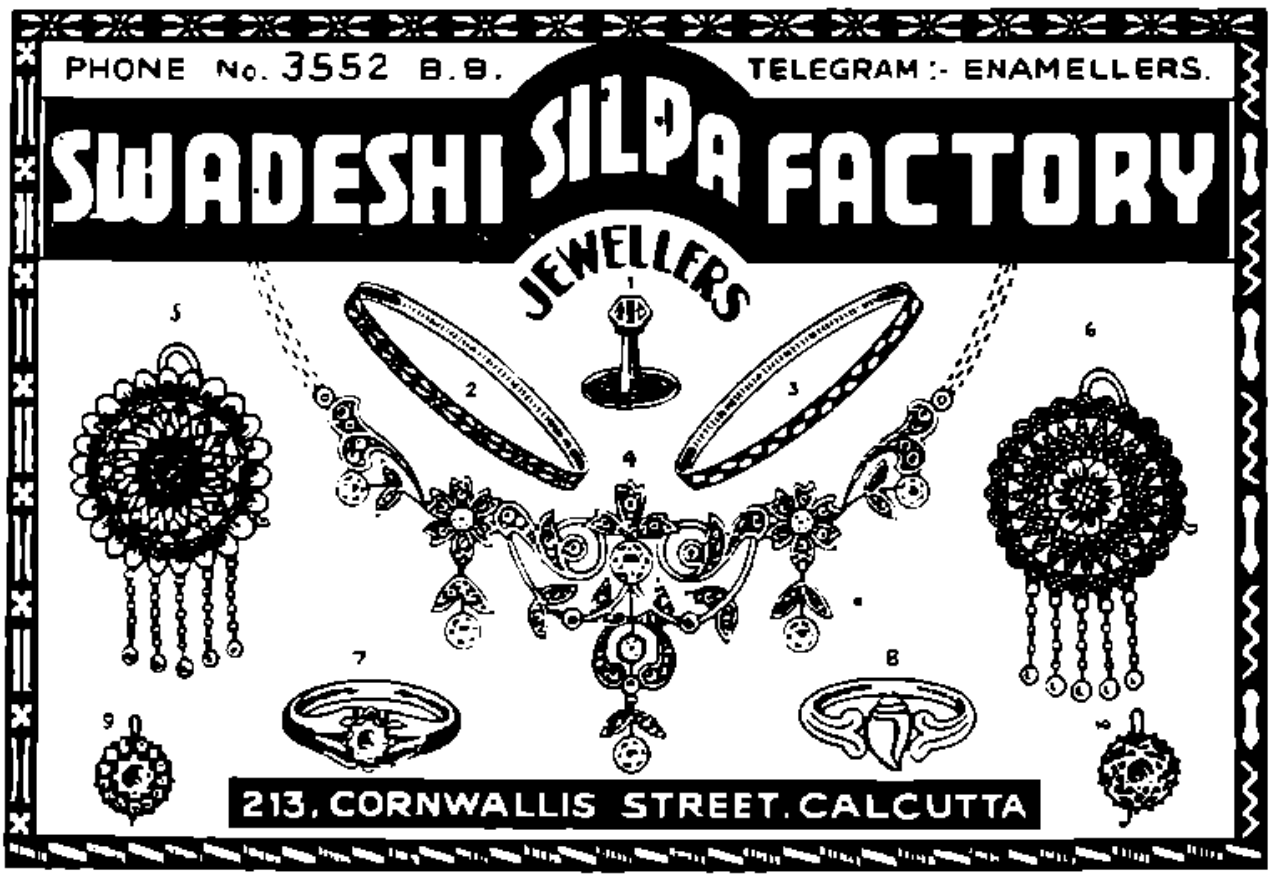
হইয়াছে